উপেন্দ্রকিশোর সুকুমার সত্যজিতের ছোটদের সেরা পত্রিকা • সম্পাদক সন্দীপ রায়

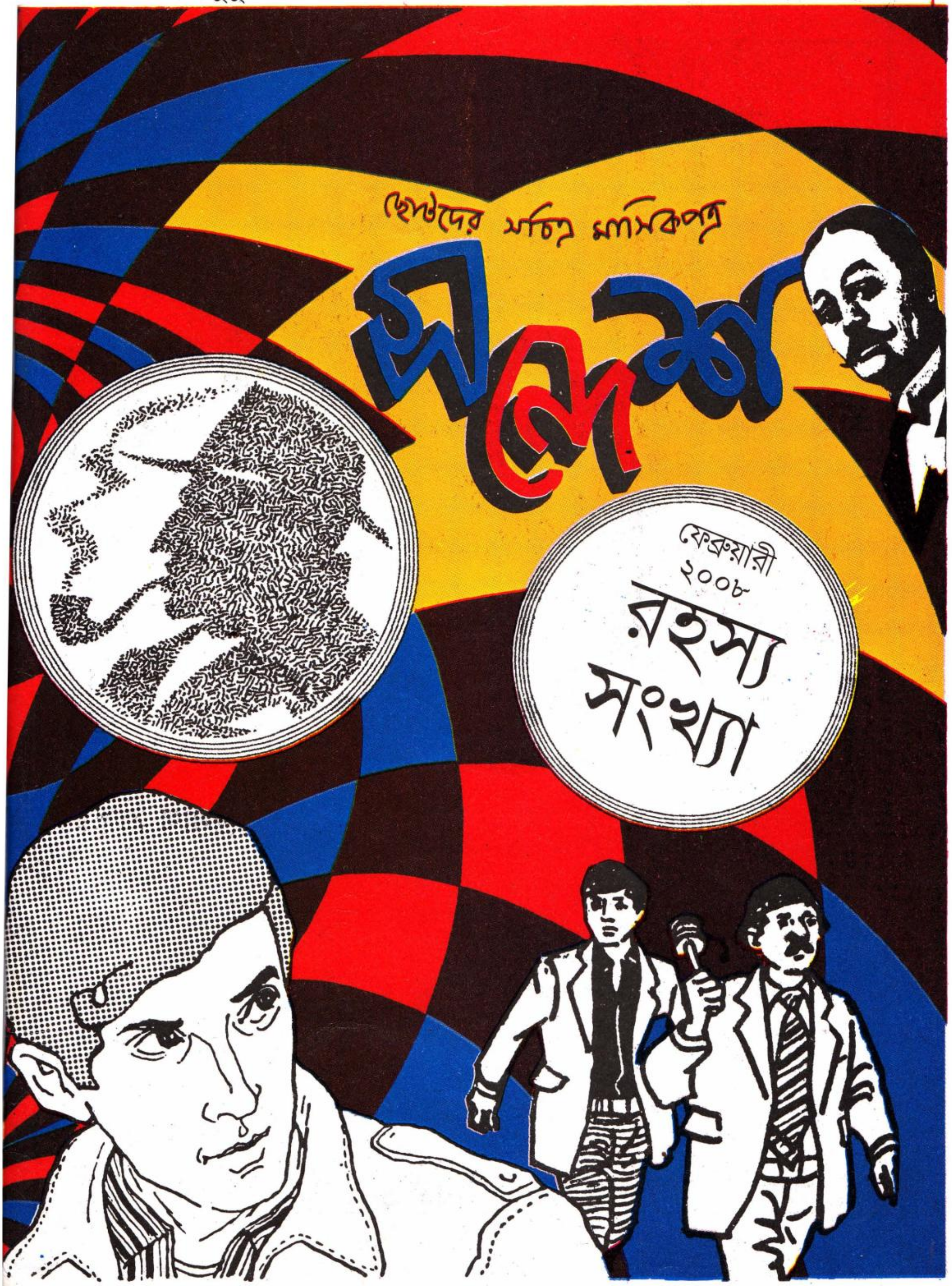

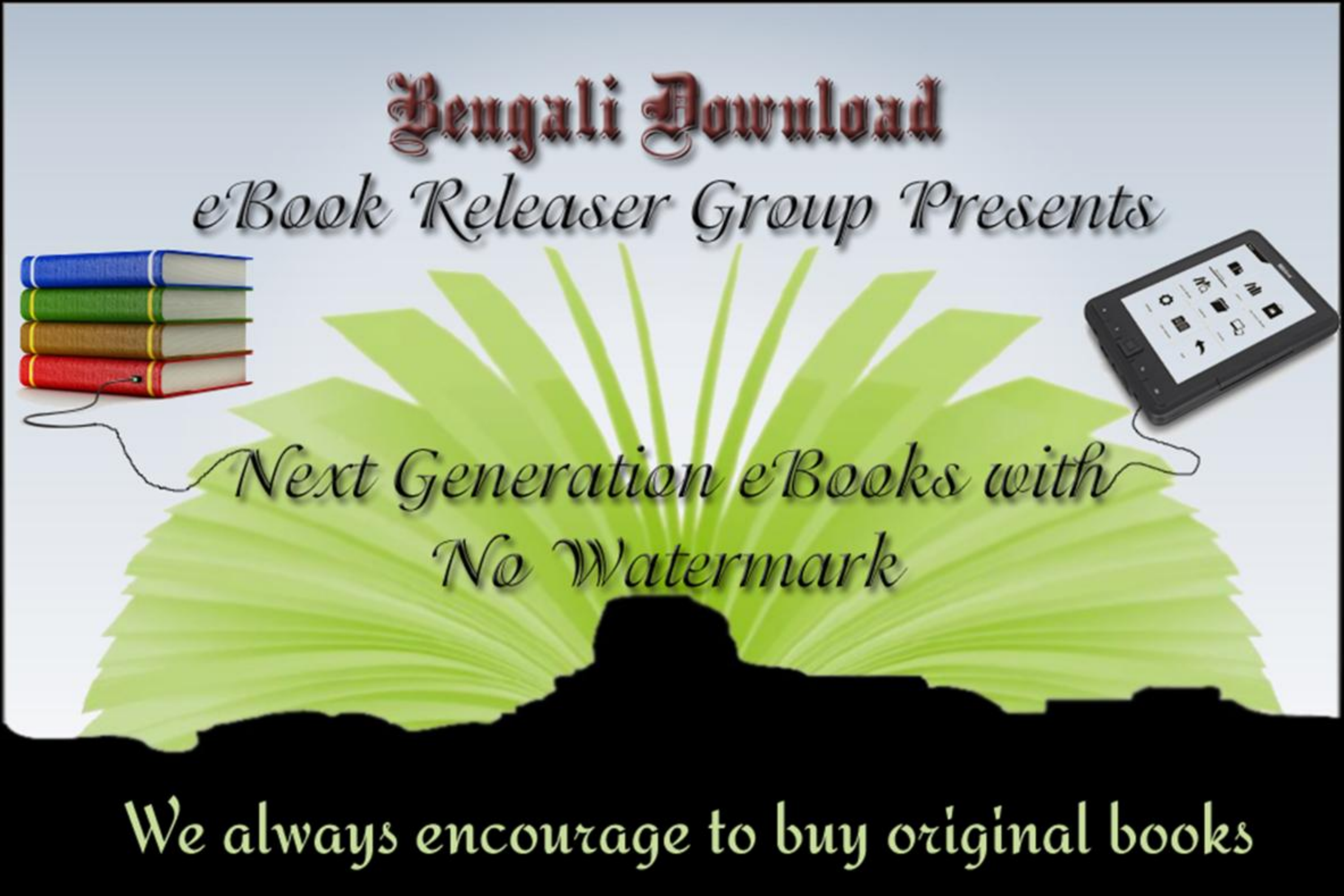
Bengali Download
eBook Releaser Group Presents
Next Generation eBooks with
No Watermark
We always encourage to buy original books

EMTA GROUP of Companies,
a multi-business conglomerate
and having core competence
in captive coal mining
for the thermal power stations
across the country

EMTA

THE POWER BEHIND POWER

EMTA Group of Companies

Kolkata: 801, Central Plaza, 2/6, Sarat Bose Road, Kolkata 700 020, Ph: 033 2485 8510/2485 8559, Fax : 033 2485 8513, e-mail : emta@cal2.vsnl.net.in
Delhi: 6 Poorvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi 110 057, Ph : 011 4107 4107, Fax : 011 4166 2808, e-mail : emta@ndc.vsnl.net.in
Bangalore : 301 Regency Enclave, 4 Magrath Road, Bangalore 560 025

SPS/Emta/05

উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, সত্যজিতের ছোটদের সেরা পত্রিকা

সন্দেশ

বিশেষ রহস্য সংখ্যা

তৃতীয় পর্যায় ● বর্ষ ৪৭
ফেব্রুয়ারী ২০০৮ ● মাঘ ১৪১৪

গল্প

বিচিত্র এক ষড়যন্ত্র/অজেয় রায় ৪
স্মৃতিবর্ধক ট্যাবলেট রহস্য/তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০
হীরের টুকরো/গজেন্দ্র কুমার মিত্র ১৮
দুরন্ত বিচকে/হীরেন চট্টোপাধ্যায় ২৩
টেডি বেয়ার রহস্য/পবিত্র সরকার ৩৪
ছদ্মবেশী আততায়ী/রাজেশ বসু ৪০
লোভে পাপ/রাহুল মজুমদার ৫১
লোনলি ইন্/স্যাপার ● অনুবাদ—সুভদ্রকুমার সেন ৬১
প্রত্যর্পণ/অরুণিমা রায়চৌধুরী ৭২
সোনালী ফাঁদ/স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৯
পীতচক্ষুর রক্তচক্ষু/ বলরাম বসাক ৮৫

ছড়া কবিতা

গা শিরশির/ প্রণব মুখোপাধ্যায় ৩

প্রবন্ধ ফিচার

সত্যজিৎ রায় ও ফেলু মিত্তির/মঞ্জিল সেন ২৯
আমার কল্পনায় আদর্শ মেয়ে গোয়েন্দা হলেন লীলাদি/নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৫৬

গোয়েন্দা গল্প লেখা আমার কাছে একটা কঠিন সিঁড়িভাঙা অঙ্ক কষা/সুচিত্রা ভট্টাচার্য ৫৭

ইন্দ্রনাথ রুদ্র হলেন অনেকটা আমারই প্রতিচ্ছবি /অদ্রীশ বর্ধন ৫৮

প্রস্তুতি ছাড়াই লিখতে হয়েছিল প্রথম গোয়েন্দা উপন্যাস/শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৯

শার্লক হোম্‌স্‌, ব্যোমকেশ বক্সী, ফেলু মিত্র তিন গোয়েন্দার সব গল্পই সেরা/অশোক দাশগুপ্ত ৬০

শব্দ ছক

ফেলুদা শব্দ-ছক/অরুণেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫৪

ছবি এঁকেছেন

সত্যজিৎ রায়, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, সুদীপ্ত দত্ত, ওয়াসিম হেলাল, হর্ষমোহন চট্টরাজ, রাহুল মজুমদার

সম্পাদক

সন্দীপ রায়

সন্দেশ কার্যালয়: ১৭২/৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯ থেকে সন্দীপ রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও কালী প্রিন্টার্স এন্ড বাইন্ডার্স ১০৯বি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯ কর্তৃক মুদ্রিত

স্বত্বাধিকারী : সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি লিমিটেড

অবতার আগামী সংখ্যা থেকে আবার পাবে

গা শিরশির

প্রণব মুখোপাধ্যায়

ঠাণ্ডা রাতে হুতুম থুমো
বিশ্রী হেঁকে বলছে ঘুমো,
    বেড লাইটের জোছনাভরা আলো
যতই শীতে উঠছি কেঁপে
ঢাকছি দেহ ততই লেপে
    বইয়ের পাতায় রহস্য জমকালো।
প্রহর মেপে রাত বেড়ে যায়
কে খুনী তা জানার নেশায়
    নিঝুম রাতে উল্টে চলি পাতা—
চোখের ওপর নামিয়ে টুপি
পথ হাঁটে কে চুপিচুপি—
    কেই বা পাজি, কেই বা পরিত্রাতা।
ফাঁদ পেতেছে গোয়েন্দা সে
পড়ল ছায়া গলির পাশে,
    শিরশিরিয়ে উঠছে ক্রমেই গা-টা,
দুলছে দোদুল মরা বাঁচা
বুদ্ধিটা কার পাকা, কাঁচা
    জানবো সে কার সত্যি বুকের পাটা।
রাতটা যতই চলুক বেড়ে
গল্প নিল ঘুমটি কেড়ে,
    বাবা বলেন, রাত হল ঢের, ঘুমো—
শিরশিরানি থামলে তবে
জমিয়ে তখন ঘুমটা হবে
    স্বপ্নে তখন হাঁকবে হুতুম থুমো।

বিচিত্র এক ষড়যন্ত্র

অজেয় রায়

দিনটা ছিল শনিবার। হাফ ডে স্কুলের পর বাবলু গিয়ে ঢুকল ঘোষদের বাগানে কুলের লোভে। তেমন বড় নয় বাগানটা। গ্রামের সীমানায় বিঘে দুই জমিতে ছোট এক পুকুর ঘিরে কটা আম নারকেল পেয়ারা ইত্যাদি গাছ। একটা কুল গাছও আছে। বড় বড় কুল হয়। খেতে খাসা।

বাবলু পকেট ভর্তি করে কুল নিল। তারপর ঝোপের আড়ালে বসে ঝাল-নুন সহযোগে তারিয়ে তারিয়ে কুল খেতে থাকে।

এই বাগানে তেমন কোনও পাহারা নেই। বাগানের এক কোণে সাধুচরণের কুঁড়ে ঘর। সাধুচরণই যেটুকু পাহারা দেয় বাগানটা। তবে তার বেশি মাথাব্যথা আম আর নারকেল নিয়ে। অন্য ফল নিয়ে বিশেষ গা করে না।

সাধুচরণের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। দোহারা মাঝারি লম্বা। শক্তপোক্ত গড়ন। সে একা থাকে। স্ত্রী তার গত হয়েছে বছর দুই। একটি মাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে কাছেই এক গ্রামে, বেশ কয়েক বছর আগে। অল্প চাষের জমি আছে সাধুচরণের। তাতে চাষ করে আর এই বাগান পাহারার কাজে কিছু দক্ষিণা পেয়ে তার পেট চলে যায়। অবসর সময়ে সে আড্ডা দেয় আর গান বাজনা নিয়ে থাকে। গানের গলাটি তার খাসা। নানান পল্লীগীতি গায়। আমুদে রসিক সাধুচরণের সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসে গাঁয়ের লোক। ডেকে এনে তার গানও শোনে। গাঁয়ের সব বাড়িতেই তার যাতায়াত আছে।

এখনকার সাধুচরণের সঙ্গে বছর দশেক আগের সাধুচরণের কিন্তু মিল নেই। এককালে সাধু ছিল নামজাদা চোর। তার ভয়ে তটস্থ থাকত শুধু এই পারুলডাঙা গ্রাম নয়, আশেপাশের সব গাঁয়ের লোক। বারকয়েক জেলও খেটেছে সাধু। তবে বেশি দিনের মেয়াদ নয়। পুলিশ কোনও দিনই জুৎসই ভাবে কব্জা করতে পারেনি চতুর সাধুচরণকে।

নানা মুনি, নানা মত। কেউ কেউ বলে যে চোর বাপের বদনামে মেয়ের সম্মান হানি হচ্ছিল শ্বশুরবাড়িতে। তাই আদরের মেয়ের কান্নাকাটি অনুরোধে সাধু চৌর্যবৃত্তি ত্যাগ করে। আবার কেউ বলে যে সাধু নাকি এক সন্ন্যাসীর প্রভাবে চুরি ছেড়েছে। যা হোক চোর সাধু সত্যিকার সাধু হওয়ার পারুলডাঙা এবং আশপাশের গাঁয়ের লোক পরম স্বস্তি পেয়েছে।

বাবলুর কিন্তু সাধুচরণকে বেশ রহস্যময় ঠ্যাকে। সে খানিক সমীহও করে ওকে। একবার এই বাগানে আম চুরি করতে এসে সে সাধুচরণের চোখে পড়ে যায়। সাধু তাকে গাছ থেকে নামিয়ে, তার হাত পাকড়ে বিদ্রূপের সুরে বলেছিল—ঠিক মতন আম চুরিরও এলেম নেই বাছা! ছ্যা ছ্যা। এই বলে সে বাবলুর পকেট থেকে সব কটা কাঁচা আম কেড়ে নিয়েছিল। আরও বলেছিল—তোমার বাড়িতে নালিশ করব না। লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়ে যাবে। তবে ফের ধরা পড়লে কিন্তু নালিশ করব তোমার বাবাকে।

তারপর অবশ্য সাধুচরণ এই নিয়ে আর কথা তোলে নি। বরং দেখা হলে হেসেছে। একবার সে নিজে বাবলুকে দুটো বড় বড় পাকা ল্যাংড়া আম দিয়েছিল খেতে।

কুল খেতে খেতে বাবলু সাধুচরণের কুটিরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে। সহসা দেখে যে বাগানের পথে সাধুচরণের কুটিরের দিকে চলেছেন বৃদ্ধ উমাপতি ঘোষমশাই। অর্থাৎ এই বাগানের মালিক।

বাবলু আরও লুকিয়ে বসে ঝোপের আড়ালে।

ঘোষমশাই সাধুর কুটিরের সামনে গিয়ে নিচু স্বরে ডাকলেন—সাধু।

সাধু দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বলল, পেন্নাম হই বাবু। আপনি আবার কষ্ট করে এলেন কেন?

ঘোষমশাই গম্ভীর ভাবে বলেন, এলেম কি সাধে? তোর পাত্তাই নেই। সেই কাজটা মনে আছে তো?

—আজ্ঞে তা কি ভুলি। কথা যখন দিইচি, কাজ ঠিক হাসিল করব। তবে বাবু এসব কর্মে আর মন চায় না। নেহাত আপনারা বলছেন তাই—

কেন। তোমার ভয় করছে নাকি?

ভয়? সাধুচরণ নীরবে হাসে।—ও বস্তুটি আমার নেই। স্বেচ্ছায় এ বৃত্তি ত্যাগ করেছি। তাই আবার বলছি, আমার মন চাইছে না। এই ভার আর কাউকে দিলে পারতেন।

—না না। ঘোষমশাই বাধা দেন, তোমায় ছাড়া আর কাউকে এ কাজে বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না। জানাজানি হয়ে গেলে কেলেঙ্কারি হবে।

ঘোষমশাই আরও কী সব বলেন চাপা গলায় উদ্বিগ্ন মুখে। বাবলুর কানে তা ভালভাবে পৌঁছয় না। সে উৎকর্ণ হয়ে শোনে টুকরো টুকরো বাক্য। যেমন—হাতে বেশি সময় নেই। প্ল্যানট্ল্যান সব—

সাধুচরণ বলে, আজ্ঞে সে সব হয়ে গ্যাছে। কাল সকালে যাব এক বার দেখে নিতে—

ঘোষমশাই বলেন, খুব হুঁশিয়ার। রাখহরির মেজ ছেলেটা আস্ত গুণ্ডা।

জবাব হয়—গুরুর কৃপায় সাধুচরণ কোনও মানুষকে ডরায় না। তার বেশি ভয় বরং কুকুরকে। ভারি বেয়াড়া জানোয়ার।

—কুকুর থাকলে সে বাড়িতে চুরি করনি?

—এ কেমন কথা? সাধু নিঃশব্দে হাসে, বাঘা ডাল কুত্তার পাহারা দেওয়া কত বাড়ির সিন্দুক সাফ করেছি। কুকুরকে বশ করার বিদ্যে না জানলে কি এ লাইনে উন্নতি করা যায়? আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। এখন বিদায় নিন। কেউ দেখলে কি আবার সন্দেহ করে বসে।

ঘোষমশাই সন্ত্রস্ত চোখে চারপাশ দেখে নিয়ে গুটিগুটি ফিরে চললেন। সাধুচরণ ঢুকে গেল তার ঘরে।

আরও মিনিট পনেরো বাদে বাবলু চুপিচুপি সরে পড়ল বাগান থেকে। কোনও অভাবিত রহস্যের সম্ভাবনায় সে তখন উত্তেজনায় থরথর।

এবার বাবলুর কিছু পরিচয় দেওয়া যাক।

বীরভূম জেলায় ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে বাবলুর গ্রামের নাম পারুলডাঙা। বাবলু পড়ে স্কুলে, ক্লাস নাইনে। সে বেজায় ডানপিটে আর খেলাধুলায় চৌকস। পড়াশুনায় মোটামুটি। ইদানীং বেশ কিছু রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা গল্প পড়ে তার মন উত্তেজিত হয়েছে। কোনও রহস্যের গন্ধ পেলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার সমাধানে।

পরদিন রবিবার। ভোর থেকে গিয়ে বাবলু লুকিয়ে রইল ঘোষদের বাগানে। ঘন্টাখানেক বাদে সাধুচরণ বেরিয়ে এল তার কুটির থেকে। তার পরনে গেরুয়া রঙের ফতুয়া ও সাধা ধুতি। হাতে দোতারা।

সাধুচরণ ধীরে ধীরে চলল গ্রামের ভিতর। সে যেন না দেখতে পায় এমন ভাবে দূরত্ব রেখে বাবলু সাধুকে অনুসরণ করে।

সাধুচরণ পথে দাঁড়িয়ে গাঁয়ের কয়েকজনের সঙ্গে রসালাপ করল। একজনের বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কীর্তন গাইল

কয়েক কলি। এপথ ওপথ খানিক ঘুরে সে গিয়ে ঢুকল রাখহরি বোসের বাড়ির ভিতর। ওই বাড়িতে সে রয়ে গেল।

মিনিট দশেক বাদে বাবলু বোসবাড়ির সামনে দিয়ে যাবার ছলে আড়চোখে ভিতরে দেখে নিল আধখোলা দরজা পথে।

বোসবাড়ির এলাকাটা বেশ বড়। প্রায় বিঘেখানেক জায়গা মাটির উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে দোতলা পাকা বসতবাড়ি, গোয়ালঘর ইত্যাদি। গোয়ালঘরে খড়ের চালে ছেয়ে আছে মস্ত এক লাউ গাছ। বড় বড় লাউ ধরেছে গাছে।

বাবলু দেখল যে বৃদ্ধ রাখহরি বোস দাওয়ায় বসে আছেন চেয়ারে। সমুখে মোড়ায় বসে হাসি মুখে কথা কইছে সাধুচরণ। একটু বাদেই কানে আসে সাধুচরণের গানা দোতারা বাজিয়ে বাউল গাইল সাধু। বোসমশাই বাউল গানের ভক্ত।

বাবলু দূরে পথের মোড়ে প্রতীক্ষায় থাকে, বোসবাড়ির ওপর নজর রেখে।

প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে সাধুচরণ বেরুল বোসবাড়ি থেকে। খানিক এপথ ওপথ ঘুরে সে এবার ঢুকল উমাপতি ঘোষের বাড়ি।

ঘোষবাড়ির ধাঁচ বোসবাড়ির মতনই। খানিক বাদে ঘোষবাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় বাবলু লক্ষ করে যে উমাপতি বসে আছেন উঠোনে খাটিয়ায় আর সাধু সামনে টুলে বসে। দুজনে কথা বলছে নিচু স্বরে।

ঘোষবাড়ি থেকে বেরিয়ে সাধুচরণ সোজা ফিরে গেল তার নিজের কুটিরে।

বাবলু বাড়ি ফিরে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবে। —গোপন ব্যাপার / প্ল্যান ট্ল্যান চুরি—এসবের অর্থ কী? মনে হচ্ছে, উমাপতি সাধুচরণকে দিয়ে রাখহরি বোসের বাড়ি থেকে কিছু চুরি করাতে অভিসন্ধি এঁটেছেন। তা চাইতেই পারে। দু-বাড়ির যা সম্পর্ক। হয়তো দামী কিছু। বোসদের জব্দ করতে। তাই সাধুচরণকে বলে কয়ে রাজী করিয়েছেন। কী হতে পারে? ঘোর রহস্য। গভীর ষড়যন্ত্র। বাবলুর মনে চিন্তার ঝড়।

এখন এই ঘোষ এবং বোস, দুই পরিবারের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন তা জানানো দরকার।

উমাপতি ঘোষ এবং রাখহরি বোস পরস্পরের দূর সম্পর্কের ভাই অর্থাৎ আত্মীয়। কিছু কাল আগেও দুই পরিবারের মধ্যে দিব্যি ভাব ছিল। রাখহরি উমাপতি কাছাকাছি বয়সী। বছর সত্তর ছুঁয়েছে। তখন উমাপতি প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় রাখহরির বাড়িতে যেতেন দাবা খেলতে।

দুই পরিবারই বেশ অবস্থাপন্ন। বছর তিনেক আগে দুই পরিবারের ঘনিষ্টতায় হঠাৎ চিড় ধরে। কারণটা তুচ্ছ অতি। ফি বছর পারুলডাঙা ক্লাব দুর্গাপুজোয় যাত্রা করে। সেবার ঘোষদের বড় এবং বোসদের মেজ দুই ছেলেই চায় সেনাপতির পার্ট। তাই থেকে মন কষাকষি। সেনাপতির পার্টটা অবশ্য দু-জনের কারোর বরাতেই জোটেনি। কিন্তু সম্পর্কে ফাটল ধরল। এরপর থেকে খুচ্‌খাচ্ ঝগড়া মামলা লেগেই আছে দুই পরিবারের মধ্যে। উমাপতি আর যান না বোসবাড়িতে দাবা খেলতে। তবে দাবার নেশায় দু-জনেই গিয়ে জোটেন দত্ত বাড়িতে দাবার আসরে। সেখানেও দু-জনে পরস্পরকে এড়িয়ে চলেন। তাই রাখহরিকে জব্দ করতে উমাপতির কোনও ষড়যন্ত্র করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

বাবলু ভাবে একবার, পুলিশকে জানালে কেমন হয়? না; পুলিশ হয়তো আমার ধারণাকে পাত্তাই দেবে না। এ রহস্য উদঘাটন আমায় একাই করতে হবে। কড়া নজর রাখব সাধুচরণের ওপর।

দু-দিন বাদে রাত আটটা নাগাদ। পৌষের শীতে গ্রাম তখন জবুথবু নিঝুম। চাদর মুড়ি দিয়ে বসে বাবলু পড়া করছিল নিজের বাড়িতে। সহসা 'আগুন আগুন'—বহুকণ্ঠের চিৎকার শুনে বাবলু উঠে পড়ে লাফ দিয়ে বেরুল পথে।

পুব পাড়ার আকাশটা লাল হয়ে গেছে। বাবলু দৌড়ল সেদিকে। গ্রামের নানা বয়সী পুরুষ তখন নানা দিক থেকে ধেয়ে চলেছে পুব পাড়ায়।

আগুন লেগেছে পুব পাড়ায় বিধু দাসের উঠোনের রাখা খড়ের গাদায়। ক-দিন আগে একটা খড়ের চালা নতুন করে ছেয়ে পুরনো খড় ডাঁই করে রাখা হয়েছিল ওখানে। তাতেই লেগেছে আগুন। বাজে খড় পোড়ার জন্য মাথাব্যথা নেই বিধু দাস বা অন্যদের। ভয়টা হল আগুন না ছড়িয়ে পড়ে।

কিছু খড় ভিজে ছিল। তাই ধোঁয়া উঠছে প্রচুর। খড়ের গাদায় মেশা কাঁচা বাঁশের টুকরোগুলো ফাটছে পটকার মতো। জ্বলন্ত খড়ের গাদায় জল ঢালা হচ্ছে, বাঁশ দিয়ে পেটানো হচ্ছে বিরাট হাঁকডাক চলছে।

বাবলু খেয়াল করে যে জনতার ভিড়ে সাধুচরণকে তো দেখছি না! সে ভাবল একবার বোসবাড়িতে দেখি গিয়ে। যাবার পথে বাবলু দেখল যে ঘোষবাড়ির মেয়েরা ও বাচ্চারা ওদের বাড়ির সামনে ভিড় করে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। উমাপতিকে দেখা গেল বাড়ির মেয়েদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন।

রাখহরি বোসের বাড়িতেও একই দৃশ্য। বাড়ির মেয়েরা ও বাচ্চারা কেউ সদর দরজার কাছে, কেউ কেউ ছাদে। সবারই উৎসুক চোখ অগ্নিকাণ্ডের দিকে। রাখহরিবাবু বা বাড়ির অন্য পুরুষদের দেখা মিলল না।

কয়েক মিনিট বোসবাড়ির কাছে কাটিয়ে বাবলু ভাবল যে এখানে থেকে লাভ নেই। সাধুচরণের বাসায় গিয়ে দেখি। আগুন লাগার সুযোগে কিছু হাতিয়ে নিয়ে ও যদি ঘরে ফেরে তখন ধরব ওকে।

সাধুচরণের কুটিরে আলো নেই। হালকা চাঁদের আলোয় চারপাশে আবছা আঁধার। দূর থেকে ভেসে আসছে অগ্নিকান্ড ঘিরে কলরব। বাবলু সাধুচরণের কুটিরের কাছে লুকিয়ে অপেক্ষা করে। দেখা যাক ও আসে কি না?

সহসা এক ছায়ামূর্তির আর্বিভাব ঘটে সেখানে। সে কুটিরের খুলে ভিতরে ঢোকে। ঘরে মিটমিটে আলোর আভা দেখা যায়। এবার বাবলু নিঃশব্দ কাছে গিয়ে কুটিরের আধভেজানো দরকার ফাঁক দিয়ে নজর করে ভিতরে।

ঘরে একটা কুপি জ্বলছে। সাধুচরণ মেঝেতে বসে। তার সামনে দুটো পেটমোটা থলি মাটিতে শোয়ানো। হাঁপাচ্ছে সাধু। হয়তো ওই ভারি থলি দুটো বয়ে আনার পরিশ্রমে। নির্ঘাৎ চোরাই মাল আছে থলি দুটোয়।

বাবলু আর দেরি করে না। কপাট দুটো হাট করে খুলে সে দরজা আগলে দাঁড়ায়। সাধুচরণ চমকে তাকায় বাবলুর দিকে। বাবলু সোজা থলি দুটোর দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন করে, ও দুটোয় কী আছে?

সাধুর চোখ ধক্‌ধক্ করে ওঠে রাগে। সে চাপা গর্জন ছাড়ে, বেরিয়ে যাও। ডেঁপোমি হচ্ছে? এক ফোঁটা ছোঁড়া।

বাবলু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলে, বেশ যাচ্ছি। তবে কোথায় যাব জানো? থানায় পুলিশের কাছে।

—পুলিশে কেন? সাধুর কণ্ঠে উদ্বেগ।

—পুলিশ এসেই বের করুক ওই থলি দুটোয় কি চোরাই মাল আছে। বাবলু এক পা পেছয়।

—দাঁড়াও। সাধুর স্বর খাদে নামে। খানিক গুম্ মেরে

থেকে সে বলে, উত্তম, তুমি নিজেই দ্যাখো, কী আছে এত? কী ধন-দৌলত।

সাধু একটা থলির মুখ ফাঁক করে যা টেনে বের করে তা দেখে বাবলু থ।

—একটা প্রকাণ্ড লাউ।

সাধু দ্বিতীয় থলিটা থেকেও বের করে অনুরূপ আকারের এক বিরাট লাউ। সাধুর চোখে বিদ্রূপ।

—একী? লাউ! কাদের বাড়ির? বাবলুর ভ্যাবাচাকা প্রশ্ন।

—একটা উমাপতিবাবুর, আর একটা রাখহরিমশায়, বোসমশায়ের বাড়ির। সাধুর জবাব।

—এই জন্য এত কাণ্ড। ঘোষমশায়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র। যাঃ! বাবলুকে থামিয়ে বলে সাধু, শুধু ঘোষমশাই নয়, রাখহরি বোসমশাইও আছেন এই ষড়ে। তাদের কথাতেই আমি একাজ করেছি। চুরিবিদ্যে ছেড়ে দিয়েছিলেম। নেহাতই ওঁদের অনুরোধ ফেলতে পারলাম না।

—একজন বুঝি অপরজনের বাড়ির লাউ চুরি করিয়েছেন তোমায় দিয়ে?

—মোটেই নয়। যে যার নিজের বাড়ির লাউ চুরির অর্ডার দিয়েছিলেন আমায়। দুই কর্তাই জানেন পুরো ব্যাপারটা। কদিন বাদেই এই লাউ দুটো যেত লাভপুরে কম্পিটিশনে।

—সাধুদা একটু খুলে বল প্লিজ। কিস্সু মাথায় ঢুকছে না। বাবলু ঘরে ঢুকে বসে পড়ে সাধুচরণের সামনে।

সাধু সামলে নিয়েছে নিজেকে। মুচকি হেসে বলে, বসো, বলছি সব। তবে সময় নেই হাতে। এখুনি মাল পাচার করতে হবে। অল্প কথায় বলি।

সাধুচরণ বলল এক বিচিত্র কাহিনী।

গ্রামের সবাই জানে যে পুব পাড়ার ঘোষ ও বোস পরিবারের মধ্যে আদায় কাঁচকলা সম্পর্ক। যা তারা জানে না তা হল, দুই বাড়ির দুই বৃদ্ধ কর্তাদের এই ঝগড়াঝাটিতে সায় নেই মোটে। তাঁরা ছেলেদের নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় পারেননি! বাইরে উমাপতি ও রাখহরি পরস্পরকে এড়িয়ে চলেন ছেলের ভয়ে। কিন্তু ফাঁক পেলেই দুজনে কথা বলেন গোপনে। দুঃখ করেন। অথচ পুরনো দিনগুলি ফিরে পাবার উপায় খুঁজে পান না। এই ঝগড়া কমার লক্ষণ নেই। বরং কয়েকদিন বাদে লাভপুরে কৃষি প্রদর্শনী উপলক্ষে হয়তো তা আরও বাড়বে।

প্রতিবছর লাভপুরে কৃষি প্রদর্শনীতে নানান ফুল ফল তরকারি ফলনের প্রতিযোগিতা হয়। আশেপাশের চাষীরা যোগ দেয় তাতে। সেরা ফুল ফল তরকারি ফলনের জন্য দেওয়া হয় মানপত্র পদক অর্থপুরস্কার। এই প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হওয়া রীতিমত গৌরবের ব্যাপার। স্বয়ং কৃষি মন্ত্রী এবং জেলা শাসক আসেন পুরস্কার বিতরণ করতে।

এবার রাখহরি বোসের এক ছেলে যোগাড় করে আনে স্পেশাল জাতের লাউয়ের বীচি। তাই থেকে চারা জন্মায়। খবরটা চলে যায় ঘোষবাড়িতে। দুই বাড়িতেই দু পক্ষের চর আছে, দুই বাগাল ছেলে। তারা নিয়মিত উৎকোচ পেয়ে থাকে দু বাড়ির গোপন খবর সরবরাহের বিনিময়ে। ব্যস, সেই স্পেশাল লাউয়ের বীচি চর মারফত চুরি হয়ে আসে ঘোষ বাড়িতে। তাই থেকে চারা তৈরি হয় সেখানেও। এদিকে বোসবাড়িতে খবর যায় যে ঘোষরা কম্পিটিশনের জন্য এবার লাউ ফলাচ্ছে। চারা তুলেছে। তবে সেই বীচি যে কোত্থেকে এসেছে, খবরটা ফাঁস হয়নি।

বোসরা খোজ রাখে ঘোষরা লাউ গাছে কী কী সার দিচ্ছে। খবর আসে, ওরা নাকি স্পেশাল সার দিচ্ছে লাউয়ের সাইজ বাড়াতে। বোসবাড়ির গুপ্তচর ঘোষদের লাউ গাছের জন্য স্পেশাল সারের খুঁটিনাটি খবর পৌঁছে দিতে থাকে রাখহরির ছেলেদের।

স্পেশাল বীচি, স্পেশাল সার, ফলে দুই বাড়িরই লাউ গাছে ফল ধরে মস্ত মস্ত। লাউগাছ পাহারা দেয় দুপক্ষই, পাছে অন্যজন তাদের লাউ গাছের ক্ষতি করে বা চুরি করে প্রতিযোগিতার জন্য রাখা লাউ, সব চাইতে বড় লাউটা।

লাউ নিয়ে এই বিবাদ থামাতে চেয়েছিলেন উমাপতি এবং রাখহরি। যথারীতি তাঁরা ব্যর্থ হন। কদিন আগে তাঁরা জানতে পারেন যে দু বাড়ির ছেলেরাই অসৎকর্ম করেছে এই লাউ ফলানো নিয়ে।

দুই কর্তাই গেলেন বেজায় চটে। অবাধ্য গোঁয়ার পুত্রদের শায়েস্তা করতে তাঁরা অন্য পন্থা ধরলেন। দুজনে যুক্তি করে সাধুচরণকে ভার দিলেন, দুই গাছের দুটো লাউ হাপিজ করতে, যে দুটো লাউ কম্পিটিশনে পাঠাতে চায়। কারণ দুই পরিবারের কারোর বরাতেই ফাস্ট প্রাইজ না জোটা উচিত।

সাধুচরণ গম্ভীর ভাবে বলল, শুনলে তো সব। এখন ঠিক কর পুলিশে খবর দেবে কি না? কর্তাদের মান রাখবে, না দু বাড়ির বিবাদটা আরও বাড়াবে?

বাবলু মাথ চুলকিয়ে বলে, নাঃ থানা-পুলিশে দরকার নেই। আমি বলব না কাউকে এ ব্যাপারে।

সাধুচরণ হাঁফ ছাড়ে খুশিতে।

—আরে বাপু, এ লাইনে পাঁচ জনা এখনো আমায় মান্যি করে। রিটেয়ার করেচি। তবু এ কাজে হাত দিলেম শুধু দশের মঙ্গলের জন্য। টাকার লোভে নয়। বোসদের গুন্ডা মেজছেলে আর ঘোষদের খেঁকি কুকুরটার নজর এড়িয়ে

পনেরো মিনিটের মধ্যে দুই পেল্লাই লাউ সরাতে এই শর্মা ভিন্ন এ তল্লাটে আর কে পারবে? কর্তারা অবশ্য পান খেতে আমায় দেবেন সামান্য। লাউ পিছু পঞ্চাশ টাকা। আর লাউ দুটো ফাউ।

—আগুন কি তুমি লাগিয়েছ? জানতে চায় বাবলু।

—হ্। একটা গোলমাল পাকালে মাল হাতাতে সুবিধে হয়।

—লাউ দুটো নিয়ে কী করবে? খাবে বুঝি?

—বাপ্‌রে। এ দুটো দিয়ে তো গোটা গাঁয়ে ভোজ লাগানো যায়। এ বস্তু এক্ষুনি পাচার করতে হবে। ধরা পড়লে সর্বনাশ। বলেই সাধু দরজার বাইরে গিয়ে সজোরে দু-বার শিস দিয়ে ভিতরে এল।

একটু বাদেই নিঃসাড়ে ঘরে ঢুকল বছর কুড়ির এক ছোকরা। তার রং মিশকালো। লম্বা পাকানো শরীর। সাধু দ্রুত বলে গেল তাকে, গুটে চটপট লাউ দুটো কেটে ফ্যাল টুকরো করে। তাপ্পর থলিতে ভরে নিয়ে যা। একটা বড় টুকরো আমার মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে দিবি। বলবি, আমার গাছের লাউ পাঠিয়েছি। দু টুকরো তুই নিবি। বাকি লাউ জঙ্গলে পুঁতে দিবি।

গুটে নীরবে একটা বড় ছুরি দিয়ে খচাখচ্ লাউ দুটো টুকরো টুকরো করে ফেলল। তারপর খণ্ডগুলো থলিতে ভরে কাঁধে ফেলে মিলিয়ে গেল বাইরে অন্ধকারে।

সাধুচরণ বাবলুকে বলল, এবার তুমি যাও। আমি বেরুব। দেখি, ওখানে কী ঘটছে?

দু'জনে বাইরে আসে। বাবলু হঠাৎ খেয়াল করে যে সাধুচরণ উধাও হয়েছে। তখনো পুব পাড়ার হৈ চৈ চলছে। তবে আগুনের আভাটা আর নেই। বাবলুও চলল পুব পাড়ার উদ্দেশ্যে।

বাবলু উমাপতির বাড়ির সামনে এসে দেখে যে সেখানে বিরাট জটলা, বেজায় উত্তেজনা। আবিষ্কার হয়েছে— রান্নাঘরের চাল থেকে প্রতিযোগিতার জন্য রাখা লাউটা চুরি হয়ে গেছে। এ নির্ঘাৎ বোসদের কীর্তি। উমাপতির ছেলেরা দলবল জুটিয়ে তড়পাতে তড়পাতে চলল বোসবাড়ির দিকে। কিন্তু মাঝপথে তাদের সঙ্গে মোলাকাত হল বোসবাড়ির লোকজনদের। তারাও আবিষ্কার করেছে যে তাদের কম্পিটিশনের লাউ উধাও এবং ঘোষদের অপরাধী ঠাউরে তারা হুঙ্কার দিতে দিতে আসছিল। দুই বাড়িরই লাউ চুরি গেছে শুনে দু পক্ষই হতভম্ভ। তারা একে অপরের বাড়ি গিয়ে যাচাই করে আসে ঘটনাটা সত্যি কিনা।

এবার দুপক্ষই গিয়ে বসল উমাপতির বাড়ির আঙিনায়। দু দলেরই সন্দেহ এ নির্ঘাৎ মথুরাপুর গ্রামের সাহাদের অপকর্ম। সাহারা লাউ ফলনে এক্সপার্ট। গত দু বছর ওদের লাউ ফার্স্ট হয়েছে লাভপুরে। পাছে এবার হেরে যায় তাই এই চক্রান্ত। পারুলডাঙার পুবপাড়ার উমাপতি ও রাখহরিদের সঙ্গে তাদের বেজায় রেষারেষি।

দু:খের বিষয় কম্পিটিশনে ফার্স্ট হবার মতন আপাতত তেমন আর বড় লাউ নেই ঘোষ বা বোসবাড়ির গাছে। এই দুই লাউয়ের আকার যাতে খুব বাড়ে তাই অন্য বড় লাউ সব কেটে ফেলা হয়েছে প্রথামাফিক। সাহাদের টেক্কা দিতে তেমন কোনও লাউ নেই পারুলডাঙার কারও গাছে। দুই বাড়ির সঙ্গে সুর মিলিয়ে গোটা গাঁ শ্রাদ্ধ করতে থাকে মথুরাপুরের সাহাদের।

বাবলু দেখতে পায় যে ভিড়ে সাধুচরণও রয়েছে।

উমাপতি রাখহরিও ছিলেন জমায়েতে। পাশাপাশি বসে চুপচাপ শুনেছিলেন সব। হঠাৎ উমাপতি মৃদু গম্ভীর গলায় বললেন, রাখু এবার তোমাদের ফুলকপি কেমন হয়েছে? দেওয়া যাবে কম্পিটিশনে?

—তা দেওয়া যাবে। প্রাইজ পাবার মতনই সাইজ। জানান রাখহরি।

—আমাদের বাঁধাকপির সাইজও হয়েছে খাসা। তা এবার যদি তোমরা ফুলকপি আর আমরা বাঁধাকপি পাঠাই কম্পিটিশনে পারুলডাঙার হয়তো কিছুটা প্রেস্টিজ বাঁচে। গতবার তো তোমাদের ফুল আর আমাদের বাঁধা ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল। আসচেবার ফের লাউ ট্রাই করব। হয় তোমরা, নাহয় আমরা। কেউ না কেউ পারুলডাঙার মুখ রক্ষা করতে পারব ঠিক। কী বল?

—উচিত কথাই বলেছ উমা। সায় দিলেন রাখহরি। হৈ হৈ করে তাঁদের সমর্থন জানায় গাঁয়ের অন্য লোকেরা। আর এক প্রস্থ সাহাদের মুণ্ডপাত করে সভা ভঙ্গ হল।

বাড়ি ফেরার পথে সহসা বাবলু নজর করে যে সাধুচরণ হাঁটছে তার পাশে পাশে। বাবলু সাধুদার দিকে তাকাতেই সে বাবলুর চোখে চোখ রেখে মিচকে হেসে সরে গেল।

ছবি: সুদীপ্ত দত্ত

স্মৃতিবর্ধক ট্যাবলেট রহস্য

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছিল, কিন্তু এক সপ্তাহ যেতে না যেতে হঠাৎ কীভাবে যেন উধাও হয়ে গেল শীতের দাঁতের ধার। ভোরের দিকে যাও বা একটু কনকন করে, বেলা বাড়লেই দিব্যি নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। সন্ধের পরও তেমন জাঁকিয়ে শীত পড়ছে না। আজ পঁচিশে ডিসেম্বর, বড়োদিনে কোথাও সেলিব্রেট করতে যাওয়া যায় কিনা বলতেই সায়ন হাই তুলে বলল, কোথায় যাবে? যেখানেই যাবে দেখবে লক্ষ মানুষের ভিড়। রাস্তায় গাড়ির জ্যাম, বেড়ানোর আর শখ থাকবে না। অতএব ঘরে বসে কেক ইত্যাদি সহ ব্রেকফাস্ট, দুপুরে তোপসের ফ্রাই, চিলি চিকেন ইত্যাদি সহ জম্পেশ করে খাওয়ার ব্যবস্থা হোক, এই বলে সায়ন বেডরুমের ঢুকে কী একটা ম্যাগাজিন মুখে দিয়ে আড় হয়ে বিছানায় শুয়ে।

সায়নের সঙ্গে দুপুরের মেনু নিয়ে এতক্ষণ বলাবলি করে গার্গী সকালের খবরের কাগজটিতে চোখ পেতেছে, সে সময় ওদের গেস্টরুম থেকে মোবাইল কানে নিয়ে বেরিয়ে এল সোনালিচাঁপা। কার সঙ্গে যেন কথা বলছে চোখমুখে উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে, কিছুক্ষণ 'তাই নাকি? এ রে বাবা, কী হবে তা হলে!' ইত্যাদি নানা বিস্ময়সূচক চিহ্নে সবাইকে ভূষিত করে মোবাইল অফ করে বলল, 'গার্গীদি, খুব বিপদ।'

সাতসকালে শীতের আমেজ, চন্নর মা একটা কেক বানাচ্ছে অনেক তৈজস করে, লুনা সেই কেকের অপেক্ষায় ঘুরঘুর করছে কিচেনের আশেপাশে, সে সময় বিপদবার্তা এলে কেউই খুশি হয় না, গার্গী চোখ তুলে বলল, কী হল আবার?

আমার বন্ধু মালবিকার এক দূর সম্পর্কের মেসো আছেন টালিগঞ্জে, মুর অ্যাভেনিউয়ে বাড়ি, এখন আমারও প্রায় আত্মীয়। হঠাৎ ভুলভাল বকতে শুরু করেছেন দুদিন ধরে।

গার্গী বোঝার চেষ্টা করল বিষয়টা, সোনালিচাঁপা এর আগে কখনও তার এমন আত্মীয়ের কথা তাকে বলেনি, সবারই এরকম বহু আত্মীয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, হঠাৎ দরকার পড়লে তখনই খবর নেয়, বলল, খুব গরম পড়লে লোকে নাকি ভুলভাল বকে। শীতের দিনেও ভুল বকে কেউ শোনা যায় না। কোনও কারণ ঘটেছে ভুল বকার?

তেমন কিছুই নয়। দিনচারেক আগে, মানে একুশে ডিসেম্বর কী কারণে দুদিনের জন্য ছুটি নিয়েছিলেন অফিস থেকে, সেদিন বাড়ি ফেরার পর থেকে নাকি গুম হয়ে বসেছিলেন তাঁর প্রিয় ইজিচেয়ারটিতে। কথাও যা দু-একটা বলছিলেন ঠিক স্বাভাবিক কথা নয়, পরদিন থেকে উল্টোপাল্টা বকছিলেন বাড়িতে। কেউ তখন তেমন আমল দেয়নি। কিন্তু দুদিন পর অর্থাৎ চব্বিশ তারিখে অফিসে জয়েন করতে গিয়ে হঠাৎ ফিরে এসেছেন, তারপর থেকেই খুব বাড়াবাড়ি। এখন প্রায় পাগলামির পর্যায়ে—

—তোমার মেসোর বয়স কত?

—এই তো ক-দিন পরে রিটায়ারমেন্ট। ষাটের কাছাকাছি।

—কোথায় চাকরি করতেন?

—একটা ওষুধ কোম্পানিতে। নাম শুনেছ তুমি, 'নেচারকিওর'। হার্বাল মেডিসিন তৈরি করে ওরা। ওখানেই স্টোরের চার্জে আছেন দীর্ঘকাল।

—কীরকম ভুল বকছেন?

সোনালিচাঁপা মুখ করুণ করে বলল, মাসি এক্ষুনি ফোন করেছিল। বলল, 'সোনালি, কী বিপদে পড়েছি বল? আমাকে দেখলেই নন্দিতা নামে ডাকছে। কখনও বলছে, নন্দিতা, তুমি তিনদিন কলেজে আসোনি। আমার একটা অঙ্ক কিছুতে মিলছে না, তোমার সঙ্গে একটু কনসাল্ট করব বলে অপেক্ষা করছি। কখনও বলছে, নন্দিতা, চলো, আজ দুপুরে কলেজ কেটে দুজনে সাউন্ড অফ মিউজিকটা দেখে আসি।

গার্গী ভুরুতে কম্পন এঁকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার মাসির নাম নন্দিতা নয়?

—না, রঞ্জনা।

—তা হলে নন্দিতা কে?

—নন্দিতা কে তা মাসি জানে না, মেসো যখন কলেজে পড়তেন, নিশ্চয় সেই কলেজের বান্ধবী কেউ হবে। কিন্তু মাসি নন্দিতাকে নিয়ে ব্যস্ত নয়, বলছে মেসো সবসময় এমন কথাবার্তা বলছে যেন তাঁর বয়স কমে গেছে অনেক, সেই কলেজে পড়ার সময় যেরকম বয়স ছিল—

—আর কোনও সিম্পটম?

—কাল বিকেলে মেসোর এক কলিগ এসেছিলেন

বাড়িতে ওঁর খবর নিতে। কেন দু-দিন ধরে অফিসে যাচ্ছেন না তা জানতে। একই পাড়ায় থাকেন সেই সহকর্মী, তাঁর নাম দেবকৃষ্ণ, কিন্তু তিনি ঘরে ঢুকতেই তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন, আ রে সুরঞ্জন যে! তুই কতদিন পরে আমার বাড়িতে এলি বল? আজকাল তো আড্ডা মারা ছেড়েই দিয়েছিস! নিশ্চয় চুটিয়ে পড়ছিস? তোর প্রিপেয়ারেশন কেমন হল বল? আর পনেরো দিন পরে তো পরীক্ষা। আমার তো কিছুই মনে থাকছে না! যা পড়ছি ভুলে যাচ্ছি।

—তার মানে এখনকার স্মৃতি চলে গিয়ে হঠাৎ বহু দিন আগের স্মৃতি এসে ভিড় করে বসেছে মনে। ঠিক কি না?

—মাসি তাই বলছে। মেসো নাকি বারবার বলছেন, অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির বইটা কে যে নিয়ে গেল দুদিন পরে ফেরত দিয়ে দেবে বলে, আর পাত্তা নেই। মনেও পড়ছে না কে নিয়েছে? আমার এখন পরীক্ষা, কী করে পড়ব?

গার্গী কিছুক্ষণ ভাবল বিষয়টা। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, অমলেশবাবুর জীবনে খুব সম্প্রতি কোনও কিছু কি ঘটেছে যার ফলে এরকমটা হতে পারে!

সোনালিচাঁপা মুখ গোমড়া করে বলল, কাল সন্ধেয় মেসোর যে-কলিগ এসেছিলেন, সেই দেবকৃষ্ণবাবু একটা অদ্ভুত কথা বললেন মাসিকে।

—কী বললেন? গার্গী কৌতূহলী হয়।

—বললেন, ওঁদের কোম্পানিতে সম্প্রতি স্মৃতিবর্ধক একরম ট্যাবলেট তৈরি হচ্ছে যার চাহিদা বেড়ে গেছে খুব। কালো রঙের ট্যাবলেট, ব্রাহ্মীশাক দিয়ে তৈরি, সেই ট্যাবলেট নাকি বারো-চোদ্দোটা একসঙ্গে খেয়ে নিয়েছেন মেসো। আর তার ফলেই এই বিভ্রাট।

গার্গীর বিস্ময় চূড়ান্তে, সে কী কথা! কবে খেলেন?

—একুশ তারিখে বিকেলে, স্টোরে বসে গল্প করছিলেন দেবকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে, সে সময় কোথায় যেন সাপ্লাই করার জন্য স্টোর থেকে মাল বেরোচ্ছে, সে সময় একটা বাক্স বেরোলো যাতে লেবেল আঁটা 'ডিফেকটিভ'। সেই বাক্সটা হঠাৎ খুললেন মেসো, কেন ডিফেকটিভ লেবেল আঁটা দেখতে। খুলে দেখলেন ট্যাবলেটের স্ট্রিপগুলো কুঁচকে গেছে কোথাও কোথাও। হয়তো রাফ হ্যান্ডলিঙের কারণে। মেসোর হঠাৎ কী মনে হল বললেন, 'সত্যিই স্মৃতি বাড়ে এই ট্যাবলেট খেলে?' দেবকৃষ্ণবাবু বলেছিলেন, 'নিশ্চয় বাড়ে, নইলে এই প্রোডাক্টটা এত বিক্রি হচ্ছে কেন!' তখন নাকি মেসো বলেছিলেন, 'বোগাস। স্মৃতিশক্তি বাড়ানো যদি এতই সোজা হত, তা হলে নেচারকিওরের দৌলতে সব মানুষের স্মৃতিশক্তি এমন বেড়ে যেত যে, বাড়ি বাড়ি আইনস্টাইন তৈরি হয়ে যেত! ঠিক আছে, ট্রাই করা যাক, সত্যিই স্মৃতি বাড়ে কি না! আমি আজকাল সবকিছু ভুলে যাচ্ছি দ্রুত। আমার স্মৃতি একটু বাড়িয়ে নিই।' বলে এক গেলাস জল নিয়ে বারো-চোদ্দোটা ট্যাবলেট পর-পর খেয়ে নিয়েছিলেন।

—কী আশ্চর্য, এরকম করতে গেলেন কেন?

—তা দেবকৃষ্ণকাকুও বলতে পারছেন না। বললেন, স্রেফ মজা করার জন্য খেয়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু তার ফল যে এরকম হতে পারে তা ভাবতেই পারেননি ওঁরা!

—তা হলে টাবলেটটার গুণ আছে বলতে হবে!

—তা হয়তো আছে, কিন্তু কেন যে মেসো হঠাৎ অতগুলো ট্যাবলেট খেয়ে নিলেন বাজি ধরে! এখন কী মুশকিল!

গার্গী ঘড়িতে নজর রেখে বলল, ডাক্তার দেখানো হয়নি?

—মাসি একজন ফিজিসিয়ান ডেকেছিলেন, তিনি বলেছেন একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে। কাকে দেখানো হবে তা নিয়ে আলোচনা চলছে, তখনই কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার নাকি ফোন করে বলেছেন উনি বিকেলে আসবেন মেসোকে দেখতে।

—ক-টায় আসবেন জেনারেল ম্যানেজার?

—পাঁচটায়।

—ঠিক আছে, আজ আমার যখন কোথাও যাওয়ার প্রোগ্রাম নেই, আমিও একবার দেখে আসি তোমার মেসোকে।

—তুমি যাবে? সোনালিচাঁপা তিড়িং করে লফিয়ে ওঠে, সত্যি যাবে তুমি? দাঁড়াও, এখনই মাসিকে ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি।

সোনালিচাঁপার তৎক্ষণাৎ মোবাইলের বোতাম টিপতে টিপতে পাশের ঘরে প্রস্থান। গার্গী ব্যস্ত হয়ে পড়ল সংবাদপত্রের দিকে। আজকাল খবরের কাগজ পড়া মনে কিছুক্ষণ ভিতরে ভিতরে রক্তক্ষরণ। পৃষ্ঠা বন্ধ করে গার্গী খোঁজ নিল চন্নর মায়ের কাছে, কী, কদ্দুর?

চন্নর মা একগাল হেসে বলল, কী সুন্দর রং হয়েছে দ্যাখো কেকটার! একদম পার্ক স্ট্রিটের দোকানের মতো।

গার্গী হেসে বলল, হ্যাঁ, তুমি এত সুন্দর কেক বানাতে শিখেছ, তোমাকে এরপর কোনও বড়ো হোটেলে চাকরি দিয়ে দেবে।

অনেকদিন পর সায়ন বেশ মুডে ছিল, খুব হই হই করল লুনাকে নিয়ে। আগের দিনই সান্তাক্লজ লুনার বেঁধে-রাখা মোজায় নানা ধরনের চকোলেট উপহার দিয়ে গেছে, লুনা সেগুলি নিয়েই ব্যস্ত। সেদিন দুপুরে সোনালিচাঁপাও খুব মজা করল খাওয়ার টেবিলে বসে।

বিকেল হতেই সোনালিচাঁপা তাগাদা দিল গার্গীকে, গার্গীদি, মাসিকে জানিয়ে দিয়েছি পাঁচটার আগেই পৌঁছোব ওঁদের বাড়ি।

গার্গী জানে পাঁচটা নাগাদ অমলেশবাবুদের জেনারেল ম্যানেজার আসবেন ওঁদের বাড়ি। তার আগে সে পৌঁছোতে চায় জেনারেল ম্যানেজারকে দেখে কী প্রতিক্রিয়া হল অমলেশবাবুর তা দেখতে। গার্গীদের কসবার নতুন ফ্ল্যাট থেকে মুর অ্যাভেনিউয়ের দূরত্ব খুব বেশি তা নয়। গলফ গ্রিন হয়ে বিজয়গড়ের ভিতর দিয়ে মিনিট কুড়ি লাগল ছুটির দিন বলে। দোতলা বাড়ি, এখনও প্লাস্টার হয়নি, বাড়ির সামনে কিছুটা ফাঁকা জায়গায় ছোট্ট লন, তাতে কিছু মরসুমি ফুলের হাসিমুখ। কলিং বেল টেপতেই যিনি দরজা খুলে দিলেন তিনিই যে সোনালিচাঁপার বান্ধবীর মাসি তা চিনতে অসুবিধে হল না গার্গীর। তাঁর নাম যে রঞ্জনা তা আগেই জেনে নিয়েছে, ভিতরে ঢুকতেই রঞ্জনার ম্লান মুখ দেখে গার্গী বলল, আপনি খুব টেনশনে আছেন বোঝা যাচ্ছে।

রঞ্জনা ঘাড় নেড়ে বললেন, দেখুন না, একটু আগেই আমাকে বলল, 'নন্দিতা, অনেকদিন কে বি এল আমাদের প্র্যাকটিকাল ক্লাস নেননি। কী হল বলো তো তাঁর।' ওঁদের কেমিস্ট্রির ডেমনস্ট্রেটর কমলবিকাশ লাহিড়ীর কথা আগেও বলেছেন আমার কাছে, খুব নাকি পান খেতেন, ফর্সা রঙের মানুষ, পান খেয়ে সারাক্ষণ ঠোঁটদুটো লাল করে রাখতেন, তাতে মনে হত লিপস্টিক মেখেছেন। এরকম বলত, আর খুব হাসত হো হো করে।

বলে তিনি গার্গীকে ডেকে নিয়ে গেলেন অন্যদিকের একটি ঘরে, বসার ঘরের পাশেই ছোট্ট ঘর, একটা ছোটো ডিভান পাতা, বললেন, ওঁদের জেনারেল ম্যানেজার এখনই আসবেন, বলেছেন ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাবেন ওঁকে।

সেই কারণেই বোধহয় গার্গীকে ড্রইংয়ে না বসিয়ে নিয়ে এলেন এই ঘরটিতে। গার্গী তখনও বসেনি হঠাৎ সেখানে ঢুকে পড়লেন মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চুল উশকোখুশকো, চোখে হালকা ফ্রেমের চশমা, গার্গীকে দেখে হঠাৎ বিস্ময় উথলে উঠল তাঁর অভিব্যক্তিতে,

উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'আ রে, সুদক্ষিণা, তুমি কখন এলে?' বলে গার্গীর হাত ধরে করমর্দনের ভঙ্গিতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, তুমি এসেছ, ভালোই হয়েছে, আমি ইনর্গানিক কেমিস্ট্রির একটা অঙ্ক কিছুতেই মেলাতে পারছি না। তুমি তো এই অঙ্কগুলো পটাপট করে ফেলো, দাঁড়াও, এখনই বইটা নিয়ে আসছি। সামনে পরীক্ষা, এখনই অঙ্কটা না দেখে নিতে পারলে যদি পরীক্ষায় এসে যায়!

গার্গীর অস্বস্তি কাটাতে রঞ্জনা এসে ডেকে নিয়ে গেলেন অমলেশবাবুকে, বললেন, তোমার জেনারেল ম্যানজার এখনই এসে পড়বেন। চলো, বাইরের ঘরে বসবে।

গার্গী তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করছিল অমলেশবাবুর হাবভাব। ভাবছিল এ-ঘরে বসে দেখবে ড্রইংয়ে বসে ভদ্রলোক কী করছেন একা একা। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখার সুযোগ ঘটল না, একটু পরেই কলিং বেলের শব্দ, রঞ্জনা ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই একজন স্যুটেড-বুটেড ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন ভিতরে। তাঁর নাম যে দেবাঞ্জন দত্ত তা আগেই জেনেছে গার্গী। তাঁকে ঢুকতে দেখেই অমলেশবাবু অমনি লাফিয়ে উঠলেন, সোফা থেকে উঠে সোজা গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন ভদ্রলোককে, আ রে, প্রতুল, তুই? সামনে পরীক্ষা, তুই কিনা এখন আড্ডা দিতে এসেছিস আমার এখানে? ভালোই হয়েছে, তুই তো অঙ্কে মাস্টার, কো-অর্ডিনেট জিয়োমেট্রির একটা অঙ্ক কিছুতেই মিলছে না, তুই একটু কষে দেখিয়ে দে তো। দাঁড়া, বই-খাতা নিয়ে আসি।

অমলেশবাবু উঠতে যেতেই রঞ্জনা তাকে সামলাতে চেষ্টা করলেন, তুমি এখন বোসো, উনি তোমাদের জি এম সাহেব, তুমি চিনতে পারছ না?

অমলেশবাবু একটু থমকালেন, জি এম মানে? গ্র্যান্ড মাস্টার? তুই আজকাল চেস খেলছিস নাকি প্রতুল? তা তো কখনও বলিসনি? কনগ্র্যাচুলেশনস।

বলে উঠে গিয়ে জি এমের হাত ধরে এমন ঝাঁকুনি দিলেন যে ভদ্রলোক পালিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজতে শুরু করলেন বলে মনে হচ্ছিল গার্গীর। সোনালিচাঁপাও খুব বিব্রত বোধ করছিল। ফিসফিস করে বলল, মেসোর মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গেছে, গার্গীদি। নইলে কোম্পানির জি এম নিজে এসেছেন ওঁকে দেখতে আর মেসো কিনা তাঁকে তুই-তুই বলছেন, হ্যান্ডশেক করে হাত ভেঙে দিতে চাইছেন? ভাগ্যিশ রিটায়ারমেন্ট সামনে, নইলে চাকরি যেতই।

গার্গী গভীরভাবে লক্ষ করছিল অমলেশবাবুর কথা বলার ধরন, ভাবভঙ্গি, বলল, তা হলে কোম্পানির ট্যাবলেটের গুণ আছে বলতে হবে!

—মেসোর যে-কলিগ কাল এসেছিলেন, তিনি মাসিকে বলে গেছেন, একসঙ্গে বেশি ট্যাবলেট খাওয়ায় স্মৃতির পরিমাণ এত বেড়ে গেছে যে, টাইম মেসিনের মতো পৌঁছে গেছেন কলেজ লাইফে। সারাক্ষণ শুধু কলেজ লাইফের বন্ধুদের কথা আর সামনে পরীক্ষার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছেন।

গার্গী সায় দিয়ে বলল, এও একরকমের স্মৃতিভ্রষ্টতা।

বাইরের ঘরে তখন অমলেশবাবু অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন আর বলছেন, প্রতুল, তুই নিশ্চিত ফার্স্ট ক্লাস পাবি, কিন্তু আমার প্রিপেয়ারেশন একদম ভালো হয়নি। হয়তো শেষ পর্যন্ত ড্রপ দিতে হবে এ বছর। তোর নোটসগুলো রেখে দিস তো আমার জন্য। আচ্ছা, দাঁড়া, আমি একটা অঙ্ক তোকে দেখাই। ঠিকমতো কষেছি কি না।

বলে অমলেশবাবু ভিতরে ঘরে চলে যেতেই গার্গীও সোনালিচাঁপাকে নিয়ে ঢুকল বাইরের ঘরে, রঞ্জনা তখন ঘরে নেই, চা করতে চলে গেছেন ভিতরে, গার্গী জেনারেল ম্যানেজারকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, মিঃ দত্ত, আপনি নিশ্চয় শুনেছেন অমলেশবাবু ছুটি নেওয়ার আগের দিন একসঙ্গে অনেকগুলো স্মৃতিবর্ধক ট্যাবলেট খেয়ে নিয়েছিলেন মজা করে?

জেনারেল ম্যানেজার বললেন, শুনেছি সেই গল্প। সেই কারণেই আমি এসেছি। ওঁকে একজন ভালো সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে চাই।

—আপনার কি মনে হয় ওই স্মৃতিবর্ধক ট্যাবলেট খেয়েই অমলেশবাবুর স্মৃতিশক্তি লোপ হয়ে গেছে?

—আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। যে-আয়ুর্বেদিক ডাক্তার এই ওষুধটি তৈরি করেছেন, তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলেছি, তিনি বলেছেন একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলতে।

—কিন্তু তাঁর কী অভিমত? যা শুনেছি—অমলেশবাবু যে-ফাইলটি থেকে ট্যাবলেটগুলি খেয়েছিলেন সেই ফাইলটিতে লেখা ছিল 'ডিফেকটিভ'। কেন ডিফেকটিভ লেভেল আঁটা সে-সম্পর্কে আপনাদের কোম্পানি নিশ্চয় কিছু বলতে পারবে। আপনি জানেন বিষয়টা?

জেনারেল ম্যানেজার ইতস্তত করে বললেন, প্যাকিং সেকশনে খবর নিয়ে তেমন কিছু জানতে পারিনি কেন এই লেভেল আঁটা, কে-ই বা এঁটেছিল লেভেলটা!

—তা আপনারা এখন কী করতে চাইছেন?

—একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলছি, তিনি আগামীকালই ওঁকে নিয়ে যেতে বলেছেন, কিন্তু আমি এসে যা দেখলাম কেসটা খুবই জটিল। অমলেশবাবু তো কাউকেই চিনতে পারছেন না!

—আপনার মনে হচ্ছে মেন্টাল অ্যাসাইলামে ভর্তি করে দেওয়া উচিত, তাই না?

—একজ্যাক্টলি। আমাদের সমস্যা অন্য জায়গায়। আগামী সপ্তাহ থেকে অডিট শুরু হচ্ছে। অমলেশবাবুর অ্যাসাইনমেন্ট স্টোরে। অফিসের খাতাপত্র চেকিং হওয়ার পর অডিট পার্টি স্টোর দেখতে চাইবে।

—তা তো চাইবেই। কিন্তু নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে অন্য কেউ দেখছেন স্টোর। সেখানে স্টক রেজিস্টার থাকে। ফাইল থাকে। নিশ্চয় অডিটে কোনও অসুবিধে হবে না।

জেনারেল ম্যানেজার আবার ইতস্তত করে বললেন, সেখানেই তো হয়েছে গোলমাল। অমলেশবাবু দুদিনের জন্য ছুটিতে গিয়েছিলেন, তাঁর ছুটির সময় চার্জ নিয়েছিলেন অন্য একজন, বিপ্লব সেন। দুদিন ছুটির পর যখন অমলেশবাবু জয়েন করতে গেলেন তখন তিনি আর সুস্থ নেই। বিপ্লববাবু হেড অফিসে ফোন করে জানালেন অমলেশবাবু ভুলভাল বকছেন, তাঁকে চার্জ দেওয়া যাচ্ছে না।

—তারপর?

—তারপর হেড অফিস থেকে একজন ডেপুটি ম্যানেজার হিরন্ময় রায়কে পাঠানো হয়েছিল, তিনি গিয়ে দেখলেন বিপ্লববাবু খুব উত্তেজিত। ডেপুটিকে দেখেই বললেন, সর্বনাশ হয়েছে স্যার, অমলেশদা নিশ্চয় অনেকদিন ধরেই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, স্টোরের খাতাপত্রের সঙ্গে অ্যাকচুয়াল স্টক মিলছে না।

গার্গী আশ্চর্য হল, তার মানে?

—অমলেশবাবু যখন দুদিনের ছুটিতে গিয়েছিলেন, হিসেবমতো বিপ্লব সেনের স্টক মিলিয়ে চার্জ নেওয়ার কথা। কিন্তু দুদিনের ছুটি, বিপ্লব সেন বলছেন তিনি সেসব কিছুই করেননি। স্টক রেজিস্টারে 'চার্জ টেকন ওভার' বলে সই করেছিলেন। কিন্তু দুদিন পর যখন অমলেশবাবু চার্জ নিতে এলেন তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতির ফলে চার্জ নিতে পারেননি, এখন অডিট টিম আসছে জানতে পেরে বিপ্লববাবু বলছেন, স্টকে বহু মাল শর্ট। হিসেবমতো তার পুরো দায়িত্ব বিপ্লববাবুর।

—বিপ্লববাবু কী বলছেন?

—তিনি বলছেন, তিনি কিছুই জানেন না এ বিষয়ে। দুদিনে তেমন কিছু মাল ওঠানামাও হয়নি স্টোর থেকে। শর্ট যদি হয়ে থাকে তা অমলেশবাবুর সময়েই হয়েছে।

—কিন্তু আইনত অমলেশবাবুর কোনও দায়িত্ব থাকতে পারে না, যেহেতু তিনি কাগজে কলমে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন বিপ্লববাবুকে, তাই তো?

—একজ্যাক্টলি। সেই কারণেই এখন অমলেশবাবুর সুস্থ হয়ে ওঠার প্রয়োজন। এও হতে পারে, অনেক চালান রেজিস্টারে এন্ট্রি হয়নি, সেই কারণেই শর্ট দেখাচ্ছে স্টোরে। অমলেশবাবু একটু ভুলোভালা টাইপের মানুষ ছিলেন। ওঁর সহকর্মী ভোলনাথ বলছে, অমলেশবাবুর নাকি স্বভাব ছিল চালান এলে তাতে সই করে কোনও ড্রয়ারে বা ফাইলের মধ্যে গুঁজে রাখা, আবার বাড়িতে মাল পাঠিয়ে স্টক রেজিস্টারে না তোলা। এমনও হতে পারে, 'পরে করব' ভেবে আর এন্ট্রি করেননি, সেই কারণেই শর্ট।

গার্গী চোখ রাখে জেনারেল ম্যানেজারের চোখে, মি. দত্ত, অমলেশবাবুর পাস্ট রেকর্ড কী বলছে?

—খুব ভালো। আজ একত্রিশ বছর ধরে স্টোরের চার্জে। এর মধ্যে দুটো প্রোমোশন হয়েছে, কিন্তু তিনি প্রোমোশন ফোরগো করেছেন।

—প্রোমোশন নেননি! সে কী! কেন?

—তিনি বলেছেন, স্যার, এত বছর স্টোরে থেকে অফিসের কাজ সব ভুলে মেরেছি। আমার এই স্টোরই ভালো! ফাইল লেখার ঝঞ্ঝাট নেই। শুধু মাল গুনে নিয়ে স্টোরে ঢোকাও, তারপর রিকুইজিশন এলে স্টোর থেকে বার করে দাও। এই চাকরিই তোফা।

গার্গী অবাক হয়ে ভাবছিল অমলেশবাবু কেন প্রোমোশন নেননি তার সম্ভাব্য কারণ। জিজ্ঞাসা করল, তাতে ওঁর অর্থক্ষতি নিশ্চয় কিছু হয়েছে?

—কিছুটা তো হয়েইছে, তবে খুব বেশি নয়, কারণ স্টোর-কীপার হিসেবে উনি একটা স্পেশাল অ্যালাওয়েন্স পান যাতে মোটামুটি পুষিয়ে যায় ক্ষতিটা।

গার্গী কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, অমলেশবাবুর নামে এর আগে কোনও অভিযোগ এসেছিল আপনাদের কাছে?

—একেবারেই নয়। বরং তাঁর অ্যানুয়াল কনফিডেন্সিয়াল রোল সবসময়েই 'ভেরি গুড' কখনও 'এক্সেলেন্ট'। তবে যা শোনা যাচ্ছিল গত কয়েক মাসে উনি নাকি অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছিলেন, এমনকী মাস তিনেক আগে একদিন মাইনে নেওয়ার সময় অ্যাকুইট্যান্স রোলে সই করতে গিয়ে কলম খুলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন অন্যমনস্ক হয়ে।

—তাই নাকি! কেন?

—দেরি হচ্ছে দেখে ক্যাশিয়ার অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিয়েছিলেন নিজের সইটাই ভুলে গেছেন। তারপর বলেছিলেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বলে সই করেছিলেন অ্যাকুইট্যান্স রোলে।

—খুব মিস্টেরিয়াস তো!

—হ্যাঁ। তবে এরকম ভুল নাকি আজকাল প্রায়ই হচ্ছিল অমলেশবাবুর।

—কিন্তু স্টোরে এরকম একজন ভুলো মানুষকে রেখেছিলেন কেন? গার্গী এখন প্রায় জেরার ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল জেনারেল ম্যানেজারকে।

জেনারেল ম্যানেজারকে বেশ বিব্রতই দেখাল এই মুহূর্তে, আসলে কী জানেন, অমলেশবাবু মানুষ হিসেবে খুবই ভদ্র, কাজেও যথেষ্ট দক্ষ। অন্তত গত বছরের অডিট পর্যন্ত বেশ ভালোই সামলেছেন স্টোরের দায়িত্ব। আমাদের ধারণা, এই সময়কালের মধ্যে ওঁর অ্যালঝাইমার রোগে ধরেছে তা উনিও বলেননি ঠিক, আমরাও বুঝতে পারিনি।

—আপনারা নিশ্চিত অমলেশবাবুর অ্যালঝাইমার রোগ হয়েছিল?

—খুব নিশ্চিত তা নয়। কিন্তু এতকাল দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে হঠাৎ চাকরির শেষপ্রান্তে এসে এরকম একটা ভুল করবেন তা ভাবতে পারিনি কেউ।

গার্গী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, মি. দত্ত আপনাদের কি এখনও ধারণা, অমলেশবাবু চালান এন্ট্রি করতে ভুল করেছেন?

—স্টোরে ওঁর সহকারী ভোলনাথ তাই বলছে।

—আপনারা কি এর মধ্যে স্টক ভেরিফাই করেছেন?

—না, করাইনি। ভাবছিলাম অমলেশবাবুর স্মৃতি যদি ফিরিয়ে আনা যায় তা হলে স্টক ভেরিফিকেশন করতে সুবিধেই হবে।

—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে স্মৃতি ফিরিয়ে আনা অসম্ভব, তাই না?

—ওঁকে দেখে তাই তো মনে হচ্ছে। একদম বদ্ধ পাগল।

—কিংবা পাগল না বলে যদি বলি উনি হঠাৎ ফিরে গেছেন তাঁর কলেজ লাইফের স্মৃতিতে! বাস করছেন আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে! আপনাদের স্মৃতিবর্ধক ট্যাবলেটের গুণে টাইম মেশিনে চড়ে পৌঁছে গেছেন পুরোনো দিনে!

রঞ্জনা ইতিমধ্যে তিন কাপ চা করে এনে আবার ভিতরে গেলেন। গার্গী একের পর এক প্রশ্নবাণে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন জেনালের ম্যানেজার ভদ্রলোকটি। বললেন, আপনার কী মনে হচ্ছে, মিসেস চৌধুরি? ওষুধের গুণেই এমনটা হয়েছে?

—সে তো আপনাদের আয়ুর্বেদিক ডাক্তারেরই জানার কথা। তিনি ট্যাবলেটে কী কী দ্রব্য মিশিয়ে ওষুধ তৈরি করছেন তা তিনিই জানেন। তাঁকেই বলুন না এর কোনও অ্যান্টি ডোজ তৈরি করতে পারেন কি না, যাতে অমলেশবাবু আবার অতীতকাল থেকে ফিরে আসতে পারেন বর্তমান কালে।

—ঠিক আছে, দেখি, জেনারেল ম্যানেজার ভদ্রলোক আমতা আমতা করে ফিরে গেলেন তাঁর বাসস্থানে। তিনি চলে যেতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন রঞ্জনা, গার্গীর দিকে এগিয়ে গেলেন জিজ্ঞাসু চোখে, কী বললেন জি এম সাহেব? গার্গী একবার নজর রাখল ভিতরের দিকে, অমলেশবাবু সেই যে বই খুঁজতে ভিতরে সেঁধিয়ে গেছেন এখনও বাইরের ঘরে আসেননি আর। হয়তো এখনও বই খুঁজে চলেছেন তাঁর কলেজের বন্ধু প্রতুলকে দেখাবেন বলে। পরক্ষণে গার্গী জিজ্ঞাসা করল, আপনার কাছে একটা কথা জানতে চাইছি। আপনি কি গত এক বছরে অমলেশবাবুর চালচলনে কোনও পরিবর্তন লক্ষ করেছেন?

—পরিবর্তন! রঞ্জনা ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, হ্যাঁ, বলছিল, সব ভুলে যাচ্ছি আজকাল।

—যেমন?

—যেমন অফিস থেকে আগে সরাসরি বাড়ি ফিরে আসত, সন্ধে সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে, আজকাল রাত দশটাও করে ফেলেছিল ফিরতে।

—কারণ হিসেবে কিছু বলছিলেন?

—কোনও দিন বলতেন দুশো পাঁচ নম্বর বাসে উঠব, উঠে পড়েছিলাম দুশো আটে। তারপর বাস থেকে নেমে মনেই করতে পারছিলাম না কেন এখানে এলাম! কোনও দিন বলেন, মুর অ্যাভেনিউ স্টপেজে না নেমে চলে গিয়েছিলাম গড়িয়ায়। এরকম এক-একদিন এক-এক কারণ।

—তাহলে তো বেশ মুশকিলের ব্যাপার।

—মুশকিল তো বটেই, আর কয়েকদিন পরেই তো রিটায়ারমেন্ট। ভাবছিলাম এ কটা দিন গেলে বাঁচি। তার আগেই এই দুর্ঘটনা।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। অফিস থেকে উনি রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট সব পেয়ে গেছেন?

—হ্যাঁ, প্রায় সব পেয়েছেন, শুধু প্রভিডেন্ট ফান্ডের কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা বাকি আছে বলছিলেন।

—তবু একদিকে আপনি নিশ্চিন্ত। নইলে স্টোরে স্টক শর্ট আছে এই অজুহাতে হয়তো টাকাগুলো আটকে দিত অফিস।

ঠিক সেই মুহূর্তে হাতে একটা বই নিয়ে বেশ হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন অমলেশবাবু, খালি সোফার দিকে চোখ পড়তে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, সে কী! প্রতুল চলে গেছে? নন্দিতা তুমি একবার বললে না ওকে বসতে! সামনে পরীক্ষা, আমার যে ওর কাছ থেকে একটা অঙ্ক দেখিয়ে নেওয়ার ছিল। কিছুতেই মিলছে না!

অমলেশবাবুকে বেশ অস্থির দেখাচ্ছিল তখন, তাঁর

কপালে উৎকণ্ঠার কুঞ্চন। পর মুহূর্তে তাঁর চোখ পড়ল গার্গীর দিকে, আ রে সুদক্ষিণা, তুমি এখনও আছ? দাঁড়াও তোমাকে অঙ্কটা দেখাই। বলে একেবারে গার্গীর কাছ ঘেঁসে বসে পড়ে বইটা এগিয়ে দিলেন, দ্যাখো তো, অঙ্কটা তুমি কষতে পারো কি না!

গার্গী দেখল সেটি একটি ইংরেজি অভিধান। বেশ ঢাউস আকারের। গার্গীর শরীরে বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল অমলেশবাবু এত কাছ ঘেঁসে বসেছেন বলে। তবু তাঁর দিকে তাকিয়ে কী যেন পরখ করছিল তীক্ষ্ণ চোখে, হঠাৎ বলল, এ অঙ্কটা তো আমারও জানা নেই, অমলেশ। তবে প্রতুল বলছিল ও নাকি পুলিশের কাছে যাচ্ছে। ওদের কোম্পানির স্টোরে অনেক লক্ষ টাকার মাল শর্টেজ বেরিয়েছে। প্রথমে একটা এফ আই আর করবে। তারপর একটা মেন্টাল অ্যাসাইলামের খোঁজ করবে।

গার্গী লক্ষ করছিল অমলেশবাবুর অভিব্যক্তিতে কোনও পরিবর্তন ঘটছে কি না তার কথায়। রঞ্জনার মুখ কিছুটা ফ্যাকাসে, কেন? পুলিশে এফ আই আর করবে কেন?

গার্গী চিন্তিত স্বরে বলল, স্টোরে নাকি কয়েক লক্ষ টাকার মাল শর্ট। সামনেই অডিট। এফ আই আর না করলে ম্যানেজমেন্ট নিজেদের বাঁচাতে পারবে না অডিটের কোয়ারি থেকে।

বলেই বলল, কিন্তু তাতে অমলেশবাবু ফেঁসে যাবেন নিশ্চিত। পুলিশ ওঁকে অ্যারেস্ট করতে পারে।

গার্গী লক্ষ করছিল অমলেশবাবুর চোখেমুখে ফুটে উঠছে এক প্রবল অস্থিরতা। তিনি বড়ো বড়ো পা ফেলে ঘুরতে শুরু করলেন মেঝেয়। একবার সোফায় বসে মাথা নিচু করে রইলেন কিছুক্ষণ। পরক্ষণে উঠে চলে গেলেন ভিতরের ঘরে।

তাঁর এই অস্থিরতা চোখ এড়ায় না গার্গীর। রঞ্জনাকে বলল, অমলেশবাবুর বন্ধু দেবকৃষ্ণবাবুর ফোন নম্বর আপনার কাছে আছে? যদি থাকে আমাকে নম্বরটা দেবেন?

রঞ্জনা অবাক হয়ে বললেন, হ্যাঁ, আছে। বলে ভিতরের ঘরে গিয়ে নিয়ে এলেন ফোনের ডায়েরিটা, পৃষ্ঠা খুলে বললেন, হ্যাঁ এই তো, নাইন ফোর...

দেবকৃষ্ণবাবুর মোবাইল নম্বর নিয়ে গার্গী উঠে পড়ে সোফা থেকে, রঞ্জনাকে বলল, অমলেশবাবু কিছুদিন ধরে কোনও একটি সমস্যায় পড়েছেন। আপনি জানেন কি না জানি না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সেই সমস্যার আবর্তে পড়েই ওঁর এই স্মৃতিভ্রষ্টতা।

রঞ্জনার মুখখানা কালো হয়ে গেল মুহূর্তে, কিছু বলবেন-বলবেন করেও যেন বলে উঠতে পারলেন না গার্গীর কাছে। সোনালিচাঁপাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে তক্ষুনি মোবাইলে ধরলেন দেবকৃষ্ণবাবুকে, নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, দেবকৃষ্ণবাবু, আপনি নিশ্চয় জানেন কেন অমলেশবাবুর এত টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল গত কয়েক মাসে?

ওপাশ থেকে দ্বিধামিশ্রিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন, ম্যাডাম। অমলেশ কোনও সাট্টাদারের পাল্লায় পড়েছিল যেখানে বহু টাকা ঢেলে সর্বস্বান্ত হয়েছে, এখন স্টোর থেকে মাল পাচার করে ওকে সেই ঋণ মেটাতে হচ্ছে প্রতি মাসে। আমরা অনেক বারণ করেছিলাম ওকে, কিন্তু বাগে আনতে পারিনি। তারপর যখন হুঁশ ফিরেছে, বিষয়টা উপলব্ধি করে এখন ওর মাথাটা বিগড়ে গেছে একেবারে।

গার্গী বুঝে ফেলল বিষয়টা, বলল, দেখুন, অমলেশবাবু কিন্তু সত্যিই পাগল হননি।

ওপাশ থেকে দেবকৃষ্ণবাবুর বিস্মিত স্বর, কী বলছেন আপনি?

—ঠিকই বলেছি। উনি বিপ্লবাবুকে ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে নিজে পাগল সেজে চেষ্টা করছেন ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতে।

—তা আপনি কী করে বুঝলেন?

—ওঁর সামনে আমি পুলিশে ডায়েরির কথা বলেছি। বলতেই কিন্তু ওঁর ভিতরে এমন চাঞ্চল্য লক্ষ করেছি, তাতেই বুঝে গেছি উনি সত্যিই পাগল হননি। পাগল হওয়ার ভান করছেন।

মোবাইলেই বিষয়টা আরও খোলসা করে বলল গার্গী, দেখুন দেবকৃষ্ণবাবু। আপনাদের কোম্পানির ওই স্মৃতিবর্ধক ট্যাবলেটের এমন কোনও গুণ থাকতে পারে না, যার ফলে টাইম মেশিনে চড়ে অমলেশবাবু পৌঁছে যাবেন কলেজ লাইফের দিনে। আসলে যা হয়েছে তা হল, গত একবছরে হঠাৎ এমন কারও পাল্লায় পড়েছেন যার ফলে ওঁর অনেক টাকার প্রয়োজন হয়েছিল। ফলে স্টোর থেকে নিয়মিত মাল পাচার করছিলেন, সেই টাকায় সাট্টার ঋণ মেটাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে অফিস থেকে রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট যা পাওয়ার প্রায় সব পেয়ে গেছেন। তাই রিটায়ারমেন্টের কয়েক দিন আগে ইচ্ছে করে ছুটি নিলেন। তারপর 'ডিফেক্টটিভ' লেবেল আঁটা ফাইল থেকে অনেকগুলো ট্যাবলেট খেয়ে নিলেন পাগল সাজতে। লেভেল নিজেই এঁটেছিলেন সম্ভবত। এর আগেও কয়েকবার স্টোরের চার্জ দিয়েছিলেন অফিসের অন্য কাউকে। এসব অফিসে যা হয়, পাঁচ দিন বা একদিনের চার্জ নিলে কেউ স্টক গুনে নেয় না, নেওয়া সম্ভবও নয়। অমলেশবাবু সেই সুযোগটাই নিতে চেয়েছিলেন হঠাৎ দু-দিনের ছুটি নিয়ে।

—কিন্তু অমলেশবাবু যে পাগল হননি তা আপনি বুঝলেন কী করে?

—আমি দেখলাম উনি অনেক কিছু ভুলে যাওয়ার ভান করলেও রঞ্জনার নাম যে নন্দিতা, জি. এম. কে বার বার প্রতুল বলে ডাকছেন অথবা আমাকে সুদক্ষিণা বলছেন, এই নামগুলো কিন্তু ভুল হচ্ছে না, একবারও। তারপর পুলিশে এফ আই আর করার কথা বলতেই তিনি যেভাবে বিচলিত হয়ে পড়লেন, তাতে বুঝে গেছি তিনি পাগল নন। আপনি এখন কোম্পানির জি. এম. কে বলুন বিষয়টা যথাস্থানে বলে অমলেশবাবুর বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে।

মোবাইল বন্ধ করতেই গার্গী দেখল, সোনালিচাঁপার চোখ বিস্ফারিত। বলল, গার্গী, তুমি অমনি বুঝে ফেললে সব?

গার্গী কণ্ঠস্বর নরম করে বলল, কিছু করার নেই, সোনালিচাঁপা। রঞ্জনা যে-মুহূর্তে আমাকে বললেন অমলেশবাবু রোজ দেরি করে বাড়ি ফিরছেন, তখনই বুঝে গেলাম কোথাও একটা গোলমাল বাধিয়েছেন অমলেশবাবু। তারপর দেবকৃষ্ণবাবু আসল কারণটা জানাতে পরিষ্কার হয়ে গেল সব।

ছবি : ওয়াসিম হেলাল

হীরের টুকরো

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। হ্যাঁ, ক-বছর তাও মনে আছে রত্নার। তখন সে মাত্র এগারো বছরের। বাবার সঙ্গেই দাঁড়িয়ে ছিল। আগেকার অন্ধকার—বাবা যা গল্প করেন—এখনো মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়, করতেন বলাই উচিত—তা হোক, সেই সাইরেন বাজানো অন্ধকার—এ তা নয়। এখন সরকারি কর্মচারীদের শৈথিল্যের জন্য কৃত অন্ধকার। বলা নেই কওয়া নেই—ঝুপ করে অন্ধকার হয়ে যায়। চারদিকে ঝলমল করছে আলো, হঠাৎ পাড়াসুদ্ধ নিকষ কালো অন্ধকার।

সেদিন রবিবার। ওঁদের দোকান বন্ধ, বাবা বিকেলে বার তিনেক চা খেয়ে অলস সন্ধ্যাটা উপভোগ করছিলেন। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যেতে মনে হল, বাইরে রাস্তাঘাট দেখার মতো ঘটনা তো অন্য দিন দেখা যায় না—আজ দেখা যাক।

সঙ্গে সঙ্গেই রত্না বেরিয়ে এসেছিল, বাবার লুঙ্গিটা ধরে—তখনই এই ঘটনাটা ঘটল।

আকস্মিক, অকারণ, স্বপ্নাতীত।

ভদ্রলোক ব্যবসাদার। পৈতৃক ব্যবসা, মনোহারির দোকান। তখন ছিল সামান্য, পরে বড় ছেলে কেশব, তার তখন পঁচিশ বছর বয়স, ছোট মাধবের তেইশ—এরাই খেটেছে। প্রাণপণে খেটেছে। সামান্য থেকেই দোকানটিকে অসামান্য করে তুলেছে। অবশ্য প্লান-প্রোগ্রাম কেশবেরই, শুধু আমদানি করা মনোহারি বস্তু নয়—কিনে এনে বিক্রি করা—তাতে থামেনি কেশব—কিছু কিছু জিনিস তৈরি করেছে ছোট ছোট কারখানা করে। ক্রমশ সে কারখানা বেড়েছে। সেটা কেশবই দেখেছেন। মাধব দোকানটি।

'ঝাঁপ বন্ধ করা' যাকে বলে—সব বন্ধ করে দুই ভাই হিসেব-নিকেশ নিয়ে বসতেন—ফলে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা, এক-একদিন বারোটাও বেজে যেত।

অর্থ এলেই অনর্থ—কথাটা প্রতিদিনেই যেন জপমালার মতোই মনে করে রত্না।

এবার একদিন কেশবই কথাটা তুলল। বলল, 'দ্যাখো, এখন তো আমরা একান্নবর্তী নই, স্ত্রীরা এলে একস্তরে থাকাও যায় না। দুজনেরই ছেলেমেয়ে আছে, ভবিষ্যৎ—। তুমি ভালো করেছ পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে দিয়ে ভাড়াবাড়িতে উঠেছ, এ তোমার মহত্ত্ব। তা তেমনি আমি ভালো জমি কিনে, প্ল্যান পর্যন্ত করে দিয়েছি—বাড়ি উঠতে শুরু করেছে। তোমার না অসুবিধা হয়, সেদিকে লক্ষ রাখি সর্বদা। তা আমি বলি কি, তুমি যেমন মনোহারি দোকানটা দেখছ—তোমার চেষ্টাতেই অনেক বাড়িয়েছ, ওটাই তোমার থাক, আমি কারখানাটা নিই—কী বল?'

মাধব এইটেই আঁচ করেছিল, তার জন্য প্রস্তুত ছিল। বলল, 'তা কেন দাদা, সংসার আলাদা হয়েছে হোক, ব্যবসা একসঙ্গেই থাক, এরও অর্ধেক লাভ তুমি নেবে, আমিও কারখানার অর্ধেক লাভ নেবো। এতে ঝগড়াঝাঁটির তো কারণ নেই। যেমন চলছিল তাই থাক না!'

এই সূত্রপাত।

প্রথমে বুঝিয়ে বলা, তারপর একটু কটু কথা। মনের বিষ উদ্গার করা। এটর্নি উকিল আসা-যাওয়া শুরু হল।

এইভাবেই চলছে, এমন সময়ে এই কাণ্ড।

যে বাড়িতে মাধব আছে—একতলা, নিচু। পাওয়া যায়নি বলেই এ বাড়িতে আসা। তাছাড়া বাড়ি তৈরি চলছে, একতলা থাকার মতো হলেই সে বাড়ি চলে যাবে। এমন কোনো জীবন-মরণ টানাটানির মতো হবে তা মাধব ভাবেনি।

সেদিন রবিবার আগেই বলেছি। ছুটির দিন, অলস দিন, সন্ধ্যার মুখে হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল (এ অবস্থা তখন প্রাত্যহিক ছিল না, তবে প্রায়ই হতো)। মাধবের মনে হল এমন অবস্থা কখনো বাড়ি বসে দেখেনি, কারণ কাজের দিনে দোকান থেকে ঘরে ফিরতে এখনো দেরি হয়—আজ একবার বাড়ির দরজায় গিয়ে দেখা যাক। সে এসে বাইরে দাঁড়াল। তখনো হ্যারিকেন জ্বালার বোধহয় সময় হয়নি। অকস্মাৎ একটা লোক সাইকেলে যেতে যেতে একটা রিভলবার থেকে গুলি করেই তীরবেগে চলে গেল। মাধবের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এখনো মনে হয় রত্নার, সেই সন্ধ্যের ঘটনাটা ভাবলে আজও যেন মনের সে অবস্থা হয়ে পড়ে। বিহ্বল? না, আরো বেশিরকম কিছু। রত্না তখন বেশ ছোট, বাবার সঙ্গে রত্নাও বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, বাবার লুঙ্গির একটা প্রান্ত ধরে।

ঘটনাটা কী হল—ভাবতেই তো খানিকটা সময় গেল। ততক্ষণে অবশ্যই অনেকে বেরিয়ে এল। তারপর পুলিশ ইত্যাদি।

কেশব খুব হাহাকার করলেন। ঐ দোকান বেশ মোটা টাকায় বিক্রি করে সব টাকা ভাইবউয়ের হাতে তুলে দিলেন, কী ভাবে টাকা সব লগ্নী করা যায় তাও শিখিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, বাড়িটা যতদূর সম্ভব তৈরি হয়ে যাক, তা তিনি দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করেছেন। গৃহপ্রবেশের দিনও দাঁড়িয়ে থেকেছেন, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে।

কেউ কোনো অভিযোগ করতে পারবে না। মহাদেবের মতো বড় ভাই—সকলেই ধন্য ধন্য করলে।

মাধবের একটি মেয়ে—সেটিই রত্না। ছেলেটি মাত্র ছয় বছরের। সুতরাং ব্যবসা করার মতো কেউ সাবালক হয়নি।

রত্না বড় হয়েছে, এম. এসসি. পাশ করেছে, কলেজে চাকরি করছে।

বিয়ের কথা তোলে মা, রত্না শুধু বলে, 'না মা, সে সময় হয়নি এখনো।'

রত্না সেদিনের কথা ভুলতে পারেনি। সেই অভিশাপপূর্ণ সন্ধ্যারাত্রির কথা!

বাবার এই অপঘাত মৃত্যুর শোধ নেবে সে, তার আগে আর কোনো কথা ভাববে না। সে কথা কাউকে বলতে পারেনি, পাছে ঘাতকটি সতর্ক হয়ে ওঠে। খবরের কাগজেও এ সম্বন্ধে কোনো 'রা'ও তুলতে দেয়নি।

মনে থাকার কথা নয়। বলতে গেলে পলকের কথা, এই ঘটনা। তবু মনে আছে রত্নার—পিস্তলের আলো জ্বলে ওঠার মুহূর্তটিতেই একটি আংটির ছবি চোখে পড়েছিল—মধ্যে কী একটা পাথর তা দেখা যায়নি, পাথরটির দুপাশে ছোট ছোট হীরের দুটো টুকরো চোখ পড়েছিল।

যত ছোটই হোক, তারও জেল্লা অসাধারণ।

একবার মনে হয়, এতে কি—এই সামান্য পাথরের দ্যুতি ওকে পথ দেখাতে পারবে?

কিন্তু আকস্মিক ভাবেই ঘটনার যোগাযোগ ঘটল। কলেজের সেমিনার উপলক্ষে দ্বারভাঙায় যেতে হল রত্নাকে। মোকামা জংশনে নেমেছে রত্না, পরের ট্রেনে দ্বারভাঙ্গা যাবে। অকস্মাৎ ওর চোখে পড়ল, আগে মানুষটা নয়, আগেই সেই পাথরটা। মাঝখানে বড় মুক্তো একটি, আর দুপাশে দুটো হীরের টুকরো ছোট ছোট।

চোখ জ্বলে উঠল রত্নার।

এতদিনে পেলাম! তবে কি বাবার আত্মা পথ দেখিয়ে দিল?

কিন্তু যার হাতে আংটি—সে যে ঘাতক হবার মতো নয়।

বাঙালি তো বটেই, বয়স ২৫ থেকে ২৮-এর মধ্যে, অতি সুপুরুষ এবং বড়ঘরের কোনো ছেলে।

সম্ভবত কোনো কাজেই এসেছেন বা এসেছিলেন।

পরিচয় তো নেই-ই, হঠাৎ কথাটা পাড়লে খারাপ দেখাবে না? অথচ—

না, সময় নেই।

একেবারেই সামনে এসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, এ আংটিটা কোথা থেকে পেয়েছেন?'

ভ্রূকুটি দেখা দেবে বই কী।

সঙ্গে সঙ্গেই রত্নাও সে ভুলটা বুঝলে।

একেবারে হাতজোড় করল রত্না। 'দেখুন, কথাটা এভাবে বলা উচিত নয়, তা আমি বুঝি, কিন্তু হঠাৎ আপনাকে দেখলুম, এই আংটিটা হাতে—আমার যে এর সঙ্গে একটা ভয়ংকর—ভয়ংকর কথাটা জোর দিয়েই বলছি—স্মৃতি। তাই—'

নরম হলেন ভদ্রলোক। বললেন, 'আমি তো এত জানি না, কিছুই জানি না। একটা মোকদ্দমার ব্যাপারে এসেছি, আমি সবে অ্যাটর্নিগিরি ধরেছি—এসেছিলুম ভাগলপুরে এক উকিলের কাছে, সেই প্রসঙ্গে কথা হতে হতে উকিলবাবু বললেন, আপনার তো টাকা আছে, একটা আংটি কিনবেন? অতি মহার্ঘ্য, আংটি, জলের দামে বিক্রি করতে চাইছে একজন। এই উর্দুবাজারের মধ্যেই—এক হাজার টাকা পেলেই দেবে।'

'তার মানে চোরাই?'

'হ্যাঁ। এসব আংটি চোরাইতে আসে বা খুনোখুনি—। তাতে কী, আপনার শখ থাকে তো নিন, আমি জিম্মাদার।'

'তা শখ হল। নিয়ে নিলাম। ইতিহাস এইটুকু।'

রত্না বলল, 'আংটিতে আমার লোভ নেই, ও সর্বনেশে আংটি। আমি সে লোকটিকে চাইছি। তার হদিশ কোথায় পাব?'

'তা আমিও জানি না। তবে, যাবেন আমার সঙ্গে ভাগলপুরে? আমার যে কৌতূহল হচ্ছে খুব!'

'তাহলে তো আমি বেঁচে যাই। চলুন চলুন।'

উর্দুবাজারে গিয়ে উকিলবাবুকে ধরতে তিনি বললেন, 'কে দিয়েছে তা জানি, কিন্তু সে কি আর এক হাতে এসেছে—দেখি।'

ডেকে পাঠালেন। সে লোকটি—দিল মহম্মদ নাম, প্রাণভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এল, আগেই কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'আমি কিছু জানি না হুজুর, ঐ দুধওয়ালা বললে, তার কে আত্মীয় হয়, সেই বললে—'

'ঠিক আছে, তাকে আনতে হবে। দুধওয়ালাকে বলো এসব কোনো ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার নয়, একটা ঠিকানা জানতে চাই।'

দুধওয়ালা এবার সঙ্গে করে নিয়ে এল আর একজনকে। সেও কাঁদো-কাঁদো। বললে, 'বাবু, এক বাঙালিই আমার কাছে এসে বললে, আমি এটা কমদামেই পেয়েছি, যে বেচেছে সে বোধহয় কোনো চোরাই মাল পেয়ে থাকবে—বলেছে, আমি কাশী চলে যাব, ওখানে কোনো কাম যদি পাই, আমাকে তো কেউ বিশেষ চেনে না—তুমি যা হয় দাও। তা আমি অনেক টানাটানি করে চারশো টাকা দিয়েছিলুম বাবুসাহেব, তারপর এই হাত ঘুরতে ঘুরতে—'

অ্যাটর্নি দেবেশবাবু বললেন, 'তুমি ঠিক জানো সে কাশীই চলে গেছে?'

'তা কী করে জানব বাবু! তবে অন্য কোনো জায়গায় গেছে কিনা—' বলতে বলতে বলে উঠল, 'একবার শুধু বলেছিল, আচ্ছা দ্বারভাঙা যেতে হলে কোন্ গাড়িতে চড়তে হবে? অবশ্য যাব না এখন—ওখানে আমার এক বহিন আছে—যা হোক সে পরে হবে।'

'দ্বারভাঙ্গা শহর?'

'তা বলতে পারব না। তবে বাঙালি দ্বারভাঙ্গা শহরেই বেশি।'

আর দেরি করল না দেবেশ আর রত্না। রত্নার তো দ্বারভাঙাতেই যাবার কথা। দেবেশের কৌতূহল ও সংশয় আংটি নিয়ে। উকিলবাবু জোর করে খাইয়ে রাত্রের ট্রেনেই ওদের তুলে দিলেন।

দেবেশের দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় থাকেন দ্বারভাঙায়, নন্দবাবু' তিনিও উকিল। দেবেশরা প্রথমে ওখানেই গেলেন।

'আরে আসুন আসুন, এ কী ভাগ্য আমার!'—বলতে বলতে সঙ্গে করে সামনের বড় বারান্দায় বসালেন নন্দবাবু। প্রবাসী বাঙালিরা অতিথিপরায়ণ হন। ওখানে চেঁচিয়েই স্ত্রীকে বললেন, 'ওগো শুনছ, দেবেশরা এসেছেন, আগে চা দাও, মুখ হাত ধোওয়ার জল পাঠাও—দেরি কোরো না।'

দেবেশ বললেন, 'কী বিপদ, এমন হইচই করবেন জানলে আসতুম না!'

'বটে! অ্যাটর্নি হয়েছেন বলে একেবারে আসতুম না বলে বসলেন! এত অধৈর্য কেন? এই ইনি? বিয়ে হয়েছে, না হবে?'

দেবেশ বললেন, 'সত্যি, এই জন্যেই বলে গাঁওয়ার! দুম করে বলে বসলেন। কিছুই না। ইনি একটি জিনিসের জন্যে খুব ব্যগ্র। মোকামা জংশনে পরিচয়, ওঁর জন্যেই

উজানে আসতে হল—আর কিছু না।'

নন্দবাবু একটু অপ্রস্তুত হলেন।

যাইহোক, চা হল, প্রচুর লুচি-তরকারি এল, মিঠাই। মুখ-হাত ধোওয়ারও অসুবিধা হল না।

তার মধ্যেই রত্নার আংটির কথাটা উঠল।

সব শুনে নন্দবাবু বললেন, 'বিপদে ফেললেন, এখন দ্বারভাঙা আগের মতো এতটুকু নয়। নতুন এসেছে, বোনের কাছে। এইটুকু শুধু জানেন। খ্য়ের! দেখি কী করা যায়!'

দেরি হল বিস্তর। নন্দবাবু তিন-চারজনকে লাগিয়ে দিলেন। তাতেও সময় লাগল। স্নান করে উঠেও উদ্‌বিগ্ন হয়ে বসে রইল রত্না। এই উদ্‌বেগ নিয়ে সেমিনারের আলোচনাতেও যোগ দিয়ে লাভ হবে না। এই ভদ্রলোককে নিয়ে আসা, খরচাও নিচ্ছেন না—তার সঙ্গে এই আতিথেয়তা। বড় লজ্জায় পড়ে রইল।

তবে বিকেলের মধ্যেই সে লোকটিকে পাওয়া গেল। হ্যাঁ, লোকটি বোনের বাড়িই এসেছে, সেও নাকি অনেকদিন পরে—বিয়ের পরেই বলতে গেলে।

যে লোকটি এল, মাঝারি ধরনের গড়ন। তবে বেশ একটু মাথা উঁচু করা লোক। অপরদের মতো কাঁপতে কাঁপতে আসা নয়।

আরো লক্ষ করল রত্না, বাঙালি হয়েও উচ্চারণটা যেন বহুদিনের ঐ অঞ্চলের বাসিন্দাদের মতো।

প্রশ্নটা নন্দবাবুই তুললেন।

উকিল মানুষ। দেখেই বুঝলেন, এ মাথা উঁচু করা লোক। সেই ভাবেই কথাবার্তা চালালেন।

'তুমি বাপু, এই আংটিটার কথা কিছু জানো?'

'জানি বই কী বাবু, এর অনেক কাহিনি। আপনারা কেউ শচীদুলালবাবুকে চিনতেন?'

'না, কে শচীদুলাল? শুনিনি তো!'

'আপনাদের অবশ্য জানবার কথাও নয়। সে যাক, তিনি কলকাতারই লোক, লেখাপড়া জানা। আপনারা কেউ কলকাতারই এক লোক—কেশববাবুকে চেনেন? শুনেছি খুব ভারী ব্যবসার মালিক!'

'জানি বই কি। আমার জেঠামশাই। তিনি এর মধ্যে—', রত্না উৎকণ্ঠায় বিস্ময়ে কথা শেষ করতে পারল না।

মুখে চু-চু শব্দ করে বললে, 'সে যাক, কথাটা তো পাড়তেই হোত। যাক, আগে শচীদুলালের কথাটাও বলি। ঐ ভবানীপুরেরই মানুষ, লেখাপড়া-জানা লোক, টাকা কড়িও ছিল। বিয়েও হয়েছিল ভালো মেয়ের সঙ্গে—কিন্তু একরকম লোক থাকে জানেন তো, এরা অধঃপাতেই নামতে চায়। প্রথমটা শুরু হল জুয়া-খেলায়। ঘোড়দৌড় তো বটেই, তাছাড়া নানারকম শুরু হল। ফলে বাজে বজ্জাত লোকেদের পাল্লায় পড়ল। আনুষঙ্গিক তো সবই আছে, এমন লোক অধঃপাতের জন্য ব্যস্ত হবেই।

'টাকা হাতে না থাকলে নানান ফিকিরে টাকার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়ায় ওরা। ক্রমে যেমন সব রকম নেশায় চতুরং, তেমনি সব রকম পাপে। আপনাদের কেশববাবু নাকি এইরকম লোকই চেয়েছিলেন। শচীকে ডেকে এনে বললেন, দ্যাখো, তুমি নাকি সব কুকর্ম করে বেড়াও! মানুষ মারতে পারো? শচী বললে, হ্যাঁ, পারি বই কী। ওটা অবশ্য এখনো হয়নি। তবে মোটা টাকা পেলে সেটাও শুরু করতে পারি।

'কত চাও?' কেশববাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন।

'দশ হাজার চাই। আর পাঁচ বোতল বিলিতি হুইস্কি।'

'না, অত হবে না। পাঁচ হাজার পাবে আর অল প্রোটেকশন।'

'এই নিয়ে নাকি অনেকক্ষণ দর-কষাকষি হয়। শেষ পর্যন্ত রফা হল—কিছু মনে করবেন না বাবু, এ ঐ শচীবাবুর কাছেই যা শোনা—ছ-হাজার টাকা, একটা রিভলবার, আর ঐ যে কেশববাবুর হাতের আংটি—ওটা চাই।

'কেশববাবু খুব ধস্তাধস্তি করেছিলেন, সদ্য নাকি কোনো বিলাইতি সাহেবে কাছ থেকে কিনেছেন আড়াই হাজার টাকা দিয়ে—কিন্তু শচীরও ঐ বুলি ছিল, নইলে হবে না। অগত্যা ঐ আংটি খুলে দিতে হল।

'তারপর—যা মনে হচ্ছে, আপনাদের আত্মীয়। খুন করতে এক মিনিটও লাগেনি, তা নিয়ে যতই হট্টগোল হোক, শচীকে কেউ জড়াতে পারেনি। জড়ালেন কেশববাবুই। তাই-ই শচীর সন্দেহ। শচী এটা ভাবেনি কখনো। কেশবের লোকজন ছিল, অন্য একটা ব্যাপারে এমন ভাবে ফাঁসিয়ে দিলেন—শচীরও তো অগুণতি ছিদ্র জীবনে—পুলিশও একেবারে প্রস্তুত হয়েছিল—মামলা সাজানোরও কোনো খুঁত হয়নি—জেলে চলে গেল ছ-বছরের জন্য। আর আমি ওঁর মুখে সব শুনে যা বুঝেছিলুম, ওকে আর বাইরের বাতাস পেতে হবে না।'

দেবেশ স্থির মুখে সব শুনে বললেন, 'এসব তুমি জেলের মধ্যেই জেনেছ তো, না?'

'হ্যাঁ হুজুর। মিথ্যে বলব না। ভালো কিছু করতে গিয়ে মন্দ পথে পা দিয়েছিলুম। আমি অবশ্য জেলে গিছলুম শচীবাবুর জেল হবার অনেক পরে। আমার সাজাও ছিল কম, আড়াই বছর।'

'তা ও আংটি তুমি পেলে কী করে?'

'বলছি বাবু, আমি ওঁর মতো পাঁড় বদমাইশ ছিলাম না। কিছু দিক-এর জন্যই এটা হয়েছিল—সেই জন্যেই

হোক, আর এমনিই আমি বাবু নির্বিরোধী মানুষ, সে-ই আমাকে একদিন নিভৃতে বললে, দ্যাখো, আমার যা শরীরের অবস্থা, অনেক রকম অত্যাচার চালিয়েছি তো এই শরীরটার ওপর— বেশিদিন বাঁচব না, যদি বা বাঁচি, কেশববাবু হয়তো অন্য ফাঁদে জড়াবেন। পুলিশ তো ওঁর পয়সা খেয়ে বসে আছে। তোর ওপর আমার একটা ভালোবাসা হয়েছে। আমার সবচেয়ে শখের জিনিস একটা আংটি, দামি বলে নয়, বিলিতি সেটিং, এমন আর দেখিনি কখনো— কেশববাবুরও খুব শখের জিনিস, সবে আঙুলে পরেছেন, সেইটে আমি জোর করে আদায় করেছিলুম। কেশববাবু ভেবেছিলেন জেলে পোরবার সময়ে কেড়ে নেবেন—তা পারেননি। অনেক প্যাঁচ শিখেছি বজ্জাতদের সঙ্গে—সেটা নিতে পারেনি।...অথচ আমারও ভোগে লাগল না, ওটা অভিশাপের আংটি। তুই নিয়ে যদি কোনোমতে বার হতে পারিস, এটা পরবার চেষ্টা করতে যাসনি, যত তাড়াতাড়ি পারিস বেচে দিস, যা পাস।

'সত্যিই শচীবাবু বেশিদিন বাঁচেনি। আমি জেল থেকে বেরোবার মাস দুই আগেই মারা গেল। আমারও বাবু ভয় হয়েছিল, আমি অবিশ্যি কলকাতায় ভাঙাবার চেষ্টা করিনি, চলে এসেছিলুম ভাগলপুরে—যেসব পাড়ায় এই সব কথা নিয়ে ঘোঁট হবে না, সেই জায়গাতেই এটা দিয়েছি আর যা দিয়েছে তাই নিয়েছি। এই আমার কথা। এখন আপনারা মালিক।'

বলে লোকটি চুপ করল।

ওকে কিছু বলার ছিল না, ওকে নিয়ে কোনো কাজেরও প্রয়োজন নেই।

সেই আংটি নিয়ে রত্না আর দেবেশ সেইদিনই রওনা হল। ঘটনা সব শোনার পর দেবেশ আংটিটা খুলে রত্নার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। রত্না দেবেশ যে দামে কিনেছিলেন সেই দাম দিতে চেয়েছিল। দেবেশ নেননি, বলেছিলেন, 'এখন থাক, পরে দেবেন। আমি তো আপনার সঙ্গেই আছি, যবনিকা না ওঠা পর্যন্ত।'

কলকাতায় ফিরে আসার পর একদিন পরে দেবেশকে নিয়ে জেঠার বাড়ি গেল রত্না।

এটা যেন এখন স্বতঃসিদ্ধ হয়ে গেছে, দুজনকে একই সঙ্গে যেতে হবে এ ব্যাপারে।

জেঠার বাড়ি, কেউ কিছু বলার নেই, সবাই অভ্যর্থনা করল, কেবল দেবেশ সম্বন্ধে একটু জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন রয়ে গেল।

রত্না জিজ্ঞেস করল, 'জেঠু কোথায়?'

'ওঁর কদিন শরীরটা ভালো নেই, ডাক্তার আসছে। তা যাও না—তুমি যাবে তার আর কী?'

রত্না চোখের ইঙ্গিতে দেবেশকেও সঙ্গে যেতে বলল। দেবেশ সম্বন্ধে ওঁদের চোখেমুখে প্রশ্নটা শুধু ফুটে উঠল। রত্না কিছু বলল না।

কেশববাবুর ঘরে ঢুকে রত্না কোনো সম্ভাষণের অবকাশ দিল না। সরাসরিই কথাটা পাড়ল আংটিটি বার করে, 'এই যে জেঠু, কেমন আছেন? আপনার একটা শখের জিনিস ছিল, এতদিন পরতে পারেননি—এই যে সেই আংটিটা! বাবাকে খুন করতে গিয়ে টাকার সঙ্গে এই আংটিটাও দিতে হয়েছিল শচীদুলালকে, তার মরবার পরও আপনি খুঁজে পাননি। ভাইয়ের জীবনের জন্যে টাকার মূল্য যা দিতে হয়েছিল, তার সঙ্গে এটাও ছিল, না?'

কেশবাবু কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'এ—এ সব কী, কী বলছিস? এ লোকটা কে?'

প্রত্যুৎপন্নবুদ্ধিতে বলল রত্না, 'ইনি পুলিশেরই লোক। ওঁদের কাছে সবই কাগজপত্র আছে—তা আজ তো আর এ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যাবে না।'

কেশব একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে প্রায় আছড়ে পড়ে গেলেন।

আর উঠতে পারলেন না। বোধহয় আর পারবেনও না।

আংটিটা সামনেই গড়িয়ে পড়েছিল মেঝের ওপর। রত্না পায়ের জুতো দিয়ে মাড়িয়ে গুঁড়ো করে দিল।

পুনর্মুদ্রণ

ছবি : সুদীপ্ত দত্ত

দুরন্ত বিচকে

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

যাকে বলে একে বারে রোমহর্ষক সংবাদ! না, সাধারণভাবে তো বটেই, আমাদের মতো মফস্বল শহরে তো আরো।

অবশ্য খবরটা যখন প্রথম শোনা গিয়েছিল সকালে, তখন যে তেমন কেউ বিচলিত হয়েছিল, এমন নয়। খাবার-দাবারে কিছু পড়েছিল, বিষক্রিয়ায় শরীরটা খারাপ হয়েছে, এমন তো প্রায়ই শোনা যায়। একটু বেশি খারাপ হয়েছে বলে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে, এইরকমই ভেবেছিল সবাই। কিন্তু বিকেলের দিকে যখন মৃত্যুসংবাদটা এসে পৌঁছল, তখন সকলে একেবারে হতভম্ব। এরকম কিছু যে ঘটতে পারে ভাবাই যায়নি সেটা, ঘুণাক্ষরেও না।

সবচেয়ে চুপ মেরে গিয়েছিল বিচকে। সে বেচারি সবে তখন ত্রিভুবন ডাক্তারের বাড়ি ঘোরাঘুরি শুরু করেছে, ওই দোনুকাকার আকর্ষণে। এমনিতে ডাকসাইটে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ত্রিভুবন পাকড়াশির বাড়ি আর কে কখন যাচ্ছে—একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেবার পর এখন তো ওই বিরাট বাড়িতে লোক বলতেই মোটে দুজন, খেঁকুটে স্বভাবের বুড়ো ডাক্তার আর তাঁর বাতে পঙ্গু বউ সদু জেঠিমা। যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। দারুণ পশার ত্রিভুবন ডাক্তারের, নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই—সব সময়েই গিজ গিজ করছে বাড়িতে লোক। ঝাঁকে ঝাঁকে রোগী ডাক্তারকে দেখাবার আগে বান্টিদির কাছে নাম লেখাচ্ছে, দেখাবার পর গোলোক কাকুর কাছে আসছে ওষুধ নিতে। এর মধ্যে সদু জেঠিমাই ওপর থেকে নেমে দেখা করতে পারে না, তা অন্য লোক। দোনুকাকা না থাকলে ও বাড়িতে যাওয়ার কোনো গপ্পোই ছিল না বিচকের।

না, দোনুকাকাও খুব বেশিদিন আসেনি ও বাড়িতে। ত্রিভুবন ডাক্তারের মেয়ে, মানে শিবানীদির বিয়ে হয়ে গেল বছর দুয়েক আগে, সেই উপলক্ষেই এসেছিল, অন্য সব আত্মীয় স্বজন চলে গেল— দোনুকাকা আর গেল না। সদু জেঠিমার কীরকম ভাই হয়। তিন কুলে কেউ নেই, সদু জেঠিমাই একদিন বলেছিল, 'আমার এই ভাইটা আর মানুষ হল না, বুঝলি বিচকে! আর পাঁচজনের মতো ইস্কুলে যা, ভালো করে পড়াশুনো কর—তা না, বাড়িতে বাবুর মন টেকে না।'

'মানে? পড়াশুনো করেনি দোনুকাকা?'

'করবে কখন! বাড়ি থেকে পালালোই তো কতবার।'

'সেকি! কোথায়?'

'মাথার ঠিক আছে নাকি—একবার সার্কাসের দলের সঙ্গে, একবার যাত্রার দলে, একবার নাকি বেদেদের সঙ্গেও কোথায় চলে গিয়েছিল।'

যাই বলুক সদু জেঠিমা, মানুষটাকে কিন্তু দারুণ লেগেছিল বিচকের। এত সব জিনিস জানে দোনুকাকা—গিটার বাজাতে পারে, ব্যাঞ্জো বাজাতে পারে, নানারকম পশুপাখির গলার আওয়াজ নকলও করতে পারে। গোবিন্দ দারোগার একটা জব্বর কেসে দাগী চোর ধরে দেবার জন্যে দারোগাবাবু খুশি হয়ে হয়ে বিচককে টেপ রেকর্ডার উপহার দিয়েছিল একটা। সেই টেপ রেকর্ডার দিয়ে বিচকে দোনুকাকার ওই সব পশুপাখির ডাক রেকর্ডও করে নিয়েছে অনেক।

অনেক মজার মজার গল্পও বলেছে দোনুকাকা। ঘুরেছে তো অনেক জায়গা, সেইসব জায়গার নানারকম মানুষের কথা। নানা জিনিস শিখবার আগ্রহও ছিল খুব বেশি দোনুকাকার। একদিন শিবতলায় বসে বলেছিল, 'বুঝলি বিচকে, মানুষের হাতযশটাই হল বড়ো কথা, কপাল থাকা চাই সেই সঙ্গে। নইলে ইচ্ছে করলে জাম্বুর মতো চিকিচ্ছে আমিও করতে পারি।'

'ধ্যেৎ। কী যে বলো না—' বিচকে বলেছিল, 'এ তল্লাটে ওরকম ডাক্তার নেই একটা তুমি জানো! কী ভিড় হয় দেখছো?'

'দেখিনি আবার! সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে পালাই কেন তবে! কিন্তু আমি হোমিওপ্যাথির বই পড়েছি, এমন কিছু হাতিঘোড়া ব্যাপার নয়।'

'তুমি পড়েছো! সেকি!' বিচকে বলেছিল, 'তবে যে সদু জেঠিমা বলে তুমি ইস্কুল টিস্কুলে যাওনি?'

'শুধু ইস্কুলে গেলেই কি লেখাপড়া শেখা যায় নাকি!' দোনুকাকা খ্যাক খ্যাক করে হেসেছিল, 'এক ম্যাজিশিয়ানের পাল্লায় পড়েছিলাম—জাপান টাপান ঘুরেছি অনেক জায়গায়, সেই জোর করে আমায় লেখাপড়াটা শিখিয়ে ছিল। ভাষাও শিখিয়েছে দু-একটা! জাম্বুর খোদ ইংরিজি বইটা আমি পড়ে দেখেছি—ওসব কোনো ব্যাপার নয়।'

'ব্যাপার নয় মানে?'

'মানে ওই সমবিধান চিকিচ্ছে!' বিচকের ভড়কে যাওয়া মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, 'কিছু বুঝতে পারলিনি তো! আরে বাবা, কলেরার ইঞ্জেকশন নিস কেন? বসন্তের টিকে নিস কেন? রোগের জীবাণুটাই ছোট্ট করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তোর দেহে, তাই তো! তারাই আটকায় আসল রোগটা হবার চেষ্টা করলে।'

অবাক হয়ে গিয়েছিল বিচকে। ভূপেন স্যারও অমনি করেই বুঝিয়েছিল প্রথম দিন ক্লাসে। অবাক হবার প্রাবল্যটা আরো বেড়ে গিয়েছিল যখন দোনুকাকা ফের বলেছিল, অসুখ মানে তো একটা বিষ তোর দেহে ঢুকে গিয়েছে, তো সেটার একটা প্রতিবিষও আছে। মানে তুই যদি সেটা আটকাতে চাস তাহলে আগেই সেটা খেয়ে নিতে পারিস—মানে হোমিওপ্যাথির সেই ওষুধটা আর কি। তা ছাড়া ধর একটা 'ওষুধের ক্রিয়া যদি নষ্ট করতে চাস তাহলেও সেটা খেতে পারিস'—

মোটকথা, হোমিওপ্যাথিতে যে কত পণ্ডিত দোনুকাকা সেটা বুঝিয়ে ছেড়েছিল বিচকেকে। না, ছেড়েছিল বলাটা ভুল হবে, একটা গোবদা বইও পড়িয়েছিল ওঁকে, বাংলায় লেখা। বলেছিল, 'ঝেড়ে দিয়েছি এটা। জাম্বুর তো আর এখন এসব বই দরকার হয় না, দুটো-তিনটে করে ওষুধ নিয়ে এক-একটা বই, সেই বইয়ের পাহাড়। অবশ্য বই পড়ার সময় কোথায় এখন জাম্বুর! তুই নিশ্চিন্তে এটা রাখতে পারিস নিজের কাছে।

সত্যি কথা বলতে কী, হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে খানিকটা উৎসাহ ওর তৈরি হচ্ছিল ওই জন্যেই। ছোটকা অবশ্যি যথারীতি আওয়াজ দিয়েছিল, 'ওই হয়েছে মুশকিল রে বিচকে, দুটো একটা গোয়েন্দাগিরি করে গোবিন্দ দারোগাকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিস—এখন বিশ্বসুদ্ধ লোকের ধারণা হয়েছে, তোর মতো গোয়েন্দা আর ভূ-ভারতে নেই। আরে বাপু, মাথায় ঘিলু তোর একটু আছে সেটা মানছি, কিন্তু সব ব্যাপারেই যদি বিদ্যে ফলাতে যাস—'

না না, বিদ্যে টিদ্যে বিচকে ফলায়নি, একটা নতুন ব্যাপারে যদি উৎসাহ পায় তো সেটা এমন খারাপ কী!

অবশ্যি সে ল্যাটা তো চুকেই গেল! দোনুকাকা যে এইভাবে একটা দুর্ঘটনায় মারা যাবে—

সত্যি, মারা যে যেতে পারে সেটা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি বিচকে। শীতকালে পিঠে পুলি টুলি হয় মাঝে মাঝে, সদুজেঠিমার রান্নার বউ আছে একটা, বাতাসির মা—রাঁধে বড়ো ভালো, একদিন নতুন গুড়ের পায়েস খাইয়েছিল জেঠিমা। তো, সেইরকম ভালোমন্দ কিছু খেয়েই সকালে সব শরীর খারাপ, এটাই ভেবেছিল। ঠাট্টা করেই অবশ্য খবরটা দিয়েছিল ছোটকা, 'কিরে বিচকে, তোদের ত্রিভুবন ডাক্তার তো এখন নিজেই কাত।'

'মানে?'

'রাত্তিরে কী সব খ্যাঁটন হয়েছে কে জানে, ভোর রাত্তির থেকে বমি আর পায়খানা। শুধু ডাক্তার নয়, হোল ফ্যামিলি। তিনজনেরই।'

'বলো কী!'

'হ্যাঁরে ছোটখাট পেট খারাপ না, তিন জনকেই নিয়ে যেতে হয়েছে জেলার হাসপাতাল। স্যালাইন ফ্যালাইন চলছে শুনলাম।'

জেলা হাসপাতাল মানে ওদের বাড়ি থেকে বিশ-বাইশ মিনিটের রাস্তা। একবার মনে হয়েছিল ঘুরে আসি। না, আর কারো জন্যে নয়, দোনুকাকাকেই একবার দেখে আসতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু খানিক বাদেই হয়তো ছেড়ে দেবে, বিকেলেই দেখা হবে, এই মনে করেই আর যায়নি। অবস্থা যে এইরকম দাঁড়াবে—

বিকেলেই খবর এসেছিল! বাকি দুজনকে মোটামুটি খানিকটা ঠিক করা গেলেও দোনুকাকাকে বাঁচানো যায়নি। দুপুরের পরই ধাত ছেড়ে যায়। তখন একবার কলকাতায় পাঠাবার তোড়-জোড় করা হয়েছিল, কিন্তু তার আগেই সব শেষ।

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল বিচকের। দোনুকাকাকে কীরকম যেন ভালোবেসেছিল ও। তার এরকম অপঘাতে মৃত্যু হবে, ভাবতেই পারছিল না। একটু সামলে নিয়ে নিজেকে, পায়ে পায়ে গিয়ে হাজির হয়েছিল থানায়। একেবারে ঠিক সময়েই গিয়ে পড়েছিল। দোনুকাকাকে তখন পোস্ট মর্টেমের জন্যে পাঠানো হচ্ছিল গাড়ি করে।

'কী খবর বিচকেবাবু! মন খারাপ?' গোবিন্দ দারোগা বলেছিল।

'হ্যাঁ দারোগাবাবু, মনটা ভীষণ খারার্প লাগছে।'

'জানি জানি, দোনুর সঙ্গে তোমার তো খুব দোস্তি হয়ে গিয়েছিল'— গোবিন্দ দারোগা দিনরাত এই করছে, তার অবশ্য মনটন খারাপ হয় না, বললে, 'ডাক্তারবাবুরও খুব মন খারাপ।'

'দোনুকাকা এইভাবে মারা গেল বলে?'

'হ্যাঁ, সে তো আছেই, তারওপর, এই পোস্টমর্টেম হবে বলে। ডাক্তারের গিন্নি তো কান্নাকাটি শুরু করে দিলে—মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা! নিজের ভাই বলে কথা! একে এইভাবে মারা গেল, তারওপর আবার কাটা ছেঁড়া হবে—'

'সেটা ঠিক, তবে স্বাভাবিক মৃত্যু যখন নয়'—

'অ্যাই! ঠিক বলেছো; পাক্কা গোয়েন্দার মতো

বলেছো!' হাসিমুখেই বলেছিল গোবিন্দ দারোগা, 'পুলিশের কাজ পুলিশকে করতেই হবে, সে যতই বুঝি না কেন ব্যাপারটা একটা অ্যাকসিডেন্ট।'

'সেইরকমই মনে হয় আপনার?'

'কেন বিচকেবাবু, তোমার কি অন্যরকম মনে হচ্ছে নাকি!' শিয়ালের মতো চোখে ওর মুখের দিকে ভালো করে একবার তাকিয়েই হেসে ফেলেছিল গোবিন্দ দারোগা, 'না ভায়া, অন্য কিছু মনে করার কোনো চান্সই নেই এখানে। তিনজনকে একসঙ্গে মারতে চেয়ে কার কী লাভ হতে পারে বলো! হতে পারে একমাত্তর মেয়ের—তো সে তো এমনিতেই সবকিছুর মালিক। এরকম ঝুঁকি নিয়ে তার কী লাভ! সে সেটা নেবেই বা কী করে! থাকে তো নর্থবেঙ্গল!'

'বাতাসির মাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন?'

'মানে? ওদের রান্নার মেয়েটা? ধুর ধুর'—দারোগার চোখে বেশ একটা কৌতুকের দৃষ্টি টের পাচ্ছিল বিচকে, মানে ওর অযথা কৌতূহল দেখে, বললে, 'কোনোরকমে হয়ে গেছে একটা কিছু। অভাবী মানুষ, লোকের বাড়ি রান্না করে পেট চালায়—ও এসব কাজ করতে যাবে কেন!'

গোবিন্দ দারোগাই বোধহয় ঠিক বলছে, মনে হচ্ছিল বিচকের। ছোটকা বলে, দারোগাবাবুকে কয়েকবার সাহায্য করে নাকি ওর মাথায় পোকা ঢুকে গেছে। সেই পোকাটাকে তাড়াতে পারছিল না বিচকে। ছোটকাকে পটিয়ে রাজি করে সন্ধ্যের পর একবার এল জেলা হাসপাতালে।

ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং গেটে আটকেছিল। ছোটকাকে দিয়ে দারোগাবাবুকে একবার ফোন করিয়ে পারমিশন পাওয়া গেল। ডাক্তারবাবু ঘুমোচ্ছিলেন, তাঁকে বিরক্ত করতে বারণ করল ডিউটিতে থাকা নার্স, তবে জেঠিমার সঙ্গে কথা বলতে কোনো আপত্তি নেই। তবে বেশিক্ষণ নয়। ছোটকা আর সঙ্গে গেল না ও, বললে, 'এখানেই বসছি আমি, তুই ঘুরে আয়। সঙ্গে আবার কাঁধ-থলিটা নিয়ে এসেছিস কেন? দিবি আমাকে?'

'থাক আমার কাছেই।'

বিচককে দেখে ওই অবস্থাতেই একটু কান্নাকাটি করল সদু জেঠিমা, বলল 'তোর সঙ্গে তো দোনুর খুব জমেছিল। বাচ্চাদের সকলেরই ভালো লাগে ওকে। মনটা বড়ো ভালো ছিল ওর। ওকে কি কারো খারাপ লাগতে পারে, তুই-ই বল।'

'কক্ষনো না। দোনুকাকা খুব ভালো ছিল। কত গল্প বলতো আমাকে!'

'বল তো! তোর জ্যাঠাই মাঝে মাঝে নিন্দে করতো ওর নামে। জানে তো, ওসব শুনলে জ্বলে যাই আমি!'

'কেন, নিন্দে করতেন কেন?'

'এই, কাজকর্ম করে না— লেখাপড়া জানে না, মুখ্যু! রাতদিন খালি আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে'— জেঠিমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, বললে, 'আসল কথা তো অন্য।'

'কী বলো তো?'

'জ্যাঠা তোর কম কিপটে নাকি! দু-বছর ধরে ছেলেটাকে আটকে রেখেছি আমি, সেটাই রাগ। মুখের ওপর বলেও দিয়েছি আমি একদিন—যক্ষের ধন জমিয়ে তুলছো, এসব তোমার খাবে কে। সারা জীবন খালি টাকা টাকা করেই হন্যে হয়ে গেলে!'

'আচ্ছা জেঠিমা'—বিচকে আসল কথায় আসতে চাইছিল, 'কী করে এমন হল বলুন তো, সকলের একই সঙ্গে পেটখারাপ—মানে, গুরুপাক কিছু খেয়েছিলেন নাকি?'

'দূর গুরুপাক! ওসব কি আর পেটে সহ্য হয় নাকি এখন? ভেটকি মাছ এনেছিল— স্রেফ ফুলকপি দিয়ে ডালনা আর দু-খানি রুটি।'

'তাতেই এরকম হয়ে গেল!'

'কী জানি বাবা, এমন সব্বোনেশে কাণ্ড তো কখনো হয়নি! মাথার চুলটুল পেটে গেল—একটু আধটু পেট-টেট ফাঁপলো—এরকম হয়েছে, কিন্তু একেবারে ওই, নাম করতে নেই, ওলাওঠার মতো, হাতের জল শুকোচ্ছে না, শরীরে খিঁচ ধরছে—না বাপু, এমনটি আর কখনো হয়নি।'

'জেঠু কোনো ওষুধ দেননি?'

'ওষুধ! কথা বলতে পারছে না, তা ওষুধ।' সদু জেঠিমার মুখে বিরক্তি, 'তা ছাড়া ওর ওই হোম্যোপ্যাথিতে বাপু আমার বিশ্বেসও নেই। কিছু করতে পারলে আমার এই বাতের ব্যথার! কালকে আবার টপ করে এসেছে ওষুধ খাওয়াতে—

'মানে!' সোজা হয়ে বসল বিচকে, বলল, 'কালকে ওষুধ?'

'দ্যাখ না! জীবনে কখনো অসুখের জন্যে ওষুধ খেলাম না, এখন নাকি আমি শুধুমুদু ওষুধ খাবো!'

'খেলেন আপনি?'

'বাচ্চা ছেলের মতো করছে—দ্যাখো না একটু, তোমার বাতের ব্যথা কমবে, না কমলে তখন বলো!' অসুস্থ শরীরেও হেসে ফেললে সদু জেঠিমা, বললে, 'হাসিও পায় দেখলে! বললে—এই দ্যাখো, আমিও খাচ্ছি। আমাকেও একটু-আধটু বাতে ধরেছে তো!'

'আপনারা দুজনেই খেলেন ওষুধ?'

'খেলাম! দুটো মিষ্টি গুলি বই তো নয়।'

'আর দোনুকাকা?'

'দূর! তার ব্যাপারে কোনো মাথাব্যথা নেই ওর।'

ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল বিচকের। আকাশ পাতাল কত কী ভেবে যাচ্ছিল তার ঠিক নেই। সদু জেঠিমা কী সব বলে যাচ্ছিল সে সবও ঢুকছিল না মাথায়। চমক ভাঙল যখন নার্স এসে গায়ে হাত দিয়েছে—'খোকন, এবার তো উঠতে হবে।'

'ও'—বিচকে তাকিয়েছে নার্সের দিকে, না বুঝেই চলেছে, 'কেন?'

'বারে, খাওয়ার সময় হয়েছে যে।'

'ডাক্তারবাবুকেও খাওয়াবেন?'

'হ্যাঁ, ডেকে দিয়ে এলাম তো।'

'ও, উনি জেগে?' বিচকে বললে, 'আমি একটু যাবো? পাঁচ মিনিট?'

'না না'—একেবারে উড়িয়েই দিচ্ছিল নার্স, তারপরই বোধহয় মনে পড়ল গোবিন্দ দারোগা ওকে ঢুকতে দিতে বলেছে। তাই বলল, 'পাঁচ মিনিটই কিন্তু, বেশি না।'

নিজেকে একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে ঢুকল বিচকে, বসল গিয়ে, বিছানায়, বলল, 'ডাক্তার-জেঠু, এখন কেমন আছেন?'

'তুই এখানে!' ডাক্তারের ভুরু কুঁচকে উঠল, 'কী করতে এসেছিস?'

'আপনাকে দেখতে জেঠু। কেমন আছেন এখন?'

'তুই এসেছিস আমাকে দেখতে!' ভুরু সোজা হল না ডাক্তারের, বললেন, 'ম্যালা ভ্যাজ ভ্যাজ না করে সরে যা আমার সামনে থেকে।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করেই চলে যাব।' বিচকে চোখের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'রাত্তিরে আপনি কী ওষুধ খেয়েছিলেন?'

'মানে?'

'মানে, জেঠিমা আর আপনি দুজনে মিলে যে ওষুধটা খেয়েছিলেন সেটা কী?'

'ও! জেঠিমার কাছে এই সব হচ্ছিল এতক্ষণ।' কটমট করে চেয়েছিলেন বিচকের দিকে। আগুন ঝরে পড়ছিল দু-চোখে। কথা বলতে পারছিলেন না রাগে। একটু পরে বললেন, 'কী বলতে চাস স্পষ্ট করে বল।' 'শুনেছি প্রতিবিষের একটা ডোজ খেয়ে নিলে কোনো বিষের প্রতিক্রিয়া কম হয়'—বিচকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলছিল, 'আপনাদের, যেটা হয়েছিল সেটা ওলাওঠা, মানে আর্সেনিক খেলে ওরকম হতে পারে, তাই তো?'

'বল বল, বলে যা।'

'তো, আগে থেকে একটা প্রতিবিষের ডোজ খেলে প্রতিষেধক হিসেবে সেটা'—

'চোপ্!' ওই শরীরেও একটা গর্জন করে উঠেছেন ডাক্তার, 'ডেঁপো ছেলে চোপ্!' ওই শরীরেও একটা গর্জন করে উঠেছেন ডাক্তার, 'ডেঁপো ছেলে কোথাকার! এই বয়সেই বড়ো ডাক্তার হয়ে গেছ! আমাকে শেখাতে এসেছো!'

'না ডাক্তার জেঠু, শিখতে এসেছি। কথাটা ঠিক কিনা আমাকে বলবেন?'

'বলবো, বলবো'—ত্রিভুবন ডাক্তারের মুখটা ভয়ংকর দেখাচ্ছিল, বললে, 'কোনো ক্ষতি নেই আমার সেকথা বললে। তোর ওই গোবিন্দ দারোগার ক্ষমতা নেই আমার একটা চুলের ডগায় হাত দেয়। হ্যাঁ, আমি অ্যান্টিডোট আগে খেয়ে নিয়েছি—মানে আমরা দুজন। তাতে হলটা কী?'

'দোনুকাকা খাননি বলে ওটা সামলাতে পারলেন না।'

'পারলেন না—আমরা পারলাম। বিষক্রিয়া সকলেরই হয়েছিল, এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট।'

'আর্সেনিকটা কি আপনিই মিশিয়েছিলেন?'

'বেরিয়ে যা! আর একটা কথা বলবো না তোর সঙ্গে। যা, বেরো!'

গতিক সুবিধের নয় দেখে বেরিয়েই এসেছে বিচকে।

গোবিন্দ দারোগা থানাতেই ছিল। বিচকে সুইংডোর ঠেলে ঢুকে বললে, 'দারোগাবাবু, ডাক্তার-জেঠুর বাড়ির চাবিটা কার কাছে আছে?'

'সকালে ওদের হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় সেটা আমার কাছেই দিয়ে গেছে কেউ'—গোবিন্দ দারোগা বললে, 'কিন্তু ব্যাপারটা কী? তুই রাত্তিরবেলা হঠাৎ এখানে?'

'কারণ এটা অ্যাকসিডেন্ট না দারোগাবাবু, দোনুকাকাকে বিষ খাইয়ে খুন করা হয়েছে।'

'সে কিরে! কে খুন করেছে?'

'ডাক্তার-জেঠু নিজে।'

'দূর পাগলা! ওরা তিনজনেই তো রাতের খাবার

খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল! দোনুকে মারবার দরকার হলে ওরা কেন বিষ খেতে গেল?'

'কাউকে কোনো রকম সন্দেহ হবে না বলে!'

'তাহলে ওদের কিছু হল না কেন?'

'সেটা দারোগাবাবু, আপনাকে ভালো বোঝানো যাবে না। বিষের ক্রিয়া যাতে অল্প হয় সেইজন্য ডাক্তার-জেঠু আর জেঠিমা নিজেরা আগেই একটা প্রতিষেধক ওষুধ খেয়ে নিয়েছিল। ফলে ওরা বেঁচে গেল, যাকে মারতে চাইল সে মরল, ব্যাপারটা দেখেও কিছু বোঝা গেল না।'

'কী সব আজগুবি কথা বলছিস, আমার তো কিছুই ঢুকছে না মাথায়।'

'ডাক্তারবাবুর নিজের কথা টেপ করা আছে আমার টেপ-রেকর্ডারে। এটা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম এই জন্যেই'—বিচকে বললে, 'আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা শুনুন।'

'বলে ফেলো।'

'কালকে ডাক্তারবাবুদের বাড়ি ভেটকি মাছের ডালনা আর রুটি হয়েছিল। কাজেই বিষ দেওয়া হয়েছিল ওই ডালনাতে। রাতের বাসন তো মাজা হয়নি—আপনি ডালনার বাটি পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়ে দিন, ওতে আর্সেনিক পাওয়া যাবে।'

'বলছো?'

'বলছি। দোনুকাকার পোস্টমর্টেমের রিপোর্টেও স্টমাকে আর্সেনিক পাওয়া যাবে বলেই মনে হয়।'

'কথা হচ্ছে বাটিতে সেটা মেশালো কে?'

'দিদি তো আর ভাইকে বিষ দেবে না, ওটা বাতাসীর মাই করেছে'—বিচকে বলল, 'ওই যে বললেন না তখন, অভাবী মানুষ! ডাক্তারজেঠু টাকা দিয়েই করিয়েছে ওকে কাজটা। অবশ্য সেটা নিশ্চয়ই ও স্বীকার করবে না!'

'স্বীকার করাবার রাস্তা আমি জানি কিন্তু কথা হচ্ছে এতবড়ো ডাক্তারটা এরকম একটা জঘন্য কাজ করতে গেল কেন?'

'সহ্য করতে পারতেন না কাজকর্ম না করে ঘাড়ের ওপর বসে একজন অন্ন ধ্বংস করবে। অথচ জেঠিমাকে বলতে সেটা ভয় পেতেন।'

'এমন একটা কাজ করতে ভয় পেলেন না!'

'ওই যে বললেন, এত বড়ো ডাক্তার! জানেন কারো ধরার ক্ষমতা নেই, তাই ভয় পাননি। দোনুকাকা যে তাঁর বই পড়েই সব জেনে বসে আছে, আমাকে আবার সব শিখিয়েছে, এটা তো বুঝতে পারেননি! যাক গে, আমার যা বলবার ছিল আমি বলেছি, টেপও থাকল আপনার কাছে, এবার আপনার যা করবার আছে, আপনি করুন।'

কপালটা সত্যি ভালো বিচকের। ওর দোনুকাকা মারা যাবার সপ্তাহখানেক পরেই লাভ হয়েছে একটা দুর্দান্ত ক্যামেরা। গোবিন্দ দারোগাই দিয়েছে ওকে। আমরা এখন যখন-তখন ফটো তোলবার জন্যে ওকে তেল মারি।

এটা অবশ্য পরের কথা। আগের কথাটা হল, খাবারের পাত্রে কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছিল, দোনুকাকার পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও তাই। বাতাসির মার ঘর সার্চ করে, বিছানার তলায় কড়কড়ে দু-হাজার টাকার বান্ডিল পাওয়া গিয়েছিল, তারই গুঁতোয় সব স্বীকার করে ফেলেছে ও। শুধু টেপ রেকর্ডারের জবানবন্দী নয়, সদু জেঠিমার অবস্থা দেখে ত্রিভুবন ডাক্তার নিজেই আদ্যোপান্ত সব স্বীকার করেছে।

বিচকে এখন শুধু আমাদের হিরো নয়, ওর সবজান্তা ছোটকাও এখন ওকে বেশ একটু সমীহ করে কথা বলে।

ছবি : ওয়াসিম হেলাল

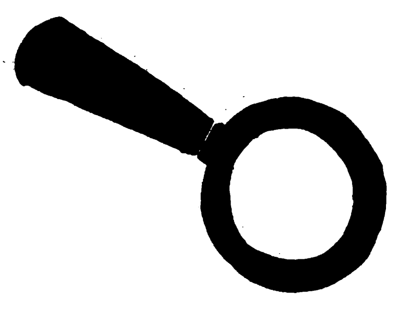

সত্যজিৎ রায় ও ফেলু মিত্তির

মঞ্জিল সেন

প্রদোষ মিত্র বা ফেলুদার প্রথম আত্মপ্রকাশ 'সন্দেশ' পত্রিকায়। তখন কিন্তু ফেলুদাকে নিয়ে সিরিজ লেখার কোনো পরিকল্পনাই ছিল না সত্যজিৎ রায়ের, শুধু সন্দেশের পাতা ভরাবার জন্যেই লেখা। সেই ফেলুদাই যে একদিন ছেলে বুড়োর সবার মন জয় করে বেস্ট সেলার হয়ে উঠবে এ কথা লেখক নিজেই কি কোনওদিন ভাবতে পেরেছিলেন!

১৯২৩ সালে সুকুমার রায়ের অকাল মৃত্যুর পর সুবিনয় রায় দু-বছর 'সন্দেশ' বার করেছিলেন। তারপর আর্থিক কারণে ওটা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩১ কিংবা ১৯৩২ সালে যাঁরা ইউ. রায়. অ্যান্ড সন্স কিনে নিয়েছিলেন তাঁদের আনুকূল্যে সুবিনয় রায় আবার ওটা প্রকাশ করেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন সুধাবিন্দু বিশ্বাস। বছর চারেক চলেছিল।

১৯৬১ সালে সত্যজিৎ রায় আবার সন্দেশকে বাঁচিয়ে তুললেন। তাঁর বাবা, কাকা, ঠাকুর্দার স্মৃতি বিজড়িত ওই পত্রিকার ওপর তাঁর একটা দুর্বলতা বরাবরই ছিল। ১৭২ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটে ছোট্ট একটা ঘর নিয়ে শুরু হল পত্রিকার নতুন জীবন, সত্যজিৎ রায় আর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তার সম্পাদক। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-য়ের গুপী অর্থাৎ তপেন চট্টোপাধ্যায় তখন 'সন্দেশ' দপ্তরে কাজ করতেন।

সত্যজিৎ রায় তখন সিনেমার কাজে ভীষণ ব্যস্ত, তবু সন্দেশকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য তাঁর ভাবনা চিন্তার অন্ত ছিল না। ওটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তিনি ছোটদের জন্য লিখতে শুরু করলেন। মজার কথা, 'সন্দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম যে লেখাগুলো বেরিয়েছিল তা হল লিয়রের ননসেন্স ছড়ার অনুবাদ—তবে তা অনবদ্য। তারপর বাংলা ১৩৬৮ সালের আশ্বিন, কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসের সন্দেশের পাতায় সৃষ্টি হল অসাধারণ এক চরিত্র, প্রফেসর শঙ্কু—শঙ্কুর প্রথম কাহিনী। ফেলুদা তারও চারবছর পরে।

আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ধর্মতলা স্ট্রীটের আপিস ছেড়ে দিতে হল, সন্দেশ উঠে এল ১৭২/৩ রাসবিহারী এভিনিউ, নলিনী দাশের বাড়িতে। (ধর্মতলা স্ট্রীটের ঠিকানাও ছিল ১৭২ নম্বর)। ওই একই কারণে সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারলেন না। ১৯৬৪ সালে লীলা মজুমদার আর সত্যজিৎ রায় যুগ্ম সম্পাদক। তবে দেখাশোনার পঁচানব্বুই ভাগ নলিনী দাশের কাঁধে, তাঁর পাশে আছেন অশোকানন্দ দাশ। ইংরিজি ১৯৭৫ থেকে নলিনী দাশের নামও যুক্ত হল সম্পাদনার সঙ্গে।

'সন্দেশ' বার করবার আগে সত্যজিৎ রায়ের কখনও মনে হয়নি যে ভবিষ্যতে তিনি একজন লেখক হবেন। ছবি করাই তখন তাঁর জপ, তপ, ধ্যান। সন্দেশের পাতা ভরাবার জন্যই কলম ধরেছিলেন। তারপর গল্প লিখতে শুরু করলেন। একবার যখন শুরু করলেন তখন আর থামার প্রশ্ন নেই। প্রথম দিকের গল্প 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু', 'সেপ্টোপাসের খিদে' ইত্যাদি। প্রথম উপন্যাস 'ব্যোমযাত্রীর ডাইরী' (প্রথম শঙ্কু)।

ফেলুদার চরিত্র সৃষ্টি হল বাংলা ১৩৭২ সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ সন্দেশের পাতায়। 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'। প্রথম গল্পেই ফেলুদার চরিত্রকে তিনি একজন ঝানু গোয়েন্দা হিসাবে উপস্থাপিত করতে

পেরেছিলেন। যেমন ফেলু আর তোপসের কথাঃ

"—আমি ত আজ ম্যালে যাইনি, তবু বলে দিতে পারি তুই কোনদিকের বেঞ্চে বসেছিলি।

—কোন দিক?

—রাধা রেস্টুরান্টের ডানপাশের বেঞ্চগুলোর একটাতে।

—আরেব্বাস! কি করে বুঝলে?

—আজ বিকেলে রোদ ছিল। তোর বাঁ গালটা রোদে ঝলসেছে, ডান ঝলসায়নি। একমাত্র ওই বেঞ্চগুলির একটাতে বসলেই পশ্চিমের রোদটা বাঁ গালে পড়ে।"

'এবার কাণ্ড কেদারনাথে' উমাশঙ্কর পুরী দেখা করতে এসেছেন ফেলুদার সঙ্গে।

"আপনাকে খুব তাড়াহুড়ো করে চলে আসতে হয়েছে বলে মনে হচ্ছে?" ফেলুদার মন্তব্য।

"কিন্তু সেটা আপনি জানলেন কি করে?"

"আপনার বাঁ হাতের সব নখই পরিষ্কার করে ক্লিপ দিয়ে কাটা, তার একটা নখ এখনো কোটের পকেটের ধারে লেগে আছে, অথচ ডান হাতে দুটো নখের পরে আর বাকিগুলো....'

ফেলুদার এমন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির নমুনা আমরা অনেকবারই পেয়েছি।

আনন্দ পাবলিশার্সের ফেলুদার প্রথম বই 'বাদশাহী আংটি'। দ্বিতীয় বই 'গ্যাংটকে গন্ডগোল'। এর পেছনে একটা মজার ইতিহাস আছে।

সেটা সম্ভবত ১৯৬৯ সাল। চিত্র প্রযোজক আর. ডি. বনশালের ছেলের বিয়েতে সত্যজিৎ আমন্ত্রিত। সেখানে 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সঙ্গে দেখা। কথায় বলে না, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে! সত্যজিৎকে দেখে সাগরময় ঘোষের মাথায় চাড়া দিয়ে উঠল তাঁকে দিয়ে 'দেশ' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় লেখাবেন। 'প্রফেসর শঙ্কু' তখন সদ্য বেরিয়েছে। সাগরময় সত্যজিৎকে বললেন বইটা তিনি পড়েছেন, ভালো লেগেছে। তারপরই তিনি তাঁকে 'দেশ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাস লেখার কথা বললেন।

সত্যজিৎ রায় স্থান-কাল-পাত্র ভুল হা হা করে হেসে উঠলেন, যেন এমন মজার কথা কখনও শোনেননি।

"দেশে উপন্যাস লিখব আমি।" সত্যজিৎ হাসি থামিয়ে বললেন, "তুমি কী বলছ সাগরদা!"

সাগরময় ঘোষ তখনকার মতো চুপ করে গেলেন। কিন্তু ১৯৭০ সালে শারদীয় 'দেশ'-য়ে সত্যজিৎকে দিয়ে লেখাবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। সত্যজিৎ রায় তখন বিশ্ববরেণ্য মানুষ। ইতিমধ্যে 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'জলসাগর', 'অপুর সংসার', 'দুই কন্যা', 'মহানগর', 'চারুলতা', 'নায়ক' এবং 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' আর্ন্তজাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক হিসাবে তাঁর খ্যাতি তখন তুঙ্গে।

তাছাড়া তখন তাঁকে আজ লন্ডন, কাল নিউইয়র্ক, পরশু পশ্চিম জার্মানী সফর করতে হচ্ছে। এর মধ্যে আবার আর্ন্তজাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরির দায়িত্বও রয়েছে। এ ছাড়া আছে 'সন্দেশ' পত্রিকার জন্য গল্প বাছাই, ছবি আঁকা, দম ফেলার ফুসরৎ নেই।

কিছুতেই সত্যজিৎকে দিয়ে হ্যাঁ করতে না পেরে সাগরময় একদিন বিশপ লেফ্রয় রোডে তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলেন। তিন তলার কাঠের সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে তিনি কাহিল হয়ে পড়লেন। সত্যজিৎ তাড়াতাড়ি তাঁকে জলটল দিয়ে সুস্থ করে তুললেন, সাগরময় ঘোষের অবস্থা দেখে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আর সেই সুযোগে সাগরময় পেশ করলেন তাঁর আর্জি।

সত্যজিৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন, তারপর বললেন, "ছবির শুটিং নিয়ে আমি কী ব্যস্ত থাকি তা তুমি জানো সাগরদা, এ সময় অন্য কোনো চিন্তা আমার মাথায় আসেনা। তবে যদি সময় পাই ভেবে দেখব।"

সাগরময় ঘোষ যেন আশার আলো দেখলেন। শারদীয় সংখ্যা বেরোতে তখনও তিন মাস বাকি, ততদিনে আশা করা যায় ছবি তোলার কাজ অনেকটা হালকা হবে। সত্যজিৎ কিন্তু একটা শর্ত দিলেন, লেখার জন্য তাঁকে তাগাদা দেওয়া চলবে না।

আগস্টের মাঝামাঝি (১৯৭০), শারদীয় সংখ্যার কাজ জোর কদমে চলছে, সেই সময় আকাঙ্খিত ফোন পেলেন সাগরময়। সত্যজিৎ জানালেন একটা আইডিয়া তাঁর মাথায় এসেছে, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ওটা শেষ করতে পারবেন মনে করছেন। সাগরময় সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। সেবার মহালয়া পড়েছিল পয়লা অক্টোবর, তার আগেই 'দেশ' বাজারে ছাড়তে হবে।

আনন্দবাজার পত্রিকায় ফলাও করে বিজ্ঞাপন ছাপা হল, শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা উপন্যাস থাকছে।

আগস্ট মাসের শেষাশেষিই পান্ডুলিপি পেয়ে গেলেন সাগরময়, ১০৪ পৃষ্ঠার পান্ডুলিপি। প্রথম নাম ছিল 'গ্যাংটকে ফেলুদা' পরে সত্যজিৎই নাম বদলে দিয়েছিলেন 'গ্যাংটকে গন্ডগোল'।

'দেশ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। চমৎকার একটি জমাটি কাহিনী, ঝরঝরে ভাষা, শুরু করলে শেষ না করে ওঠা যায় না। কাড়াকাড়ি

পড়ে গেল পূজা সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকা নিয়ে। বলতে গেলে সেই শুরু।

তারপর থেকে 'দেশ' শারদীয় সংখ্যায় ফেলুদাকে নিয়ে নিয়মিত লিখেছেন সত্যজিৎ রায়, আর অল্পদিনের মধ্যেই আনন্দ পাবলিশার্স তা বই ছাপিয়ে বাজারে ছেড়েছে। ফেলুদার জন্যই শারদীয় দেশের কাটতি হু হু করে বেড়ে গিয়েছিল। শেষের দিকে কয়েক বছর 'সন্দেশ' আর 'দেশ' পত্রিকায় পালা করে ফেলুদাকে নিয়ে লিখেছেন। 'সন্দেশ' তাঁর ঠাকুর্দার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা, তাকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো। তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, সাগরময় ঘোষ অমনভাবে পেছনে লেগে না থাকলে মাঝে মাঝে দু-একটা ফেলুদার কাহিনী হয়তো সন্দেশে ছাপা হত, আজ ফেলুদাকে নিয়ে যে এত ক্রেজ, তার বোধহয় সুযোগ ঘটত না। মজার কথা হল, সত্যজিৎ রায় যখন ফেলুদাকে নিয়ে লেখার কথা বলেছিলেন, তখন সাগরময় ঘোষ একটু ইতস্তত করে ছিলেন। পরে তিনিই বলতেন, 'মানিক, তুমি ফেলুদাকে নিয়েই লেখ।' সাগরময় ঘোষের কাছে এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

'বাদশাহী আংটি' ফেলুদা সিরিজের প্রথম বই, 'সন্দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে ওটা বেরোবার আগে কী টাইপে বই ছাপা হবে, কোথায় কোথায় ছবি যাবে, টাইটেল পেজ কেমন হবে, সব সত্যজিৎ বলে দিয়েছিলেন। প্রুফও দেখেছিলেন নিজে। বই বেরুবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ শেষ। জুলিয়াস সীজারের কথাটা একটু বদলে সত্যজিৎও বলতে পারতেন, 'আমি এলাম, লিখলাম, জয় করলাম।' সেই জয়যাত্রা আজও অব্যাহত আছে। ফেলুদা সিরিজের প্রত্যেকটি বইয়ের কত সংস্করণ যে বেরিয়েছে আনন্দ

পাবলিশার্সের বাদল বসুও বোধহয় তা সঠিক বলতে পারবেন না। আর এক একটা সংস্করণ! তা দু-তিন হাজার নয়, তার কয়েক গুণ ছাপা হয় শুনেছি। বই মেলায় সন্দেশ স্টলে ঢুকেই ক্রেতাদের প্রথম প্রশ্ন, 'ফেলুদা আছে?'

ফেলুদা একজন বাস্তববাদী গোয়েন্দা। আরাম-কেদারায় বসে ধূমায়মান চা বা কফিতে চুমুক দিতে দিতে ধূসর মগজের খেল্ দেখিয়ে রহস্যের সমাধান সে করে না। সোজা চলে যায় কৈলাসে, গ্যাংটকে, রাজস্থানে আর সেই সঙ্গে আমাদেরও করে ভ্রমণ সঙ্গী। একটা জমাটি রহস্য কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে এই মানস ভ্রমণের সুখ, সেটাই বা কম কিসে! এমন সুখপাঠ্য গোয়েন্দা কাহিনী আমাদের শুধু রোমাঞ্চকর অনুভূতিই উপহার দেয় না, আমাদের সাধারণ জ্ঞানও বাড়িয়ে দেয়, ফেলুদা যে একজন ক্যুইজ মাস্টারও বটে।

ভূতত্ব, নৃতত্ব, বার্ড ওয়াচিং, ইতিহাস, ভূগোল, সঙ্গীত, কী বিষয় নিয়ে না পড়াশোনা করেছে প্রদোষ মিত্তির! আসলে সে যে স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। যখন ফেলুদার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়, তখন তার বয়স সাতাশ বছর আর তোপ্‌সের চোদ্দো। সত্যজিৎই বোধহয় প্রথম যিনি একজন গোয়েন্দার সহকারী এমন একজনকে খাড়া করেছিলেন যে বয়সে বালক। পরবর্তীকালে আরেকটি চরিত্র যোগ হয়েছে, রহস্য কাহিনীর লেখক লালমোহন গাঙ্গুলি, যাঁর ছদ্মনাম জটায়ু, যিনি তাঁর 'রহস্য অমনিবাস' বিক্রি সম্বন্ধে বলেন, 'সেলিং লাইক হট কচুরিজ'। সাসপেন্সের সঙ্গে হালকা হাসির রস ফেলুদার কাহিনীকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। আর 'সোনার কেল্লা'য় লালমোহন বাবুর সেই প্রশ্ন, 'উটরা কি কাঁটা বেছে খায়?' এর জবাব নেই। সৌমিত্র, সিদ্ধার্থ আর সন্তোষ দত্ত এই তিনটি চরিত্রের সার্থক রূপকার।

পৃথিবীতে এমন কিছু লেখক আছেন যাঁদের সৃষ্ট চরিত্র তাঁদের মতোই বিখ্যাত কিংবা তাঁদেরও ছাপিয়ে গেছে। যেমন শার্লক হোমস, এর্কুল পয়রো কিংবা জেমস বন্ড, এমনকি ব্যোমকেশ বক্সীও এ ব্যাপারে কম যায় না। বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার হিসাবে সত্যজিৎকে যদি আমরা না পেতাম, তবে ফেলুদার আড়ালে তিনি নিশ্চয়ই ঢাকা পড়তেন।

হেঁয়ালিতেও কি ফেলুদা কম যায়। যেমন 'রক্তবরণ মুগ্ধকরণ—নদীপাশে যাহা বিঁধিলে মরণ।' কী এর অর্থ। রক্তবরণ মানে 'লাল', 'মুগ্ধকরণ মানে', 'মোহন', নদী হল 'গাঙ', বিঁধিলে মরণ হল 'গুলি'—শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো লালমোহন গাঙ্গুলি। এমন হেঁয়ালি ছড়িয়ে আছে ফেলুদার নানান কাহিনীতে।

'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা'য় কালীকিঙ্কর বাবুর সিন্দুক একটা বিশেষ সংখ্যার কম্বিনেশন ছাড়া খোলা যায় না, সেই সংখ্যা লুকিয়ে আছে এক হেঁয়ালির মধ্যে : ত্রিনয়ন, ও ত্রিনয়ন— একটু জিরো।

ত্রিনয়নের 'ত্রি' হল 'তিন' আর নয়ন হল 'নাইন'। (তাড়াতাড়ি 'নয়ন' বলতে গেলে 'নাইন' এসে যায়)। দুইয়ে মিলে থ্রি-নাইন। ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন হল থ্রি-নাইন-ও-থ্রি নাইন। আবার 'ও' মানে 'জিরো'। 'একটু জিরো' হল (এট্টু) 'এইট-টু-জিরো অর্থাৎ সবটা দাঁড়ালো থ্রি-নাইন-জিরো-থ্রি-নাইন-এইট-টু-জিরো।

'জয় বাবা ফেলুনাথ'-য়ে রুকুর সঙ্গে ফেলুদার কথার মধ্যেও হেঁয়ালি। রুকু জানালো সোনার গণেশ মূর্তি একজন রাজার কাছে আছে। 'কোথাকার রাজা?' ফেলুদার প্রশ্নের জবাবে রুকু বলে, 'আফ্রিকা'। ফেলুদাও প্রথমে ধরতে পারেনি। সিংহ হল আফ্রিকার পশুরাজ। বাড়িতে যে সিংহবাহিনীর মূর্তি তৈরি হচ্ছে সেই সিংহের মুখে মূর্তিটি লুকানো আছে।

'ছিন্নমস্তার অভিশাপ'-য়ে বৃদ্ধ মহেশ চৌধুরী ফেলুদাকে রহস্য করে জিগ্যেস করলেন, 'হোয়ার ইজ দ্য ডেড বডি খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয়নি তো?''

লালমোহন আর তোপসে কিছুই বুঝতে পারল না। ফেলুদাই বুঝিয়ে দিল, 'কৈলাস হচ্ছে কই লাশ।' বাড়িটার নাম কৈলাস। সেটা খুঁজে বার করার কথাই বলা হচ্ছে।

মহেশবাবু তাঁর নাতনীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওর নাম জোড়া মৌমাছি।'

'আর তুমি জোড়া কাটারি', মেয়েটি বলল।

ফেলুদার অবিশ্যি বুঝতে দেরি হল না। নাতনীর নাম 'বিবি'— মৌমাছির ইংরেজি 'বি', জোড়া মৌমাছি হল বিবি। আর দাদুর 'দা' হল কাটারি, আর 'দু' হল 'জোড়া' বা দু(ই)। এমন হেঁয়ালি আর কথার খেলা প্রচুর ছড়িয়ে আছে ফেলুদার কাহিনীতে। যেমন LOKC— ভেঙ্গে ভেঙ্গে তা হল 'এলোকেশী'। NADO—এনে-দিও। AKLO-এ কে এল? ADK SO—এদিকে এস।

পরবর্তীকালে সন্দীপ রায় ফেলুদাকে নিয়ে নতুন ছবি ও সিরিয়াল করেছেন। টি.ভি.-তে কয়েকটা কাহিনী দেখানো হয়েছে। ফেলুদার চরিত্রে অভিনয় করেছেন সব্যসাচী চক্রবর্তী। দর্শকের বিচারে বাংলা সিরিয়ালে ফেলুদা সিরিজ জনপ্রিয় হয়েছে। টি.ভি.তে দেখানো হয়েছে যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে। হিন্দিতে এই সিরিয়ালটি সত্যজিৎ রায় করেছিলেন, সেখানে প্রদোষ মিত্তির বা ফেলুদার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শশী কাপুর আর জটায়ু মোহন আগাসে। সেই ছবি দর্শক নেয়নি, প্রধান দুই চরিত্রই ফ্লপ

করেছিল। সন্দীপ সেই ছবি কিন্তু জমিয়ে দিয়েছেন। ফেলুদার চরিত্রে সব্যসাচী একাই টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। তবে সন্তোষ দত্ত পর রবি ঘোষের জটায়ু চরিত্রও মানিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা অপূরণীয়। তবে বিভু ভট্টাচার্য ওই চরিত্রটা মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন।

ফেলুদার কাহিনীতে আমরা প্রথম থেকেই একটা টান অনুভব করি, সাসপেন্স শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে, আর সেই সঙ্গে উপরি হিসেবে আমরা পাই মজার মজার ধাঁধা, নানান জায়গার বর্ণনা আর অজানা সব তথ্য। এই সব কারণেই ফেলুদা বাঙালি পাঠক পাঠিকার কাছে এত জনপ্রিয়—স্রষ্টাও তার সৃষ্ট চরিত্র দুই-ই আমাদের মানসপটে স্থান করে নিয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের কলম থেমে গেছে কিন্তু ফেলুদার জয়যাত্রা থামেনি, অগণিত পাঠক পাঠিকার হৃদয় জুড়ে আছে তার ভাবমূর্তি, আর ফিরে ফিরে সেই সৃষ্টি আমাদের মনে করিয়ে দেয় তার স্রষ্টাকে। আনন্দের কথা, সন্দীপ এখন ফেলুদাকে নিয়ে আরও ছবি করেছেন। এবং তা দারুণ হিট ছবি হচ্ছে বোম্বাইয়ের বোম্বেটে এবং কৈলাসে কেলেঙ্কারি এই দুটি ছবিই জমজমাট। আমরা এবার তাকিয়ে আছি আগামী ডিসেম্বরের ১২ তারিখের দিকে, যেদিন মুক্তি পাবে বড়পর্দায় সন্দীপ রায়ের তৃতীয় ফেলুদা কাহিনি—টিনটোরেটোর যিশু।

টেডি বেয়ার রহস্য

পবিত্র সরকার

সকলের আগে গাপ্পুরই চোখে পড়েছিল খবরটা। তার কারণ আর কিছুই নয়, সকলের আগে বাড়ির তিনখানা ইংরেজি-বাংলা কাগজ তার দখলে চলে যায়, খেলার খবরের জন্য, বিশেষত ফুটবল-ক্রিকেট-টেনিসে কে কোথায় দাঁড়াল সেটা গাপ্পুর একবার দেখে নিতেই হবে। নইলে তার ভাত হজম হবে না। তার আগে বাড়িতে কেউ খবরের কাগজে হাত দিলে এক তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যাবে। সেই খানিক পরে দিদিকে এসে বলল, 'দ্যাখ্ দিদি, কী অদ্ভুত একটা চুরি হয়েছে কাল!'

'রোমি পড়তে বসেছিল, বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে বলল, 'কোথায়? কীসের চুরি?'

গাপ্পু বলল, 'আহা, তুই দ্যাখ্ না! এই তো এখানে!' বলে আনন্দবাজারের নয় পৃষ্ঠার অষ্টম কলামের মাঝামাঝি এক জায়গায় আঙুল রাখল, সেখানে খুদে খুদে কিন্তু বোল্ড অক্ষরে ছাপা একটা ছোট্ট খবর—

খেলনার দোকানে চুরি : গত কাল রাত্রে ঢাকুরিয়ার শ্রীভূমি শপিং মলের 'টয় ওয়ার্ল্ডে' এক দুঃসাহসিক চুরি হয়ে গিয়েছে। রাত্রে দোকানের তালা ও শাটার ভেঙে চোরেরা ঢুকেছিল। কিন্তু দামি সাইকেল গাড়ি, স্লাইড ইত্যাদি খেলনা না নিয়ে চোরেরা শেল্ফ থেকে কতকগুলি টেডি বেয়ার নিয়ে গেছে, আর কিছুই নেয়নি। পুলিশ এই অদ্ভুত চুরির বিষয়ে অনুসন্ধান করছে।

রোমি খবরটা দেখে একটু অবাক হল, ভাইকে বলল, 'দ্যাখ্, কোনো পাগলের কাণ্ড হবে। ছেলেবেলায় হয়তো টেডি বেয়ারের শখ ছিল। কেউ দেয়নি, তাই দোকান ভেঙে চুরি করে নিয়ে গেছে।'

গাপ্পু আজকাল এসব রসিকতায় পাত্তা না দিতে শিখেছে। গম্ভীর গলায় বলল, 'কী জানি, আমার কিন্তু ব্যাপারটা কীরকম একটু মনে হচ্ছে।'

'যাও দাদা, পড়াশোনায় বসো গিয়ে একটু। কাগজের রহস্য নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না'—বলে রোমি গাপ্পুকে একটা হালকা ধমক দিল বটে, কিন্তু তার মনেও প্রশ্নটা লেগে রইল। দোকান থেকে এত দামি জিনিস থাকতে শুধু টেডি বেয়ার কে চুরি করে? পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল অবশ্য, 'কাটিং-এর খাতায় তুলে রাখতে পারিস।'

আজ শনিবার, স্কুল ছিল না। স্কুলের হোমওয়ার্ক সেরে রোমি একটু কম্পিউটারে বসবে ভাবছিল, এমন সময় বাচ্চুকাকুর বেল বাজল। বেলা ন-টা নাগাদ বাচ্চুকাকু রোমির বাবা-মা অর্থাৎ তার দাদা-বউদির ফ্ল্যাটে দ্বিতীয় এক কাপ চা খেতে আসে। বসার ঘরে বসেই হাঁক দেয়, কোথায় আমার চ্যালাদুটো কই?' অমনি রোমি আর গাপ্পু দৌড়ে গিয়ে হাজির হয় সেখানে। বাচ্চু কাকুর সঙ্গে আধঘন্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট আড্ডা খুব জমে ওঠে।

আজ কিন্তু বাচ্চুকাকু আড্ডার দিকে গেলেন না। রোমিকে বললেন, 'হ্যাঁ রে মা, সকালের খবরের কাগজ দেখেছিস?'

রোমি যেন বাচ্চুকাকুর 'থট রিডিং' করেই বলে উঠল, 'শ্রীভূমি শপিং মলে টেডি বেয়ার চুরির কথা বলছ? গাপ্পু এনে দেখিয়েছে। সত্যি কাকু, ব্যাপারটা যেন কীরকম।'

'কীরকম সেটা তোমাকেই বলতে হবে মা। চলো, ঢাকুরিয়া থানার ও সি বিজয়ানাথ সমাদ্দার আমার বন্ধু—তাঁর জরুরি ফোন এসেছে। তোমাদেরও নিয়ে যেতে বলেছে। সলামত গাড়ি বার করেছে।'

গাপ্পু লাফিয়ে বলল, 'তোমাদের মানে আমিও তো!'

বাচ্চুকাকু বললেন, 'তোমাদের মানে তুমিও।'

ইদানীংকালে অনেক হালফ্যাশানের সুপার মার্কেট ধরনের বাজার কলকাতায় গজিয়ে উঠেছে, শ্রীভূমি শপিং মল তারই একটা। এতে আলাদা আলাদা দোকান, টয় ওয়ার্ল্ড তারই একটা।

সমাদ্দার গেটের মুখে অপেক্ষা করছিলেন, ওরা পৌছোনোমাত্র এগিয়ে এসে বাচ্চুকাকুর ডানহাত দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর রোমি-গাপ্পুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এরাই তো সেই বিশ্ববিখ্যাত দিদি আর ভাই?' চলুন, সবাই চলুন!'

'বিশ্ববিখ্যাত' কথাটা অত্যুক্তি নয়। যারা 'উধাও অশ্বমুণ্ড রহস্য' পড়েছ তারা জান রোমি একটা আন্তর্জাতিক ছবি চুরির সামলার রহস্য সমাধান করেছিল। তাতে গাপ্পুরও ভূমিকা ছিল, বাচ্চুকাকুর প্রেরণা তো ছিলই।

গিয়ে দেখার খুব একটা কিছু ছিল না। মলের একটা গলির একেবারে শেষে টয় ওয়ার্ল্ডের দোকান। একেবারে সীমানার পাঁচিলের ধারে। চোর বা চোরেরা নিশ্চয়ই পাঁচিল টপকে এসেছিল। দোকানের রেলিং শাটার কাটবার যন্ত্রপাতিও নিয়ে এসেছিল। অক্সি-অ্যাসিটিলিন গ্যাস কাটার দিয়ে শাটার কেটেছে। গেটের কাছে সিকিউরিটি কিছু টের পায়নি, তার কারণ, বিজয়ানাথ বললেন, কাল সারারাতই প্রায় 'জগদ্ধাত্রী ঠাকুর' বিসর্জনের মিছিল গেছে, ইলেকট্রিক ম্যান্ডোলিনের বাজনা, পটকা-হাউই আর 'জগদ্ধাত্রী মাই কী জয়' চলেছে। হাউই-এর আওয়াজ আর গ্যাস-কাটারের আওয়াজ একই রকম। আর সিকিউরিটিরা হয়তো একটু নেশাটেশাও করেছিল।

দোকানের সামনে একজন পুলিশ দাঁড়িয়েছিল। সে ওদের দেখে স্যালুট করল। বিজয়ানাথ একটু মাথা ঝুঁকিয়ে সেটা স্বীকার করলেন, তারপর ওদের ভেতরে যেতে বললেন।

ভেতরে সাজানো দোকান, শুধু পেছনের একটা অংশ একটু এলোমেলো। প্রচুর টেডি বেয়ার সাজানো আছে ডানদিকে কয়েকটা শেল্‌ফে, ছোটো থেকে বড়ো—তার মধ্যে মাঝখানের একটা শেল্‌ফে একটা জায়গা এলোমেলো। দোকানের একজন কর্মচারী ছিল, সে বলল, 'স্যার শুধু একটা সাইজের টেডিবেয়ার গেছে। পঁচিশ সেন্টিমিটার লম্বা—খুব বিশাল কিছু নয়।'

'ক-টা ছিল, ক-টা গেছে?' বাচ্চুকাকু জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বলল, 'গোটা আটেক ছিল, সবক-টাই নিয়ে গেছে। দিন তিনেক আগেই সাপ্লাই হয়েছিল কারখানা থেকে।'

'আচ্ছা? কোন্ কারখানা থেকে এসব টেডি বেয়ার আনান আপনারা?' বাচ্চুকাকু জিজ্ঞেস করলেন।

দোকান-কর্মচারী বলল, বেলেঘাটায় 'খেলাঘর' থেকে। ওখান থেকেই আমাদের টেডিবেয়ারগুলো মূলত আসে। কুকুর-বাঁদর এসব সফ্‌ট টয়ও আসে।

বাচ্চুকাকু বিজয়ানাথকে জিজ্ঞেস করলেন কোনো আঙুলের ছাপটাপ পাওয়া গেছে কি না। বিজয়ানাথ বললেন, 'টেডি বেয়ারের তাকে কিছুই পাইনি। কিন্তু একটা বুড়ো আঙুলের ছাপ পেয়েছি অদ্ভুত জায়গায়, জানি না এর সঙ্গে তার কোনো যোগ আদৌ আছে কি না। এই যে দেখছেন পাশে সাইকেলের সারি সাজানো—এর একটা সাইকেলের বেল কেউ বোধহয় বাজানোর চেষ্টা করেছিল। বেলের এই সেটায় চাপ দেয়—সেটাতে

দিব্যি ডানহাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ। আর হ্যান্ডেলেও অন্য আঙুলের ছাপ। এটা যদি টেডি বেয়ার চোরদের কারও হয় তো মার দিয়া কেল্লা। সব ছাপ লালবাজারে পাঠিয়েছি সেলোটেপে তুলে—দেখা যাক।'

রোমি জানে ব্যাপার অত সোজা নয়। কম্পিউটারে আঙুলের ছাপের ভাণ্ডার থেকে ছাপ মেলানো বিদেশে হয়তো সোজা হয়ে গেছে—কম্পিউটার নিজেই ছাপের ভাণ্ডার থেকে একই রকম ছাপ তুলে এনে 'ম্যাচ' করে দেয়। এখানে ব্যাপারটা চালু হয়েছে কিনা কে জানে? তবু এখানেও পুলিশ তো একটা ব্যবস্থা তৈরি করেইছে—নিশ্চয়ই কোনো একটা খবর পাওয়া যাবে।

রোমি বুঝল যে, এটা নিছক টেডি বেয়ার চুরির কেস নয়। এর পেছনে আরও কিছু আছে। তাই সে কাকুকে আলতো খোঁচা দিয়ে বলল, 'কাকু, আমার মনে হয় বেলেঘাটায় 'খেলাঘর'-এ একবার যাওয়া দরকার।'

কাকু চোখ কপালে তুলে বললেন, 'আরে! আমার মনের কথাটা তুই টের পেলি কী করে? চালাও পানসি বেলেঘাটা!'

গাপ্পু বলল, 'বাঃ বেলঘরিয়াকে বেলেঘাটা করে দিলে!'

বেলেঘাটা চালপট্টির একটা গলির মধ্যে খেলাঘর। বিজয়নাথ সুদ্ধ ওরা যখন গিয়ে পৌঁছোল, তখন কারখানা পুরোদমে চলছে। কারখানা চলছে মানে মেশিন চলছে না—চারটে ঘরে প্রচুর কাপড়ের খেলনা তৈরি হচ্ছে— সেগুলোকে বলে 'সফ্‌ট টয়'। কোনো ঘরে তৈরি হচ্ছে বিদেশি 'র‍্যাগেডি অ্যান্‌'-এর মতো এলোমেলো শনের দড়ির মতো চুলের মেয়ে পুতুল, কোনোটাতে নরম ভেড়া আর কুকুর, কোনোটাতে বাঁদর বা হনুমান, কোনোটাতে টেডি বেয়ার।

বাচ্চুকাকুদের মালিক ঘুরিয়ে দেখাল কারখানাটা। যারা কাজ করছে তারা সবাই মেয়ে, বোঝাই যায় গরিব বা নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের। দেখে এসে সবাই মালিকের ঘরে বসল। বাচ্চুকাকু বলল, 'যারা টেডি বেয়ার তৈরি করে তাদের একটু এঘরে আসতে বলুন।'

মালিক জানাল সবসুদ্ধ চারজন টেডি বেয়ার তৈরি করে। তার মধ্যে নমিতা দুদিন ধরে আসছে না। বাকি তিনজনকে ডাকছি।'

রোমি একটু উত্তেজিত হয়ে বাচ্চুকাকুর হাত চেপে ধরল। বাচ্চুকাকু ডানহাতে ওর হাতের ওপর একটু চাপ দিলেন, যেন বললেন, 'ঠিক আছে! তুমি ঠিকই অনুমান করছ। হয়তো হদিশ হবে। ধৈর্য ধরো!'

টেডি বেয়ার দলের তিনটি মেয়ে ডাক পেয়ে ঘরে এসে দাঁড়াল। বাচ্চুকাকু মালিককে বলল, 'আপনি একটু আড়ালে যান। ওরা আপনার সামনে তেমন করে মুখ নাও খুলতে পারে।'

মালিক অপ্রসন্ন মুখ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু বিজয়ানাথও মাথা নেড়ে বেরিয়ে যাবার ইঙ্গিত করেছেন, ফলে তার আর কিছু করার ছিল না। বাচ্চুকাকু মেয়ে তিনটিকে, একটি কুমারী আর দুটি বিবাহিত, বলল, 'আপনারা বসুন।'

মেয়ে তিনটি জড়োসড়ো হয়ে তিনটি প্লাস্টিকের চেয়ারে বসল।

বাচ্চুকাকু জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে নমিতা, যে দুদিন থাকছে না, সে-ই কি ওই পঁচিশ সেন্টিমিটারের টেডিবেয়ার গুলো সেলাই করে।'

ওরা জানাল, 'হ্যাঁ। আসলে ব্যাপারটা একজনের কাজ নয়। প্রথমে টেডিবেয়ারের একটা খোল তৈরি হয়—তার দুটো অংশ। মাথা আর হাত-পা সুদ্ধ পেট। মাথা থেকে পিঠ খোলা। তারপর আর-একজন তার মধ্যে ঠেসে তুলো আর কাপড়ের টুকরো ভরে— যাতে ভালুকের মোটাসোটা শরীর তৈরি হয়। তারপর একজন মাথার একেবারে নাক থেকে ল্যাজ পর্যন্ত টানা সেলাই করে দেয়। তখন চমৎকার টেডি বেয়ার হয়ে যায়। এই শেষ কাজটা নমিতা করত।'

বাচ্চুকাকু এবার বলল, 'আচ্ছা এই কথাটার জবাব একটু ভেবেচিন্তে দিন। নমিতা শেষ যেদিন এসেছিল সেদিন এমন কিছু ঘটেছিল কি না, যা রোজ ঘটে না, যা একটু অস্বাভাবিক বলে আপনাদের মনে হয়েছে।'

অবিবাহিতা মেয়েটি, নাম মৌসুমী, বলে উঠল, 'হ্যাঁ, এই তো বুধবারে। নমিতাকে অফিস বয় সুবল এসে খবর দিল ওর ভাই এসেছে, এক্ষুনি ডাকছে, যেন ছুটে দেখা করে আসে।' নমিতা হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

অন্যরা মাথা ঝাঁকিয়ে মৌসুমীকে সমর্থন করল।

বাচ্চুকাকু এবার তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, মৌসুমী কি সব ঠিক ঠিক বলছে? ও কিছু বাদ দেয়নি তো? সবটা বলেছে?'

তখন একটি বউ বলল, 'হ্যাঁ, এমনই তাড়াহুড়ো করে গেল যে হাতের টেডি বেয়ারটাও রেখে গেল না। হাতে করেই নিয়ে ছুটল। ফিরেও এল অবশ্য। এসে ওটা চটপট সেলাই করল, কিন্তু আমি লক্ষ করছিলাম, ওর হাত কাঁপছিল।'

বিজয়ানাথ বললেন, 'তোমরা কিছু জিজ্ঞেস করলে না?'

'হ্যাঁ করেছিলাম। ও মাথা নীচু করে ঝাঁকিয়েছে, বলেছে, কিছু হয়নিকো।'

'তারপর?'

'তারপর ছুটির সময় হল। সবাই যেমন ছুটির আগে একবার বাথরুমে যাই ও-ও গেল টেডি বেয়ারটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে। এমন সময় মালিকের হুকুমে সুবল একটা ভ্যান নিয়ে এসে সব ক-টা টেডি বেয়ারকে তুলে নিয়ে গেল, সাপ্লাই করতে হবে বলে।'

আর-একটি মেয়ে এবার বলে উঠল, 'হ্যাঁ, এবার পরিষ্কার মনে পড়ছে। নমিতা বাথরুম থেকে ফিরে এসে টেডি বেয়ার না দেখে প্রায় চিৎকার করে উঠল! 'এ কী আমার টেডি কোথায় গেল? কী সর্বনাশ! এখন আমি কী করব?' ওগো আমার কী সর্বনাশ হয়ে গেল' বলে ডুকরে কেঁদে উঠল। আমরা খুব অবাক হয়ে গেলাম। একটা টেডি চলে গেছে সাপ্লাইয়ে, এতে এত উতলা হবার কী আছে? ওর কান্না শুনে মালিক এসে পড়লেন; 'কী হয়েছে' বলে ধমকাতেই ও ঠান্ডা হয়ে গেল। বলল, 'না না শেষ টেডিটা আমি পুরো সেলাই করিনি, তাই একটু খুঁতো রয়ে গেছে।'

মালিক বলল, 'তাই নাকি? তবে তো ঝামেলা করলি।' তারপর কী ভেবে বলল, 'যাকগে চেনা দোকান, খুঁতো থাকলে ঠিক ফেরত দিয়ে দেবে। এ নিয়ে তুই ভাবনা করিসনি, বাড়ি যা!'

মৌসুমী বলল, 'সেই যে গেল, তারপর থেকে আর আসছে না।'

ওদের যেতে বলে বাচ্চুকাকু সুবলকে ডাকলেন। রোমি বাচ্চুকাকার কানে কানে কী যেন বলল, বাচ্চুকাকু বললেন, 'ঠিকই বলেছিস মা।' বলে বিজয়ানাথকে বলল, 'একে আপনি ট্যাক্‌ল করুন। জানতে চাইবেন'—

বিজয়ানাথ বললেন, 'জানি স্যার! ওর কাছে কোন্ দোকানে সাপ্লাই হয়েছে সেটা নমিতা বা কেউ জানতে চেয়েছে কি না। এটুকু বুঝে নিয়েছি।'

রোমি খুশি হয়ে ঘাড় নাড়ল।

সুবলের কাছ থেকে খবর বার করতে খুব একটা কষ্ট হল না বিজয়ানাথের। একটু চাপ দিতেই সে বলে ফেলল, হ্যাঁ, নমিতাই বাড়ি যাওয়ার আগে তার হাতে দশটা টাকা দেয়, কান্নাভেজা চোখে দোকানের নাম-ঠিকানা জানাতে বলে। সেও বিনা দ্বিধায় বলে দেয়। দশটা টাকা দিয়েছিল কাউকে না বলবার জন্যে। সুবল হঠাৎ বিজয়ানাথের পা ধরে, বলে 'স্যার, একথা মালিককে বললে আমার চাকরি থাকবে না। আমাকে বাঁচান।'

বিজয়ানাথ তাকে আশ্বাস দেন।

বাচ্চুকাকু এবার বলেন, 'এবার আপনার কাজ। আমরা চলি। এ ছেলেমেয়েদুটোর খিদে পেয়েছে, বাড়ি যাই।'

বিজয়ানাথ জিভ কেটে বললেন, 'আরে ছিঃ ছিঃ, চলুন এদের কিছু খাইয়ে দিই।'

'না না, তার দরকার হবে না। আপনি জানেন কী করতে হবে। নমিতার ঠিকানা নিন মালিকের কাছ থেকে। দেখুন ওর ভাইয়ের কী যোগ আছে ব্যাপারটা সঙ্গে। আমার মনে হয় ওকে ধরতে পারলেই রহস্য সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের কিছু করার থাকলে বলবেন, আমরা আজ সারাদিন বাড়িতেই আছি।'

(২)

বাড়ি ফিরে বাচ্চুকাকু বললেন, 'ঠিক আছে, গিয়ে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করো দু-ভাইবোন। আমি চারটে নাগাদ চা-খেতে যাব তোমাদের ফ্ল্যাটে, তখন আরও খবরাখবর পাব— দেখব ব্যাপারটা কী দাঁড়িয়েছে।'

ঠিক চারটের সময় কাকু এলেন রোমিদের ফ্ল্যাটে। রোমির মারও কলেজ ছুটি ছিল আজ, কাজের মেয়ে তাপসী চা নিয়ে এল। রোমির মা জিজ্ঞেস করলেন, 'অ্যাডভেঞ্চার কীরকম হল তোমাদের?'

রোমি বলল, 'ভালোই হল, পরে বলব তোমাকে।' তারপর বাচ্চুকাকুর দিকে ফিরে বলল, 'কাকু, তোমার জন্যে আমি গাপ্পুর সেই 'ক্রাইম ক্রনিক্‌ল' রেডি করে রেখেছি। একটা জায়গায় কাগজও দিয়ে রেখেছি। আমার মনে হয় ওটা পড়ে তুমি একটা ক্লু পাবে।' বাচ্চুকাকু বললেন, 'ভেরি গুড! গাপ্পুকাকু, লাও তোমার ক্রাইম ক্রনিক্‌ল।'

ক্রাইম ক্রনিক্‌ল আর কিছু না—দু-ভাইবোনের একটা মস্ত খাতা, যাতে দুজনে কাগজে অপরাধের একটু বড়োসড়ো খবরগুলো কেটে কেটে লাগিয়ে রাখে। রোমি কাগজ দেখে কলমে দাগ দিয়ে দেয়, গাপ্পু কেটে কেটে খাতায় তারিখ দিয়ে লাগিয়ে রাখে।

গাপ্পু সেই মস্ত খাতাখানা নিয়ে এল। যে-পাতাটায় রোমি কাগজের চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল সেটা খুলেই বাচ্চুকাকু দেখলেন দিন দশেক আগের একটা খবর, বড়োবাজারের সত্যনারায়ণ মার্কেটের 'নওলাখি' নামের একটা দোকান থেকে হিরে চুরির।'

'শাবাশ মা, তুই বুঝে নিয়েছিস ব্যাপারটা! আমারও সন্দেহ ছিল ওই টেডি বেয়ার চুরিতে এইরকম একটা কিছু রহস্য আছে। টেডি বেয়ারের মধ্যে এমন কিছু লুকোনো ছিল যা উদ্ধার করার জন্যে ওই চুরি। এখন এই অনুমানটাই সবচেয়ে সংগত হবে। কোনোভাবে নওলাখি-র একটা বা একাধিক হিরে ওই টেডি বেয়ারের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।'

'তুমি এটাও ভাবতে পার কীভাবে ঢুকেছিল। ঢুকিয়েছিল ওই নমিতা। সেলাই করে।'

'কিন্তু কেন? ও তো গায়ে কোথাও লুকিয়ে নিয়ে যেতে পারত হিরে বা হিরেগুলো! টেডিতে সেলাই করতে গেল কেন?' গাপ্পু জিজ্ঞেস করল।

রোমি বলল, 'অনেকগুলো অনুমান করা যায়, তাই না কাকু? হয়তো নমিতার ভাই দলের পান্ডা—যে দলটা নওলাখি-র দোকান ভেঙেছে। হয়তো পুলিশ ওর খোঁজ পেয়েছে, ওর পেছনে লেগেছিল হিরেগুলো রাখার একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজছিল—ভেবেছে কোনও একটা ব্যবস্থা করতে পারবে। সবই বোঝা যাবে লালবাজার থেকে আমরা বাকি খবরগুলো কী পাব তার ওপর। ওই হাতের ছাপটা কার, পুলিশ নমিতার বাড়িতে গিয়েছিল কি না, সেখানে কী পেল—এসব। তুমি কী বল, কাকু?'

বাচ্চুকাকু একটু বাঙালভাষা মিশিয়ে বললেন, 'ব্রাভো, মা। এক্কেবারে খাটি কথাটা কইছস্। লালবাজারের খবর এক্ষুনি আসবে, আমার সঙ্গে কথা হয়েছে।' বলে বাচ্চুকাকু বাকি চা-টুকু শেষ করলেন।'

একটু পরেই কলিংবেল বাজল—বাচ্চুকাকু বোধহয় বিজয়ানাথকে রোমিদের ফ্ল্যাটেই আসতে বলেছিলেন। বিজয়ানাথ বুকে হাত রেখে একটু মাথা নীচু করে রোমির মাকে 'নমস্কার ম্যাডাম' বলে সম্বোধন করলেন। তারপর একটা খালি সোফায় বসে বললেন, 'অনেক খবর আছে। বলি একে একে?'

'অপরাধী ধরা ছাড়া আর সব কিছু পেয়ে গেছেন তো?'

'তা বলতে পারেন স্যার! বলছি'—

বলে বিজয়ানাথ প্রথমেই জানালেন, সাইকেলের বেল-এর আঙুল টেপবার জায়গাটায় হাতের ছাপের ম্যাচ্ পাওয়া গেছে—ওটা কুখ্যাত দাগি ল্যাংড়া সমীরের, যে ছোটো একটা দল করে গয়নার দোকান ভেঙে বেড়ায়। বহুবার জেল খেটেছে। মাসখানেক আগে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।'

'বুঝেছি।' বাচ্চুকাকু বললেন। 'বেরিয়ে এটাই ওদের প্রথম কাজ। কিন্তু নমিতার সঙ্গে ওর লিংকটা কী—এই ল্যাংড়া সমীরের?'

'নমিতা ল্যাংড়া সমীরের বোন। আমি ফোর্স নিয়ে নমিতার বাড়িতে যখন পৌছোলাম, আপনাদের ছেড়ে দিয়েই, নারকেলডাঙার একটা বস্তিতে, দেখি সমীর পিটিয়ে তার চোখমুখ ফুলিয়ে দিয়েছে, সে জ্বরে বিছানায় পড়ে গোঙাচ্ছে। পাশে যারা থাকে তারা ওকে ওষুধপত্র এনে আর রান্নাবান্না করে খাইয়েছে। বস্তিতে এটা চলে।'

নমিতা নিশ্চয়ই সমীরের কোনো খোঁজ দিতে পারেনি?'

'না।'

'ক-টা হিরে ছিল বলেছে?'

'হ্যাঁ। ছোটো মারবেলের সাইজে ছ-টা হিরে। মাসখানেক আগে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একটা কন্‌সাইনমেন্ট এসেছিল। মুম্বইয়ে কাটিয়ে-কুটিয়ে পালিশ করে তারই ছ-টা নওলাখিরা আনিয়েছিল হপ্তাখানেক আগে। ল্যাংড়া সমীর খবর পেয়েছিল। শুধু ভাবেনি দুটো দোকান ভাঙতে হবে। আর-একটা গ্যাং সমীরের পেছনে লেগেছিল, তারাই ওকে তাড়া করেছিল সেদিন।'

গাপ্পু বলল, 'যাচ্ছলে! এবার কী হবে? হিরে কোথায়? ল্যাংড়া সমীরই বা কোথায়? টেডি বেয়ারগুলোই বা কোথায়? রহস্যের কিনারাই তো হল না।'

বিজয়ানাথ বললেন, 'হ্যাঁ, আমারও মনে হচ্ছে একটা পাঁচিলে এসে ঠেকে গেছি। নেহাত কপালের ওপর ভরসা করা ছাড়া উপায় নেই।

(৩)

কপাল তো কিছু নেই, আসলে ঘটনাক্রম। বাচ্চুকাকু বললেন, 'আপনি এত হতাশ হচ্ছেন কেন? আপনাকে সাহায্য করবার জন্যে তো অনেক ব্যবস্থা তৈরি আছে।'

বিজয়ানাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'অনেক ব্যবস্থা? সে কীরকম?'

'প্রথমত রাজ্য জুড়ে পুলিশ। আপনি নিশ্চয়ই সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টারে জানিয়ে দিয়েছেন, বর্ডার সিল করতে বলেছেন—'

'হ্যাঁ, তা লালবাজার থেকে বলেছে, কিন্তু'—

'কিন্তু কাকে ধরবে, কী ধরবে—এই তো?' বাচ্চুকাকু বললেন। 'প্রথমত, টেডি বেয়ারগুলোর খোঁজ করুন। সমীর একটা টেডি বেয়ার রাখবে—বাকিগুলোকে নষ্ট করবে? কীভাবে? হয় ডাস্টবিনে ফেলবে—সেটা লোকের চোখে পড়বার কথা। না হয় পোড়াবে। না হয় অন্য কিছু করবে। কী সেটা? খোঁজ নিন!

দ্বিতীয়ত, টেডি বেয়ার চুরি হয়েছে গত রাত্রে। এর মধ্যে সে বা তার দল খুব দূরে যেতে পেরেছে বলে মনে হয় না। দল যদি হয় তাহলে একটা গাড়ি নিয়ে পালাবে, চুরি করে, না হয় ভাড়া নিয়ে। খবর নিন গাড়ি চুরি গেছে বা ভাড়া নিয়েছে কিনা। নমিতার কাছে তো জেনেছেন তার ডেরা কোথায়। তার কাছাকাছি খবর নিন। চেনা লোক না হলে গাড়ি ভাড়া দেয় না। হয়তো ওর দলের কেউ নিয়েছে।

দু-দিন অপেক্ষা করতে হল। গাড়ি চুরির খবর এল, রূপনারায়ণের জলে কয়েকটা বস্তাবন্দি টেডি বেয়ার পাওয়া গেল, আর সমীর আর তার দলবল ধরা পড়ল চুরি যাওয়া গাড়িসুদ্ধ মন্দারমণির একটা রিসর্টে।

সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা যেটা ছিল সেটাই বিজয়ানাথকে সাহায্য করেছিল। সে কথাটা রোমি তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল। তা হল ওই 'ল্যাংড়া সমীর' নামটা। বেচারার একটা পা খোঁড়া ছিল একটু। এই সমস্যা নিয়ে সে কী করে অপরাধ করত, সেটাই আশ্চর্যের। খোঁড়া মানুষ তো সকলেরই চোখে পড়ে। সেই সূত্রটা ধরেই পুলিশ তার খোঁজ পেয়ে যায়। হিরেও বেরোয় তার জগিং শু-র হিলের ভেতর থেকে। সে টেডির পেট থেকে ওখানে চালান করেছিল। তার বেশি আর এ যাত্রা কিছু করে উঠতে পারেনি।

ছবি : ওয়াসিম হেলাল

ছদ্মবেশী আততায়ী

রাজেশ বসু

ইন্টারকমটা প্রায় মিনিট তিনেক বাজার পর সিতিকণ্ঠের ঘুম ভাঙল। এমনিতে সজাগ ঘুম তাঁর। আজ এতটা রাস্তা গাড়ি হাঁকিয়ে আসায় ক্লান্তিটা ছিল খুব! চোখ লেগে গিয়েছিল। আর বয়সটাও তো কম হল না! ফিফটি নাইন রানিং। শরীরের আর দোষ কী। বেড সুইচ টিপে আগে ঘরের লাইট অন করলেন। অবচেতনের রেশ কাটেনি ঠিকমতো। সেই অবস্থাতে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার বেগেই যেন রিসিভারটা ওঠালেন।

'হ্যালো...?'

'মুখোটি বলছি স্যার। এভাবে ডিসটার্ব করলাম, সরি স্যার। হোটেলে একটা মিসহ্যাপ হয়েছে। একবার যদি আসতে পারেন।'

মুখোটি মানে হরিসাধন মুখোটি। এ হোটেলের ম্যানেজার। বছর দুয়েক ধরে বেশ ক-বার এ হোটেলে ওঠার দরুন ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছুটা অন্তরঙ্গতা হয়েছে বটে। নিজের গোয়েন্দা জীবনের অনেক গালগল্পও করেছেন এঁর সঙ্গে। সেই প্রশ্রয়েই বুঝি এভাবে ঘুম ভাঙিয়ে ফোন। হাতঘড়ি পরেই শুয়েছিলেন। সময় বলছে ভোর সাড়ে-চারটে।

'হ্যালো, হ্যালো...শুনতে পাচ্ছেন স্যার...।'

'হ্যাঁ পাচ্ছি, ব্যাপারটা কী?'

'সাংঘাতিক কাণ্ড স্যার! মার্ডার! রুম নাম্বার ফিফটিনে। ধরাও পড়েছে একজন। আপনি হোটেলে রয়েছেন তাই বিরক্ত করলাম। একটু আসবেন কী? একটা ওপিনিয়ন যদি দেন।'

'হুম।' কয়েক সেকেন্ড ভাবলেন সিতিকণ্ঠ। 'ঠিক আছে। দশ মিনিট পর আসুন।'

রিসিভারটা রেখে মনে মনে বললেন, বোঝো। এসেছিলেন নিরিবিলিতে একটু লেখালেখি করার জন্যে। হল সব গুবলেট। অপরাধী খুঁজতে অনীহা নেই। বরং উৎসাহই আছে কিছুটা। মুশকিলটা হচ্ছে লেখালেখির বারোটা বাজল বুঝি এবার। একেই বুঝি বলে ঢেঁকির স্বর্গে গিয়েও গতি নেই।

ক্রিমিন্যালদের পিছনে তো কম ছোটেননি। তেত্রিশ বছর কাটিয়েছেন সরকারি গোয়েন্দা দপ্তরে। কত রকম ঘোড়েল অপরাধীদের যে শায়েস্তা করেছেন তার হিসেব নেই। কিন্তু এখন আর ভালো লাগে না। একঘেয়েমি এসে গিয়েছে। তাছাড়া অবসরও নিয়েছেন সম্প্রতি। স্বেচ্ছাবসর। রিটায়ারমেন্টের পুরো পাঁচটি বছর বাকি ছিল। অবশ্য তিনি একা মানুষ। বিয়ে-থা করেননি। আত্মীয়-স্বজনও তেমন একটা নেই। নির্ভার। নির্দায়। সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হয়নি। এখন লেখেন উপন্যাস। রহস্য উপন্যাস! রোমাঞ্চকর কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার ঝুলি তো এমনিতেই টইটুম্বুর। সেই রসদ থেকেই এখনও অবধি চারটি উপন্যাস লিখেছেন। এই হোটেলে এসেছিলেন পঞ্চমতম উপন্যাসটি নিরিবিলিতে লেখার জন্যে! সেটি এখন পণ্ড না হলেই বাঁচেন।

উঠে দাড়ালেন সিতিকণ্ঠ। চোখে এখনো ঘুম লেগে আছে। বাথরুমে ঢুকে ফ্রেশ হলেন। পাঞ্জাবি আর চেঞ্জ করলেন না। শালটা জড়িয়ে নিলেন ভালো করে। এবার নভেম্বরের শুরুতেই ভালো শীত পড়েছে। বাইফোকাল চশমাটা সবে চোখে লাগিয়েছেন, দরজায় টোকা পড়ল।

'স্যার আমি মুখোটি, আপনি রেডি তো?'

দরজা খুলে বাইরে এলেন সিতিকণ্ঠ। ছিপছিপে মুখোটির পিছনে পুলিশের উর্দি পরা গাট্টাগোট্টা চেহারার একজন দাঁড়িয়ে। ইয়েল লক টেনে দরজাটা বন্ধ করতে এগিয়ে এল সে। করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে বলল, 'গুড মর্নিং স্যার। আমি বোলপুর থানার চার্জে রয়েছি, শেখর মণ্ডল।'

পেশাদারি মেজাজে সামান্য মাথা দোলালেন সিতিকণ্ঠ। বাইরেটা বেশ অন্ধকার। আকাশে আলোর রেখা ফুটতে দেরি আছে।

'কী ব্যাপার মুখোটি, বাইরের লাইটগুলো অফ দেখছি কেন?'

'কী জানি স্যার। সেটাই বুঝতে পারছি না। কোনও ফল্ট-টল্ট হয়েছে। ভাগ্যিস ভিতরেরগুলো সব আলাদা ফেজে আছে।'

'হুম।' বললেন সিতিকণ্ঠ।

এ হোটেলটা মূলতঃ তিনটেভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে দু-তলা ইকনমি বিল্ডিং—নাম রাখা হয়েছে 'বিশ্রাম'। তাতে উপর-নীচ মিলিয়ে চব্বিশটা রুম। পনেরো নম্বর ঘরটি হল ওটারই দু-তলায়। দ্বিতীয় ভাগে ডুপ্লেক্স আকারে কটেজ—এর নাম 'অবসর'। সবসুদ্ধু আটজোড়া ঘর। এরই একটিতে উঠেছেন সিতিকণ্ঠ। তৃতীয়ভাগে রয়েছে ডাইনিং হল, কমিউনিটি হল, সাইবার কাফে ইত্যাদি। বিশ্রামের সঙ্গে অ্যাটাচড্। কটেজগুলোর

সঙ্গে এগুলির ব্যবধান রচনা করেছে সুন্দর করে সাজানো একটি বাগান। সেই বাগান পেরিয়ে অকুস্থলে যাওয়ার পথে কিছুটা ডিটেইল জেনে নিলেন সিতিকণ্ঠ।

ভিক্টিমের নাম শান্তি হালদার। ষাটের কাছাকাছি বয়স। টেকনোভিস্টা নামে একটি কম্পিউটার ফার্ম এ হোটেলের কয়েকটি রুম বুক করেছে। লোকটি এদেরই কর্মচারী। সাসপেক্ট ছেলেটির নাম রিচার্ড। লোকটিরই সহকর্মী। সে বলছে, শান্তিবাবু নাকি তাকে রাত পৌনে-একটা নাগাদ এস-এম-এস করে রুমে আসতে বলে। সে যায়। দরজা ভেজানো ছিল। ঘরে ঢুকে লাইট অন করতে দেখে শান্তিবাবু বিছানায় পড়ে আছে। কপালে আঘাতের চিহ্ন। ব্যাপারটা ঠিক কি হয়েছে, বুঝে ওঠার আগেই নাকি ফার্মের মালিক সমেত আরও ক-জন এসে হাজির হয়। ফার্মের মালিক-ই থানায় খবরটা দেয়। তবে খুনের মোটিভটা এখনও অবধি বুঝে ওঠা যায়নি। যদিও ফার্মের মালিক বলছে, রিচার্ড ছেলেটি নাকি ফার্মের টাকা তছরূপ করার তালে ছিল, শান্তিবাবু নাকি সেটি ধরে ফেলেছিলেন। সেই আক্রোশেই এই খুন!

॥ ২ ॥

পাঁচফুট চারইঞ্চির কৃশ চেহারায় তেমন একটা ভারিক্কিপনা না থাকলেও মেজাজি আদব-কায়দায় সেটা অনেকটাই পুষিয়ে নিয়েছেন সিতিকণ্ঠ। ইজিপশিয়ান অ্যাকুইলাইন নাকের নীচে পুরুষ্টু একজোড়া গোঁফও রেখেছেন এই কারণে। তাকে দেখেই পনেরো নম্বরের সামনে থেকে উৎসাহী লোকের ভিড় সরে গেল।

'আসুন স্যার।' দরজা ভেজান ছিল। শেখর মণ্ডল ঠেলে ঢুকলেন।

বিছানার ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে শান্তি হালদার। সাধারণ বাঙালিদের তুলনায় বেশ লম্বা। ছ-ফিটের বেশি বলেই মনে হয়। রক্তাক্ত কপাল। ভারি কিছু সজোরে আঘাত করার চিহ্ন। মুখখানা মৃত্যুযন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই বয়সেও যথেষ্ট সৌম্যদর্শন ছিলেন ভদ্রলোক।

মৃতদেহ ছেড়ে ঘরের দিকে চোখ ফেরালেন সিতিকণ্ঠ। দরজা ঠেলে ঢুকলে বাঁ-পাশে বিছানা। ডান পাশে বাথরুম। কয়েক পা এগিয়ে হাল্কা সবুজ পর্দা লাগানো কাচের জানালা। গ্রিলবিহীন। এ হোটেলের এটাই বৈশিষ্ট্য। কোনও রুমের জানালাতেই গ্রিল নেই।

'জানলা বন্ধই ছিল?' শেখর মণ্ডলের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন সিতিকণ্ঠ।

'না স্যার। একদম হাট। আমরা এসে বন্ধ করি।'

জানালার কাছে সরে এলেন সিতিকণ্ঠ। ছাদের ড্রেনপাইপ গিয়েছে জানালার পাশ দিয়েই। কার্নিশের কাছে একটা আংটা ভাঙাও মনে হল সিতিকণ্ঠর। নীচে নেমে দেখবেন। ডুপ্লেক্স কটেজগুলো এ-ঘরের পিছনেই। এখান থেকে খালি এক আর তিন নম্বর কটেজ দুটি দেখা যায়। দুটিই অন্ধকার।

নজর আবার ঘরের মধ্যে। ছোট একটি কালার টিভি। ওয়ার্ডরোব। ড্রেসিং টেবিল। দুটি কাঠের চেয়ার। ইন্টারকম। আর শান্তিবাবুর কিছু ব্যক্তিগত জিনিস।

সেগুলি সব লন্ড-ভন্ড। আততায়ী খুব সম্ভবত কিছু একটা খুঁজছিল।

'টাকা-পয়সাতে হাতই দেয়নি স্যার। মানিব্যাগে চারটে একহাজার টাকার কড়কড়ে নোট ছিল। সব ক-টি আনটাচ্‌ড। হাতের আংটিটাও সোনার। এটাও আনটাচ্‌ড।''

'খুনের হাতিয়ারগুলো পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ স্যার। বেল্ট-টা তো পেয়েইছি। রিচার্ড ছেলেটিরই বেল্ট। অ্যাডমিটও করেছে। বলছে চুরি গেছিল নাকি। রক্তমাখা একটা পাথরও পেয়েছি। বিছানাতেই পড়েছিল। প্রায় কিলোটাক ওজন হবে। ওটা দিয়েই বোধহয় মাথায়—'

'গুড। ভিক্টিমের মোবাইলটা—'

'ইয়েস স্যার। ওটাও পেয়েছি। ভেরি স্ট্রং এভিডেন্স। বডির পাশেই পড়েছিল। পৌনে একটা থেকে একটার মধ্যে তিন-চারটে কলও গিয়েছে ওটা থেকে। এসএমএস-ও আছে একটা। মুখস্ত হয়ে গেছে—রিচার্ড প্লিজ কাম টু মাই রুম, আই ওয়ান্ট টু সেটল দিজ। বুঝতেই পারছেন কিছু একটা গোপন ব্যাপার ছিল দুজনের মধ্যে।'

'হুম। তার মানে খুনটা হয়েছে রাত একটার পর।' বললেন সিতিকণ্ঠ। হাটু মুড়ে বসে ডিভানের নীচে চোখ রেখেছেন। পাওয়া গেল লাল রেক্সিনে বাঁধাই একটি ডায়েরি, আর একটি ল্যাপটপ। ডায়েরির অধিকাংশ পাতা ছেঁড়া। ল্যাপটপ ফেটে চৌচির। হার্ডডিস্ক থেকে কিছু উদ্ধারের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

'পাশের রুমে কে আছেন?' প্রশ্নটা করলেন ম্যানেজার মুখোটিকে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সিতিকণ্ঠের গোয়েন্দাগিরি দেখছেন।

'পাশের ষোলো নম্বরটা খালি। টেকনোভিস্টার-ই বুকিং রয়েছে। ওপাশে চোদ্দো নম্বরে হাজরাবাবু ছিলেন। ওনার অবশ্য রাতের ট্রেনে মালদা চলে যাওয়ার কথা।'

'রাতের ট্রেনে মানে, মালদা টাউন এক্সপ্রেসে নাকি? সে তো প্রায় দুটোর সময় বোলপুরে ঢোকে জানি।' ভুরু কুঁচকে বললেন সিতিকণ্ঠ।

'হ্যাঁ স্যার। তাই তো বললেন। বাড়ি থেকে ফোন এসেছিল। দাদু না কার সেরিব্রাল অ্যাটাক। এবার সাতদিনের জন্যে অ্যাডভ্যান্স বুক করেছিলেন। রাতেই হোটেল ছেড়ে দিলেন।'

'এবার মানে, মাঝে মাঝেই আসেন নাকি?'

'গতমাস থেকে আসছেন। অক্টোবরের পরপর তিনটে উইকএন্ডেই এসেছিলেন। মালদায় কোন কলেজে ইতিহাস পড়ান নাকি। বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে রিসার্চ করছেন।'

'অত রাতে গেলেন কীভাবে?'

'এটা স্যার মিঃ বেরিওয়ালের অনুগ্রহ। আমাদের নতুন হোটেল। এখনও গাড়ির অ্যারেঞ্জমেন্ট করে উঠতে পারিনি।'

'মিঃ বেরিওয়াল?'

'আজ্ঞে স্যার, ইনিই তো টেকনোভিস্টার মালিক।' বললেন শেখর মণ্ডল।

'বটে।' এতক্ষণে টেকনোভিস্টার নামটা মনে করতে পারলেন। পেপারে অ্যাড দেখেছেন। মাল্টিমিডিয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরমায়েশি কাজকর্ম ছাড়াও আলট্রাসেফ ব্র্যান্ডনেমে এদের একটা অ্যান্টি-ভাইরাস কিট-ও আছে। বিজ্ঞাপনের বহর দেখে মনে তো হয় না খারাপ চলে।

'রিচার্ড ছেলেটি কোথায়?'

'ওর ঘরেই। কনস্টেবল দিয়ে বসিয়ে রেখেছি, কথা বলবেন?'

'সে তো বটেই। সকলের সঙ্গেই বলতে হবে। তার আগে চলুন নীচটা ঘুরে আসি।'

আধঘন্টা ধরে গোটা হোটেলটা ঘুরে দেখলেন সিতিকণ্ঠ। ভোরের আলো ফুটে উঠেছে অনেকটাই। পনের নম্বর ঘরের নীচে পাইপের ভাঙা আংটাও পাওয়া গেল। কাছেই একটা কুকুর শুয়ে ছিল। অপরিচিত মুখ দেখে হঠাৎ চেঁচাতে শুরু করল সে।

'মণ্ডলবাবু আপনার ফরেনসিকের লোককে বলুন এই দাগগুলো কীসের টেস্ট করতে,—হিউম্যান ব্লাড না তো!'

শেখর মন্ডল দেখলেন পাইপটা যেখানে জলনিকাশি ড্রেনে পড়েছে সেখানে কংক্রিটের ওপর বেশ কয়েক ফোঁটা লালচে তরল জমাট বেঁধে রয়েছে। তেরো বছরের পুলিশি অভিজ্ঞতার খাতিরে বলার দরকার পড়ে না, ওগুলো রক্তেরই ফোঁটা!

॥ ৩ ॥

পরপর দু-কাপ চা খেলেন সিতিকণ্ঠ। জেরার সময় ঘনঘন চা না খেলে মাথাটা খোলে না ঠিকমতো। বসেছেন হোটেলের অফিসরুমে। ছোট হলেও আধুনিক। ফ্যাক্সমেশিন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট—সবই আছে। আপাতত দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন হোটেলের রেজিস্টারের ওপর। এই মুহূর্তে সবসুদ্ধু দশটি রুম অকুপায়েড। ছ-টি ইকনমি বিল্ডিংয়ে। দুটি ডুপ্লেক্স কটেজে। যারা রয়েছেন মোটামুটি এরকমভাবে সাজিয়েছেন :

ইকনমি বিল্ডিং		বিশ্রাম (সারি দিয়ে রুম। সামনে টানা বারান্দা।)
দু তলা		
রুম নম্বর	১৩	রিচার্ড এন ড্রোজারিও (সাসপেক্ট)
	১৪	বি হাজরা (উধাও)
	১৫	শান্তি হালদার (ভিক্টিম)
	১৬	নিশা মেহতা (টেকনোভিস্টার স্টাফ, আসেননি)
	১৭	মিঃ অ্যান্ড মিসেস দাশগুপ্ত (ট্যুরিস্ট)
	১৮	সঙ্গীতা সান্যাল
একতলা		
রুম নম্বর	০১	মিঃ রাহা (মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ)
	১১	হোটেলের অফিসরুম
	১২	ম্যানেজার মুখোটি
ডুপ্লেক্স কটেজ—		অবসর (মোট আটটি)
কটেজ নং	১	রাজীব বেরিওয়াল
	৩	এম পি পালন (টেকনোভিস্টার উচ্চপদস্থ কর্মচারী)
	৮	সিতিকণ্ঠ ভাদুড়ি (তিনি নিজে)

'স্যার শুরু করবেন?' শেখর মণ্ডল বললেন।

'হ্যাঁ। মুখোটিকে দিয়েই শুরু হোক।' সিতিকণ্ঠ বললেন।

পাশের রুমেই ছিলেন ভদ্রলোক। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। সিতিকণ্ঠের মতোই অবিবাহিত। আপনজন বলতেও তেমন কেউ নেই। বারো নম্বর ঘরটি তাঁর থাকার জন্যেই বরাদ্দ। রাতভোর জেগে জিরোচ্ছিলেন বোধহয়। তলব পড়ায় উঠে এলেন পাশের ঘরে।

'বলুন স্যার।'

'কাল রাত্তিরের ঘটনাটা গুছিয়ে বলুন তো একবার।'

'নিমাইকে তো চেনেন। ক্যান্টিন স্টাফ। রাত্তিরে হোটেলেই শোয়া। ঘুমোচ্ছিলাম, ও-ই ডেকে তোলে। ওর মুখেই শুনি পনেরো নম্বরে খুন হয়েছে। ছুটলাম ওপরে। গিয়ে দেখি অলরেডি অনেক লোক। মিঃ বেরিওয়াল ছিলেন। মিস সান্যাল ছিলেন। নাইট গার্ড জেসু ছিল। রুমসার্ভিসের ছেলেগুলিও উঠে এসেছিল। একটু পরে সতেরো নম্বরের দাশগুপ্তবাবুও বেরিয়ে এলেন। রিচার্ড ছেলেটিকে ধরে রাখা হয়েছিল।'

'সে খুন করেছে বলে মনে হয়?'

'কী জানি স্যার। এমনিতে তো খারাপ কিছু মনে হয়নি। তবে কাল সাড়ে-আটটা নাগাদ ডাইনিংহলে দু'জনে মিলে কীসব আলোচনা করছিল। চোদ্দো নম্বরের হাজরাও ছিল কিছুক্ষণ। দুজনেই বেশ উত্তেজিত ছিল। ছেড়ে দেব না। পার পাবে না, এসব বলছিল। কম্পিউটার, ই-মেইল, পাসওয়ার্ড এসব শব্দও কানে এসেছে।'

'শান্তিবাবু লোকটি কেমন ছিলেন?'

'এত অল্প সময়ে আর কী বুঝব। তবে খুব খুঁতখুতে ছিলেন। আর সাংঘাতিক নীতিবাগীশ। জীবনে নাকি কোনওদিন কোনও অন্যায় কাজ করেননি। কাউকে করতে দেখলেও নাকি তা বরদাস্ত করেন না।''

'হুঁ। আর হাজরা লোকটি?'

'একা থাকতে ভালোবাসতেন। তবে গন্ডগোলের বলে মনে হয় না। তাছাড়া ফ্রোজেন শোলডারের পেশেন্ট। ডানহাতটা নাড়াতেই পারেন না। বাঁ হাতে লেখার অভ্যাস করেছিলেন। আমাদের রেজিস্টারে তো বাঁ-হাতেই সাইন করলেন।'

'ঠিক আছে। আপনি আসুন এবার।' সিতিকণ্ঠ চায়ের কাপ নিয়েই উঠে দাঁড়ালেন। 'ভালো কথা, ভিক্টিমের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে কী?'

'ওটা স্যার আমার লোকেরাই করে দিয়েছে।' শেখর মণ্ডল বলে উঠলেন।

পরের জন জেসু হেমব্রম। বছর পঞ্চাশ বয়স। গতকাল রাতে হোটেল চত্বরে পাহারায় ছিল। একে সঙ্গে নিয়েই রাজীব বেরিওয়াল পনেরো নম্বরে যান।

'হোটেলে খুন হয়ে গেল, কেমন গার্ড দিচ্ছিলে তুমি?'

'শরীরটা স্যার কালকে ভালো ছিল না। একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' কাঁচুমাচু মুখে বলল জেসু।

'চমৎকার। তোকেও দেখছি গাড়িতে তুলতে হবে। হোটেলে এমন কাণ্ড হল, কী পাহারা দিচ্ছিলে হে!' বলে উঠলেন শেখর মণ্ডল!

জিভ কাটল জেসু। 'আজ্ঞে স্যার, কাল কোল-ড্রিঙ্কসটা খাওয়ার পর এমনি ঘুম পেল...।'

'কোল্ডড্রিঙ্কস?'' সিতিকণ্ঠ বললেন ভুরু কুঁচকে।

'হ্যাঁ স্যার। চোদ্দোনম্বরের হাজরাবাবু দিয়েছিলেন। পুরো এক বোতল। নিজের জন্যে কিনেছিলেন। হঠাৎ চলে যেতে হল বলে আমাকে দিয়ে যান। কিন্তু, খেয়ে

এমনি ঘুম! তাও পুরোটা খাইনি।'

'বটে!' বললেন সিতিকণ্ঠ 'তা জিনিসটি তিনি দিলেন কখন?'

'কাল রাত্তিরে স্যার। উনি বেরিসাহেবের ঘরে এসেছিলেন। সাড়ে-নটা বাজে, মেনগেট-টা বন্ধ করছি। উনি নিজেই ডেকে দিলেন।'

'হাজরাবাবু এর আগেও তো তিনবার এ হোটেলে উঠেছেন। আগে কখনো এ সব দিয়েছেন?'

'না স্যার। কথাই তো বলেন না একদম। রুমের বাইরেও আসতেন না তেমন। আমি তো স্যার প্রথমে একটু ঘাবড়েই গেছিলাম।'

'খুনের কথাটা জানলে কখন?'

হাজরাবাবুকে বেরিসাহেব ছেড়ে এনে পর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বেরিসাহেব-ই ডাকলেন আবার। বিশ্রামে নিয়ে গেলেন। ওপরে উঠে দেখি পনেরো নম্বরের দরজা খোলা। শান্তিবাবু পড়ে আছেন। আর তের নম্বরের দাদা বেল্ট হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদেরকে দেখে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই বেরিসাহেব খুন খুন বলে ওকে জাপটে ধরলেন। আমিও ধরলাম।'

'হাজরাবাবু সাড়ে-নটা থেকে বেরিসাহেবের ঘরে ছিলেন?'

জেসু একটু চিন্তা করল।

'না মনে হয়। কারণ বারোটার পর আমার ঘুমটা একটু ভেঙেছিল যেন। দেখলাম হাজরাবাবু বেরিসাহেবের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কী একটু খুঁজছেন। ভালো বুঝতে পারছিলাম না। বাইরের লাইটগুলো জ্বলছিল না। মনে হল উনি ফিরে গেলেন। একটু পর আবার এলেন যেন। এবার ঘরে ঢুকে গেলেন। চোখ টানছিল খুব। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটু পর দেখি বেরিসাহেব গাড়ি থেকে বেরিয়ে ডাকছেন। উঠে মেনগেট খুলে দিই। দরজা ভেজিয়ে রাখি। উনি দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসেন। নিজেই দরজা খুলে নেন।'

'বেরিসাহেব কাল রাত্তিরে কী করছিলেন?'

জেসু চোখ বড়বড় করে ভাবল আধমিনিট, 'ওনাদের তো মিটিন ছিল। তারপর তো ঘরেই ছিলেন। আলো জ্বলছিল। জানলার পর্দায় ওনার ছায়াও দেখতে পাচ্ছিলাম। পাইপ খাচ্ছিলেন।'

'ঠিক আছে। এখন যাও তুমি। আর কোল্ড-ড্রিঙ্কসের বোতলটা দারোগাবাবুর কাছে জমা দিও।'

মাথা নেড়ে চলে গেল জেসু।

সিতিকণ্ঠ এবার ডাকলেন সঙ্গীতা সান্যালকে। ২০০৩ সালে ফার্মের ইনকর্পোরেশন থেকেই আছেন। অফিস সেক্রেটারির কাজ করেন। বয়স আন্দাজ পয়ত্রিশ-ছত্রিশ। জিনসের ওপর ঢোলা জামা পরে এসেছেন। শ্যামবর্ণমুখে মিষ্টত্বের ছাপ আছে।

'কাল রাতে শান্তিবাবুর ফোন পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ স্যার। ঠিক বারোটা আটচল্লিশে। আমি জেগেই ছিলাম। সঙ্গে-সঙ্গেই ধরি, কিন্তু লাইনটা কেটে যায়।' সেলফোন হাতে নিয়েই এসেছেন। কল-রেজিস্টার ওপেন করে বাড়িয়ে দিলেন সিতিকণ্ঠকে।

'শোওয়ার সময় মোবাইল অফ করেন না?'

'বাড়িতে থাকলে করি। তাছাড়া স্যারের শরীর ঠিক ছিল না। বলেছিলেন দরকার হলে ফোন করতে পারেন।'

'জেগে ছিলেন কেন?'

'অ্যাকচুয়ালি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। কুকুরের চিৎকারে ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে যায়। হোটেলে দু-তিনটে কুকুর আছে দেখেছেন তো। এর মিনিট কুড়ি পর স্যার ফোন করলেন। মাইগ্রেন ধরেছে। অ্যানালজেসিক কিছু আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন।'

'সেটা কখন?'

'বারোটা চল্লিশে।' আবার কলরেজিস্টার ওপেন করে টাইম অফ কল দেখালেন মিস সান্যাল।

'হুম! খুনের ঘটনাটা কখন জানতে পারেন?'

'শান্তিবাবুর ফোনের দু-মিনিট পরেই আবার স্যার ফোন করে বলেন আমার রুমে আসছেন। শান্তিবাবু নাকি হেল্প চাইছেন। নাইট ড্রেসে ছিলাম। চেঞ্জ করছি, চেঁচামেচি শুনলাম। বারান্দায় বেরোতে দেখি, রিচার্ডকে স্যার আর হোটেলের নাইটগার্ড জাপটে ধরে রেখেছে। শান্তিবাবুর রুমের দরজা খোলা! ভয়ে আমি রুমের সামনেই যাইনি। এর মধ্যেই অনেকে চলে আসেন।'

'শান্তিবাবু লোকটি কেমন ছিলেন?'

'ভারি ভালোমানুষ ছিলেন। একটু খিটখিটে ছিলেন ঠিকই। তবে খুব অনেস্ট ছিলেন। বেশিরকমের। কোনও অফিসে টিকতে পারেন না! এখানে জয়েন করার আগে অনেকদিন বেকার ছিলেন নাকি। এই ফার্মে আছেন বছর তিনেক। স্যারের বাবার চেনা ছিলেন নাকি। সেই সূত্রেই চাকরি। এখানে অ্যাকাউন্টসের কাজ দেখলেও কম্পিউটারটাও ভালো বুঝতেন। স্যারের সঙ্গে প্রথমে ভালো রিলেশন ছিল। কিন্তু গত তিনমাসে ওদের মধ্যে মাঝে মধ্যে কথা কাটাকাটি হতে দেখেছি আমি।' চুপ করে গেলেন মিস সান্যাল।

'কারণটা কী?'

'কী জানি। বলতে পারব না। তবে ফার্মের কাজ নিয়ে ভদ্রলোক খুশি ছিলেন না। একবার আমাকে বলেছিল ওয়ান ডে উই উইল বি ইন গ্রেট প্রব্লেম। কী ব্যাপারে সেটা বলেননি।'

'রিচার্ড ড্রোজারিও ছেলেটি?'

'একটু রগচটা প্রকৃতির। তবে কাউকে খুন করতে পারে এমন কিন্তু মনে হয় না। ফার্মেও নতুন। মাস ছয়েক হল ঢুকেছে। মিউজিকের নেশা খুব। গিটার তো বাজাতেই পারে। গানের গলাটাও খারাপ না। নিজের একটা অ্যালবাম বের করারও ইচ্ছা খুব। সে জন্য টাকাও জোগাড় করছিল।'

'আর তাই জন্যেই ফার্মের টাকা সরানোর চেষ্টা।' শেখর মণ্ডল বলে উঠলেন, 'শান্তি হালদার ধরে ফেললেন। সে জন্যে তাকে মার্ডার হতে হল। সিম্পল কেস। এবার আরোও ভালো বুঝতে পারছি।'

সিতিকণ্ঠ একটু বিরক্ত হলেন। জেরার সময় অযাচিত কথা তিনি পছন্দ করেন না। শেখর মণ্ডলের দিকে বিরক্তিসূচক একটি দৃষ্টি হেনে তাকে চুপ করতে ইঙ্গিত করলেন। তারপর সঙ্গীতা সান্যালের দিকে ফিরে বললেন, 'হোটেলে আপনাদের রুমের অ্যালটমেন্ট, মানে কে কোন রুমে থাকবে এটা কে ঠিক করলেন?'

'স্যার—মানে বেরিওয়াল সাহেব।'

'চোদ্দো নম্বরের হাজরাবাবুকে কেমন মনে হয়?'

'হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাসপিশাস। এমনিতেই মুখ ভর্তি দাড়িগোঁফ, তার ওপর যখনই দেখি মাঙ্কি টুপি পরে রয়েছেন। বয়স শুনলাম প্রায় ষাট বছর। কিন্তু চাউনিতে তা মোটেই মনে হত না।'

'গতকাল আপনাদের ফার্মের মিটিং ছিল?'

'ছিল তো। হয়নি। স্যার আনইজি ফিল করছিলেন। কলকাতা থেকে প্রোজেক্টর বয়ে এনেও ডেমনস্ট্রেশন দিতে পারলেন না। আসলে এখানে একটা ব্রাঞ্চ খোলা হবে। সে জন্যেই কনসার্নড কয়েকজন এসেছি আমরা।'

'ইন্টারেস্টিং।' পাক্কা দেড়মিনিট চুপ থেকে বললেন সিতিকণ্ঠ, 'ঠিক আছে আপনি এখন আসুন মিস সান্যাল।'

এরপর আরও কয়েজনের সঙ্গে কথা বললেন সিতিকণ্ঠ। তেমন কিছু নতুন তথ্য পেলেন না। দাশগুপ্তবাবু শুধু বললেন রাত হলে তাঁর কাশির বাতিক আছে। এসব কাণ্ড হওয়ার আগে একবার কাশির জন্যেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সেই সময় কুকুরের তীক্ষ্ণ চীৎকার শুনেছিলেন তিনি। আর একজন রুমবয় জানাল রাত সাড়ে-নটা নাগাদ হাজরাকে বেরিওয়ালের ঘরে যেতে দেখেছে। পালান বা রাহামশাইও কিছু বলতে পারলেন না। তাঁরা অকাতরে ঘুমিয়েছেন। ভিক্টিমের ডায়েরিতেও উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। খালি ইংরাজিতে লেখা একটি বাক্য—'SHANTI without RAJEEB is nothing, just nothing,—only ZERO, without space!' এটাতে একটু খটকা লাগছে বটে, রাজীব ছাড়া শান্তিবাবু

যদি নাথিং বা স্রেফ শূন্যই হয়, তবে মিস সান্যাল কি মিথ্যে বললেন? চাকরি পেয়ে শান্তি হালদার যে রাজীব বেরিওয়ালের প্রতি যথেষ্টই কৃতজ্ঞ, সেটাই তো মনে হচ্ছে। দেখা যাক কী হয়। স্টেটমেন্ট নিতে আর দু'জনই বাকি। রাজীব বেরিওয়াল আর রিচার্ড এন ড্রোজারিও।

প্রথম জনকেই আগে ডাকলেন সিতিকণ্ঠ।

মুখে পাইপ আর হাতে সেলফোন নিয়ে স্মার্টলি ঢুকলেন রাজীব বেরিওয়াল। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। মাজা-মাজা গায়ের রঙ। বেশ চোখাচোখা চেহারা। হাইটও ভালো। ছ-ফিট তো হবেই। একটু আগেই বোধহয় শেভ করলেন, আফটার শেভের সুগন্ধ বের হচ্ছে ভুরভুর করে।

'মিঃ বেরিওয়ালের কী পাইপের নেশা?' হাল্কা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলেন সিতিকণ্ঠ।

'সবে ধরেছি। টু মান্থস হবে। আই লাইক টু চেঞ্জ।'

'হুম। শান্তিবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল?'

'ভালোই। তিন বছর কাজ করছেন আমার ফার্মে। এত কাজের মানুষ। কী যে হয়ে গেল! রিচার্ড যে এমন করতে পারে...আমাকে দুদিন আগেও উনি বলেছিলেন রিচার্ডের কথা, তখন যদি ওকে স্যাক করতাম...'

'মিঃ হাজরার সঙ্গে আপনার আগে আলাপ ছিল?' প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন সিতিকণ্ঠ।

'কিছুটা তো ছিলই। রেজিস্টারে দেখলেন তো অক্টোবরের এন্ডে এখানে দু-দিন ছিলাম আমি। উনিও ছিলেন আমার পাশেই। তখন পরিচয় হয়। একটা কথা আপনাকে বলি মিঃ ভাদুড়ি, কাল বিপদে পড়ে উনি আমার কাছে এসেছিলেন। হেল্প করেছি। নাথিং মোর

দ্যান দ্যাট। ইফ হি হ্যাজ কমিটেড ইট, আই ক্যান নট প্রোভাইড এনি ফারদার ডিটেইলস অ্যাবাউট হিম।'

'রেজিস্টারে দেখছি অক্টোবরের এন্ডে আপনি চোদ্দো নম্বর রুমে উঠেছিলেন।'

'আমার মতো লোক অর্ডিনারি রুমে উঠল কেন, এটা জানতে চাইছেন তো? আসলে আমি পার্সে টাকা নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। এরা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অ্যাক্সেপ্ট করে না, জানেন তো।'

'সেই সময়ই কি আপনি টেকনোভিস্টার জন্যে রুমগুলো অ্যাডভ্যান্স বুক করেছিলেন?'

'সার্টেনলি।'

'শান্তিবাবুর পাশের রুমে ছিল রিচার্ড। অন্যটি, মানে ষোলো নম্বরের নিশা মেহতাও তো আপনার ফার্মের কর্মচারী, তিনি এলেন না কেন?'

'এটা আমার মানেটারি লস।' বললেন বেরিওয়াল, 'বুকিংয়ের পর মনে হল নিশার না আসলেও চলবে।'

'আই সি।' বললেন সিতিকণ্ঠ, 'আর একটা কথা, বোলপুরে এর থেকে তো অনেক বেটার হোটেল ছিল। টাউন থেকে এতটা দূরের হোটেলে ওঠার কোনও কারণ আছে কী?'

'গোলমাল কম। ভিড় নেই একদম। এটাই তো মেইন রিজন।'

'কাল রাত্তিরে শান্তিবাবু আপনাকে ফোন করেছিল?'

'অফকোর্স ইয়েস। আদারওয়াইজ আমি যাবই বা কেন অত রাত্তিরে। শি টোল্ড মি রিচার্ড ওয়াজ থ্রেটনিং হিম।' বুকপকেট থেকে সেলফোন বের করে বাড়িয়ে দিলেন সিতিকণ্ঠর দিকে। 'চেক করে দেখুন। ঠিক রাত বারোটা পঁয়তাল্লিশে।'

সিতিকণ্ঠ সেদিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সে সময়ে আপনি কী করছিলেন?'

'আমি তখন সবে মিঃ হাজরাকে ছেড়ে এসেছি।'

'তার আগে কী করছিলেন?'

'টিভি দেখছিলাম।'

'শান্তিবাবুর সঙ্গেও আপনার ইদানিং সম্পর্কটা ভালো যাচ্ছিল না। এর কারণ জানতে পারি?'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলেন রাজীব বেরিওয়ালা। তারপর বললেন, 'মিঃ ভাদুড়ি। ইউ আর মিসগাইডেড। কারোওর সঙ্গে যদি আমার রিলেশন খারাপই হবে, তবে তাকে নিজের ফার্মে রাখবই কেন। শান্তিবাবু আমার বাবার চেনা ছিলেন। তা কিছুটা বদমেজাজি ছিলেন। কোথাও টিকতে পারছিলেন না। আমি ওঁকে চাকরি দিই। অ্যান্ড হি ওয়াজ গ্রেটফুল ফর দ্যাট। —এনিওয়ে, আমি আর কিছু বলতে পারব না। আর লাঞ্চের পর আমি কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। আজ রাতের ফ্লাইটে আমাকে সিঙ্গাপুর যেতে হবে। শিডিউলড বিজনেস মিটিং।'

'স্যারি মিঃ বেরিওয়াল।' ঠান্ডা গলায় বললেন সিতিকণ্ঠ। 'আমরা কিছু ইনফরমেশনের জন্যে ওয়েট করছি। বিকেলের মধ্যেই সেগুলি এসে যাওয়ার কথা। যতক্ষণ না আসছে, ততক্ষণ আপনি কেন, কেউই এ হোটেল ছেড়ে বেরতে পারবে না।'

'লেটস সি।' স্পষ্টতই বিরক্ত হলেন বেরিওয়াল। 'কারণ ছাড়া আমাকে আটকে রাখতে পারেন না আপনি।' বলে বেরিয়ে গেলেন সটান। সিতিকণ্ঠর মনে হল ডান পায়ে একটু যেন খোঁড়াচ্ছেন। শেখর মণ্ডলের দিকে ফিরে বললেন, 'এবার রিচার্ড ছেলেটিকে আনুন।'

'আমি খুন করিনি স্যার।' ঘরে ঢুকেই কান্নাকাটি জুড়ল সে। রাতের পোশাকেই রয়েছে। বারমুডার ওপরে গোলগলা গেঞ্জি। বয়স বেশি না। চব্বিশ-পঁচিশ। রঙ ফর্সা। তবে হাইট-টা বেশ কম। বড়জোর পাঁচফুট দু-এক ইঞ্চি।

'তবে অত রাতে শান্তি হালদারের গলায় নিজের বেল্ট জড়িয়ে কী করছিলে বাপি?' শেখর মণ্ডল ধমক দিয়ে উঠলেন।

রিচার্ড আবার হাউমাউ করে উঠল, 'বিলিভ মি, আই ডিডিন'ট কিল হিম। সত্যি বলছি স্যার। আমি ঘুমোচ্ছিলাম। উনি মিসকল দিয়ে আমার ঘুম ভাঙান।

এরপর এসএমএস করেন ঘরে যাওয়ার জন্যে। পৌনে একটা মতো হবে তখন। আমি রিংব্যাক করেছিলাম। রেসপন্স করছিলেন না। লাস্টে ওর ঘরেই যাই আমি। মে বি দশ মিনিট পর। আমার ধারণা, বাই দিজ টাইম সামওয়ান...' কী একটা ভেবে থেমে গেল সে।

পরক্ষণেই উত্তেজিত হয়ে পড়ল, 'স্যার ইট ওয়াজ নট মিঃ হালদার। হি নেভার কলড মি অ্যাজ রিচার্ড। উনি আমাকে মিডল নামে ডাকতেন। নিল। মাই ফুল নেম ইজ রিচার্ড নিল ড্রোজারিও। পুরোটা লিখি না আমি। আমার মধ্যের নামটা একমাত্র ওনাকেই বলেছিলাম। আসলে এই ফার্মে কেউ জানে না, উনি আমার পূর্ব পরিচিত ছিলেন।'

'ইন্টারেস্টিং।' বললেন সিতিকণ্ঠ, 'কিন্তু তোমার বেল্ট ওর গলায় কী করে পৌঁছল?'

'গতকাল মিটিংয়ে ক্যাজুয়্যাল ড্রেসে গেছিলাম। বেল্ট পরিনি। দরজাও বাইরে থেকে লক করিনি। ইভেন ওটা যে চুরি গেছে এটাও পরে জানতে পারি। আমাকে ডেলিবারেটলি ফাঁসাচ্ছে স্যার।'

'কে?'

'বলব স্যার। বাট প্লিজ অ্যালাউ মি টু সে ইট কনফিডেনসিয়্যালি।'

একটু ভাবলেন সিতিকণ্ঠ।

'ঠিক আছে।' ইশারা করলেন শেখর মণ্ডলকে। নিমপাতা মুখ করে উঠল সে। কী যে এত জেরার দরকার আছে, বুঝছেন না। বেকার টাইম নষ্ট হচ্ছে। অলরেডি আটটা বাজে। হাজারো কাজ। বেশি দূর নড়লেন না। দরজায় পর্দা ঝুলছিল। তার ওপারে দাঁড়িয়ে রইলেন। হাল্কা গোলাপি পর্দায় তার অবয়বটা অস্পষ্ট হয়ে ফুটে রইল। সেদিকে তাকিয়ে থেকে সিতিকণ্ঠর মনে হল, কাল রাত্তির দশটা নাগাদ ডাইনিংহল থেকে ডিনার সেরে কটেজে ফেরার সময় এরকমই সিলুয়েট ছায়া দেখেছিলেন এক নম্বর কটেজের জানালায়। বন্ধ কাচের জানালায় পর্দার ওপাশে বসে পাইপে তামাক সেবন করছিলেন রাজীব বেরিওয়াল। সিতিকণ্ঠ খাতায় তাড়াতাড়ি নোট করে নিলেন। ভাবতে হবে এটা নিয়ে। একটা বড় খটকার যেন সমাধান দেখতে পাচ্ছেন।

'হ্যাঁ, বল রিচার্ড।' বললেন সিতিকণ্ঠ।

।। ৪ ।।

ঝাড়া পঞ্চাশ মিনিটেও যখন রিচার্ডের কন-ফিডেনসিয়াল টক শেষ হল না তখন, 'স্যরি স্যার, আমাকে তো এবার থানাতে যেতেই হয়,' বলে শেখর মণ্ডল ঘরে ঢুকে পড়লেন। সিতিকণ্ঠ এখন রিচার্ডের সঙ্গে ইন্টারনেট খুলে বসেছেন। দুজনেই উত্তেজিত।

'একটু দাঁড়িয়ে যান মণ্ডলবাবু। আর দেখুন কেউ যেন হোটেলের বাইরে না যায়। বিশেষ করে বেরিওয়াল-সাহেব।'

'এই যাঃ স্যার।' জিভ কাটলেন শেখর মন্ডল। 'একটু আগেই আমাকে রিকোয়েস্ট করলেন খুব। পায়ে চোট পেয়েছেন। ডাক্তার দেখাতে যাবেন। অল্পক্ষণের ব্যাপার বলে অ্যালাউ করলাম।'

'মাই গুডনেস।' এক লাফে উঠে পড়ছেন সিতিকণ্ঠ। 'বেরিয়ে গেছেন?'

'না স্যার। ঐ তো গাড়ি ঘোরাচ্ছেন।'

হোটেলের মেনগেট আদ্ধেক খোলা। যদিও তা টাটা ইন্ডিগোর বেরনোর জন্য যথেষ্ট।

ছুটলেন সিতিকণ্ঠ। গেটম্যানটা কোথায় গেল। অবশ্য কাউকেই কিছু করতে হল না। তিরবেগে ছুটে গিয়ে ইস্পাতের গেট সজোরে বন্ধ করে ফেলল রিচার্ড এন গোমজ।

'হোয়াটজ দ্য মাটার?' কালো কাচ লাগানো ঢাউস গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন রাজীব বেরিওয়াল। ডান পা-তেই চোট। টেনে হাঁটছেন।

'স্যরি মিঃ বেরিওয়াল। আমাদের ইনভেস্টিগেশন এখনও শেষ হয়নি।' সিতিকণ্ঠ বললেন।

'ইয়ারকি নাকি? আপনি আমাকে এভাবে আটকাতে পারেন না।'

কিছু বললেন না সিতিকণ্ঠ। গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলেন। ড্রাইভার-সিটে তোয়ালে ঢাকা এটি কী? তোয়ালেটা সরালেন সিতিকণ্ঠ।

'আরে, হোয়াট অ্যান অডাসিটি, আমার জিনিসে হাত দিচ্ছেন কেন?' বেরিওয়াল তেড়ে এসেছেন।

'ডাক্তারবাবুরা আজকাল ফি হিসেবে প্রোজেক্টর মেশিন নিচ্ছেন নাকি মিঃ বেরিওয়াল?'

রাজীব বেরিওয়ালের মুখ যেন হঠাৎ রক্তশূন্য।

সিতিকণ্ঠ আবার প্রশ্ন ছুঁড়লেন, 'পায়ে হঠাৎ চোট পেলেন কী করে?'

বেরিওয়াল যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন।—স্পিকটি নট!

'মণ্ডলবাবু, ওনার জিন্‌সটা হাঁটু অবধি গুটিয়ে তুলুন তো—'

জিনস গোটাতে দেখা গেল ডান পায়ের গোড়ালির ওপর তিনটে গভীর ক্ষতচিহ্ন। ফুলে লাল হয়ে উঠেছে।

'মণ্ডলবাবু, এখুনি একটা অ্যান্টি-টিটেনাস দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। অ্যান্টি-রেবিজ সিরামও লাগতে পারে। হাজার হোক কুকুরের কামড় তো। আর হ্যাঁ, আমার ইনভেস্টিগেশন কিন্তু এখানেই শেষ।'

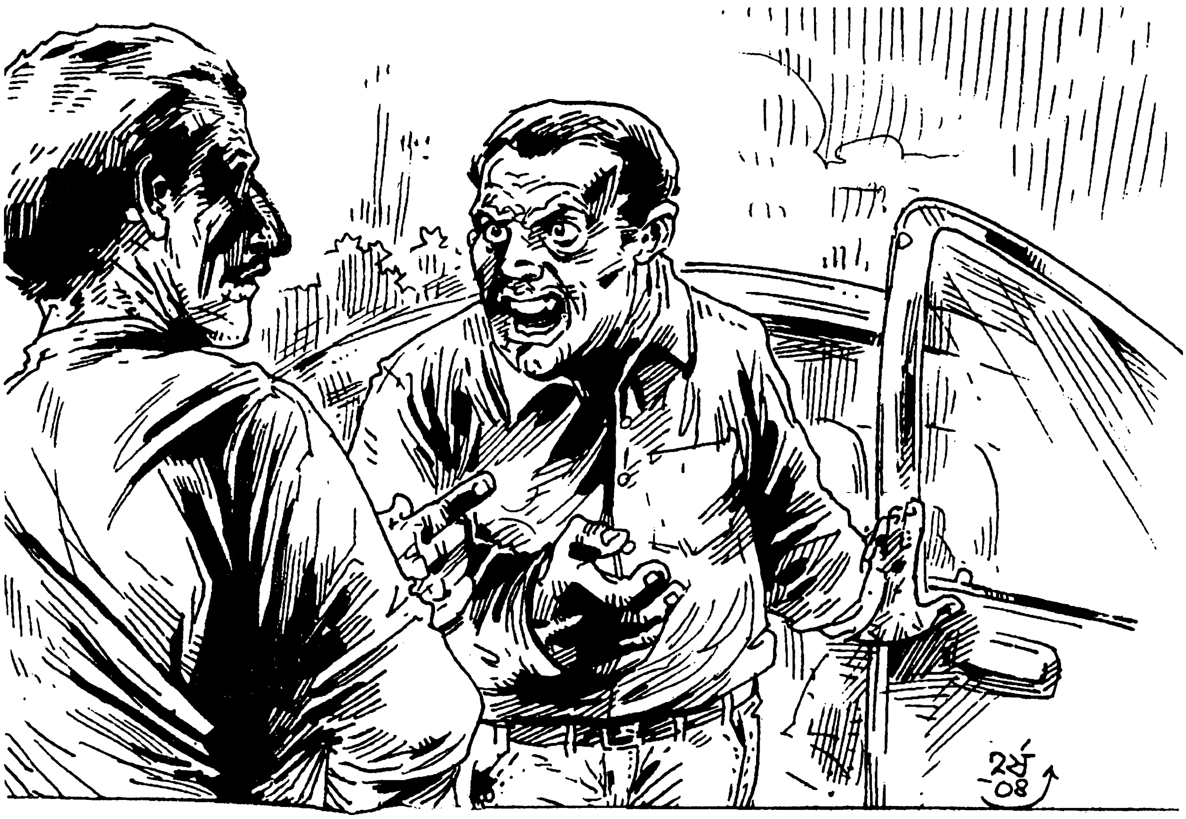

'মানে স্যার?' শেখর মণ্ডল খাবি খাচ্ছেন।

'মানে অ্যারেস্ট মিঃ বেরিওয়াল। ওরফে চোদ্দো নম্বরের বি হাজরা—শান্তি হালদারের হত্যাকারী।'

'হোয়াট ডু ইউ মিন মিঃ ভাদুড়ি। হোয়াট এভিডেন্স ইউ হ্যাভ গট?'

এতক্ষণে যেন হুঁশ এল রাজীব বেরিওয়ালের।

'এভিডেন্স তো আপনি নিজে হাতেই ছেড়ে এসেছেন মিঃ বেরিওয়াল, SHANTI without RAJEEB is nothing! ভেবেছিলেন ওটা আপনার পক্ষেই যাবে। সেজন্য ডায়রির অন্য পেজগুলো ছিঁড়ে ফেললেও ওটা রেখে দিয়েছিলেন! সন্দেহের বশে ভদ্রলোককে মারলেন বটে, কিন্তু সে যে আপনার এগেইনস্টে কী তথ্য সংগ্রহ করেছে, খুঁজেই পেলেন না। ল্যাপটপটা অবধি ভাঙলেন। ভাবতেও পারেননি তথ্যগুলো সে তার ইমেইল অ্যাকাউন্টের মেসেজ-বক্সে সেভ করে রাখতে পারে। আমিও পারিনি। ভাগ্যিস রিচার্ডকে গতকাল এরকম একটা হিন্টস সে দিয়ে রেখেছিল। যদিও পাসওয়ার্ডটা বলেনি। কারণ তখনও সে জানত না, আপনি ওকে সরাবার প্লান এঁটে বসে আছেন। এনিওয়ে, পাসওয়ার্ড-টা উদ্ধার হয়েছে। এবং টেকনোভিস্টার এত রমরমা কীসে, সে সব তথ্য অলরেডি আমাদের হাতে আসতে শুরু করেছে। এল ডোরাডো, ৯৭-এম পয়জন, বগ্গি এক্স, ইলেকট্রা ২০০৭, এগুলি আসলে কী,—কম্পিউটারের বুট সেক্টরে বা ফাইল সিস্টেমে ঢুকে এরা কী কাজ করে, এগুলো যে আমাদের জানা হয়ে গিয়েছে, মিঃ বেরিওয়াল। একদিকে অ্যান্টি-ভাইরাস সফটওয়্যার বানাচ্ছেন, অন্যদিকে নিত্যনতুন ভাইরাস ডেভেলপ করে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। একমাত্র আলট্রাসেফ ইনস্টল করলেই স্বস্তি। জবাব নেই আপনার।'

কী একটা বিড়বিড় করতে করতে হঠাৎই মাথায় হাত দিয়ে রাস্তার ওপরেই বসে পড়লেন টেকনোভিস্টার মালিক।

।। ৫ ।।

এখন সন্ধে সাড়ে-ছটা। নিজের রুমে মকাইবাড়ির চা নিয়ে বসেছেন সিতিকণ্ঠ। হোটেলের মালিক কলকাতা থেকে ফোনে বলে দিয়েছেন, ভাদুড়িসাহেব এখানে উঠলেই থাকা-খাওয়ার সমস্ত ফ্রি। মিডিয়া টের পাওয়ার আগেই যেভাবে তিনি খুনি ধরলেন, এর কোনো নাকি তুলনাই হয় না।

এইমাত্র শেখর মণ্ডল এলেন। ঘরে ঢুকেই বললেন, 'স্যার, আপনার অনুমান একদম ঠিক। পাইপের কাছে যে রক্তের দাগ পেয়েছি, তার সঙ্গে বেরিওয়ালের রক্ত মিলে গেছে। ওর ইনজুরিটাও কুকুরের কামড়ের, স্ট্রং সারকামস্টেনসিয়াল এভিডেন্স। জেসুর ঠান্ডা পানীয়ে

ঘুমের ওষুধ ছিল। বোতলে ওর আর বেরিওয়াল ছাড়া অন্য কারও ফিংগ্রারপ্রিন্ট-ও নেই। কিন্তু স্যার, আপনি ধরলেন কী করে?'

সিতিকণ্ঠ মাথা দুলিয়ে কেতাদারি হাসি দিলেন একটা।

ঘরে এখন অনেক লোক। মিস সান্যাল, রিচার্ড, ম্যানেজার মুখোটি, সস্ত্রীক মিঃ দাশগুপ্ত।

'সন্দেহটা শুরু থেকেই ছিল। প্রথম হল মার্ডারের পদ্ধতিটা। পাথরের আঘাতটা করা হয়েছিল কপালের ওপর দিকটায়। এবং ঐ আঘাতেই শান্তিবাবু অজ্ঞান হয়ে যায়। কিন্তু রিচার্ডের হাইটে এ কাজটা করা একটু কঠিন। কারণ সে যথেষ্টই খর্বাকৃতি। অবশ্য বিছানায় উঠে দাঁড়িয়েও এটা করা সম্ভব। তবে এমন হলে বচসার একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। আমার অনুমান করি, খুনি হয়তো লম্বা কেউ। তখনই শুনলাম হাজরার কথা, এখানে এসে থাকছেন, বীরভূমের ওপর গবেষণা করছেন, অথচ ঘরেই থাকেন সবসময়। খবর এল মালদার ঠিকানাটাও জাল। মানে যথেষ্টই গোলমেলে চরিত্র। কিন্তু সে শান্তি হালদারকে খামোকা খুন করতে যাবে কেন? কোনও মোটিভ-ই নেই।'

থামলেন সিতিকণ্ঠ। বাকি চা-টা শেষ করলেন এক চুমুকে।

'এবার বেরিওয়ালের কথা বলতে হয়। রাত সাড়ে-বারোটায় প্রায় অপরিচিত একজনকে ড্রাইভ করে ছেড়ে আসছেন, এটা ঠিক মানতে পারিনি। খটকা থেকেই যায়। রিচার্ডের কাছে শুনি, অক্টোবরের যে যে দিন বেরিওয়াল কলকাতার অফিসে অ্যাবসেন্ট ছিলেন, ঠিক সেই সেই দিনই হাজরা এ হোটেলে এসে উঠেছেন। মানে দুজনের কী যোগসাজস আছে? নাকি বেরিওয়াল-ই হাজরা সেজে এরকম একটা ক্যারেকটার এস্টাবলিশ করতে চাইছে। যা শুনলাম, দুজনের আকার বা উচ্চতাতেও যথেষ্ট মিল। সেই জন্যেই কি হাজরা হোটেলের খাতায় বাঁ হাতে ঠিকানা লিখেছিল? হাতের লেখা লুকনোর জন্য! তাছাড়া, সকলেই হাজরাকে বেরিওয়ালের রুমে ঢুকতে বা বের হতে দেখেছে, একসঙ্গে দুই মক্কেলকে কেউ কখনো দেখেনি। কিন্তু, এখানেও একটা গন্ডগোল। বেরিওয়াল যদি হাজরা সেজে খুনটা করে থাকে, তবে রিচার্ড শান্তিবাবুর রুমে ঢোকার আগেই করেছে। মানে রাত পৌনে একটার মধ্যে। কিন্তু, রাত দশটা থেকে তো সে নিজের রুমে জানালার সামনে বসেছিল। আমি দেখেছি। দাশগুপ্তবাবু দেখেছেন। নাইটগার্ড জেসু দেখেছে। তাহলে খুন অন্য কেউ করেছে? তবে কি রিচার্ড-ই? শান্তিবাবুকে মেরে ওরই মোবাইলে নিজের ফোনে মিথ্যে মেসেজ পাঠিয়েছে? কিন্তু তাহলে স্বয়ং বেরিওয়াল বা মিস সান্যালকে ফোন বা মিসকল করতে যাবে কেন সে? অর্থাৎ এ যুক্তি টিকছে না। ঠিক তখনই মণ্ডলবাবুর জন্য একটা রহস্যের সমাধান হয়ে গেল।'

'আমার জন্যে স্যার?' গদগদ মুখে বললেন শেখর মণ্ডল।

'কতকটা তো বটেই। রিচার্ডের কনফিডেনসিয়াল টক শুনতে আপনি পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ। পর্দায় আপনার ছায়া দেখে হঠাৎই আমার মাথাটা খুলে গেল। আরে, বেরিওয়ালের কাছে তো প্রোজেক্টর ছিল। এমন নয় তো হাজরা সেজে রুম থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ভিডিওতে নিজের ছবি তুলে রাখা ছিল আগেই। সেটাই হয়তো প্রজেক্টর মারফত পর্দায় ফেলে রাখলেন। দুর্দান্ত অ্যালিবাই। সকলে দেখবে সে ঘরে বসে আছে। মুখে একটা পাইপ জুড়ে ডিটেইলিং-টাও মজবুত করলেন। এই জন্য দেড় মাস হল পাইপও ধরলেন।

'কী সাংঘাতিক। ঐ জন্যেই প্রোজেক্টরের কথা বলতেই ভয়ে অমন শুকিয়ে গেলেন।' শেখর মণ্ডল বললেন।

'এগ্‌জ্যাক্টলি। কিন্তু এত করেও যে শেষরক্ষা হল না, তার কারণ একটি কুকুর। কীভাবে, সেটাই বলি এবার। প্রথমে তো রাত সাড়ে-আটটায় হাজরা সেজে কটেজ থেকে বেরলেন। সৌভাগ্যক্রমে কেউ দেখেনি এটা। ঘরের দরজাতেও ইয়েল লক। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, ঘরে লোক আছে কিনা। প্রথমে শান্তিবাবু-রিচার্ডের কথার মধ্যে আড়ি পাতলেন। শুরু হল দেড়মাস ধরে তৈরি করা ছকের প্রয়োগ। শান্তিবাবুকে সরাবেন। সঙ্গে রিচার্ডকেও জালে ফেলবেন। সেইমতো রুম অ্যালটমেন্টও করেছেন নিজে হাতে। বিপদ এড়াতে শান্তিবাবুর পাশের রুম নিশা মেহতার নামে বুক করেও তাকে আনেননি। একদম ফুলপ্রুফ প্ল্যান। প্রথমে রিচার্ডের বেল্ট-টা হাতালেন। অন্য কিছুও নিতে পারতেন। বেল্ট-টা পেয়ে যাওয়াতে সেটাই সরালেন। ফিরলেন নিজের ঘরে। তখন বাজে রাত সাড়ে-নটা। রুমবয় ছেলেটি দেখল হাজরা বেরিওয়ালের ঘরে ঢুকছে। এর মধ্যে জেসুকে বোতল ধরানোও হয়েছে। তাকে জাগিয়ে রেখে রিস্ক নিতে চাননি।'

কিন্তু বেরিওয়াল রিচার্ডের ঘরে ঢুকল কী করে?' মুখোটি বললেন।

'ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে। মনে করুন, অক্টোবরের লাস্ট উইকে ঐ ঘরে উঠেছিলেন। বেরিওয়াল। আমার ধারণা তখনই চাবিটার ছাপ নিয়ে যান। যা হোক, এরপর অপেক্ষা। দেখেছেন বোধহয় একনম্বর কটেজ থেকে বিশ্রামের ঘরগুলো সব দেখা যায়। রুমের আলো সব

নিবলে, আবার হাজরা সাজলেন। যথারীতি প্রোজেক্টর মারফত তার পাইপ-মুখে ছবিও চালু হল। শীতের রাত। নতুন হোটেল। লোকও তেমন নেই। নিজে ইঞ্জিনিয়ার। মিটাররুমে ঢুকে বাইরের আলোগুলোর ফেজ ওড়াতে অসুবিধা হয়নি। সকলের অজান্তে শান্তিবাবুর দরজায় এসে টোকা দিলেন। খুব সম্ভবত নিজের আসল গলাতেই ওকে ডেকেছিলেন। সেই জন্যই সাহস করে সে দরজা খুলেছিল। বেরিওয়াল তাকে খুন করতে পারে এমনটা বোধহয় সে কখনোই ধারণা করেনি। তারপর আর কী, মাথায় বাড়ি। গলায় ফাঁস। পাথরটা আগে থেকেই জোগাড় করা ছিল। এরপর ক্ষিপ্র অনুসন্ধান। কিছু না পেয়ে ল্যাপটপটা পা দিয়ে দুরমুশ করলেন। ডায়রি আর সেলফোনটা পকেটে পুরলেন। দরজা ভেজিয়ে আবার নিজের কটেজে। কিন্তু এইবার আসল মজা। ঘরে ঢোকার চাবিটা পাচ্ছেন না। তাড়াহুড়োতে পড়ে যায়নি তো। সব্বোনাশ কাণ্ড! এই সময় একটু যেন তন্দ্রা ভেঙেছিল জেসুর। সে দেখল হাজরা বেরিওয়াল সাহেবের দরজায় দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবির পকেট হাতড়াচ্ছে। যাইহোক, ভাগ্য তখনকার মতো ভালো। শান্তিবাবুর ঘরে কটেজের চাবিটা খুঁজে পেলেন। কিন্তু এই সময় সতেরো নম্বরের দাশগুপ্তবাবু এমন কাশি শুরু করেন যে তার আওয়াজ পনেরো নম্বরেও এসে পৌছায়, দরজা দিয়ে আর বেরুতে সাহস হয় না। জানালা খুলে পাইপ বেয়ে নামতে গিয়ে আংটাটা ভাঙ্গলেন, আর নিজে পড়লেন নীচে শুয়ে থাকা একটি কুকুরের ওপর। ফলাফল মোক্ষম কামড়। রক্তারক্তি কাণ্ড। সেই রক্তের দাগই আমি আবিষ্কার করি। আর সেই কুকুরের চিৎকার-ই আপনারা কেউ কেউ শোনেন।'

'কিন্তু স্যার সেই অবস্থাতে স্টেশনে যাওয়ার অ্যাক্টিংটা করল কেন?' রিচার্ড বলল আমতা আমতা করে।

'না করে উপায় ছিল না। হাজরাকে তো সরাতেই হবে। কারণ তুমি যদি পার পেয়েও যাও, তখন সবাই ভাববে হঠাৎ উধাও হওয়া লোকটাই খুনি। তাছাড়া মেকআপের সরঞ্জাম, স্লাইড, ভিডিওফিল্ম, আর ডুপ্লিকেট চাবিটাও তো কোথাও ডিসপোজ করতে হবে। প্রোজেক্টরটাও ফেলে দিতে পারতেন। কিন্তু দামী জিনিস। মায়া লাগছিল। যদিও ক্রমশঃ কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলছিলেন। ক্ষতটাও বিষিয়ে উঠছিল। বাধ্য হয়েছিলেন পালাতে। কোনওভাবে সিঙ্গাপুরের ফ্লাইটে উঠতে পারলে আপাতত বেঁচে যেতেন।

'ফোনগুলো তবে সব উনিই করেছিলেন?' মিস সান্যাল বললেন।

'সে তো বটেই। হাজরাকে ছাড়ার নাটক করে ফিরে এলেন। এরপর ওষুধ চাওয়ার অছিলায় আপনাকে রিং করে দেখে নিলেন কেউ কিছু টের পেয়েছে কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে এরপর রিচার্ডকে শান্তিবাবুর ফোন থেকে মেসেজ পাঠালেন। দু-মিনিট পর একটা মিসকল আপনাকেও করা হল। আর একটা কল নিজের ফোনে করে রিচার্ড ঘর থেকে বেরতেই জেসুকে ঠেলে তুললেন। রিচার্ড পাকড়াও হল। গন্ডগোলের মধ্যে একফাঁকে ডায়রি আর মোবাইলটা খাটের তলায় ফেলা কী আর কঠিন কাজ।'

'আর স্যার পাসওয়ার্ডটা কী করে বুঝলেন?' মিস সান্যাল বললেন।

'বলে দিলে ভেরি সিম্পল। ডায়রিতে ছিল SHANTI without RAJEEB is nothing, just nothing,—only Zero, without space! মানে একজনের থেকে অন্যজনকে বাদ দিতে হবে। জাস্ট সিম্পল সাবস্ট্রাকশন।'

'কী রকম?'

'ভেরি ইজি। 'SHANTI'র S হল ইংরাজির উনিশ নম্বর লেটার, A হল এক নম্বর, এভাবে প্রত্যেকটা লেটারের স্থান অনুসারে সাজিয়ে যোগ করলে হবে সেভেনটি-ওয়ান। একইভাবে আর 'RAJEEB'এর হবে ফর্টিওয়ান। মাইনাস করলে হবে ফর্টি।'

'কিন্তু জিরো তো হল না।'

'হল তো, জিরো মানেই তো ইংরাজিতে নিল, মানে শূন্য। আবার এটাই তো রিচার্ডের মিডল নেম। শান্তিবাবু তাকে ঐ নামেই ডাকতেন। ঘটনাক্রমে সেটা বেরিওয়াল জানতেন না। ই-মেইলের পাসওয়ার্ড-টা হল ওর নামের স্পেলিং। অবশ্য এখানে নিল বানান NIL নয়, রিচার্ডের মিডল নেমের স্পেলিং—NEIL—আগের ফরমুলা মতো অক্ষরগুলো যোগ করলে হবে চল্লিশ। ঠিক SHANTI আর RAJEEB-এর বিয়োগফল। এবার শুধু কী-বোর্ডে উইদাউট স্পেসে টাইপ করার অপেক্ষা।'

'স্যার আপনি সিম্পলি জিনিয়াস!' সঙ্গীতা সান্যাল উচ্ছ্বসিত।

'আমি নই।' মাথা নেড়ে বললেন সিতিকণ্ঠ, 'আসল জিনিয়াস ছিল বেচারী শান্তিবাবু। কোনওভাবে বেরিওয়ালের অন্যায়টা জানতে পেরে যান। বেরিওয়ালকে শুধরাতে বলেন। সে তো শোনেইনি। বরং প্রমাণ লোপের জন্য স্বয়ং শান্তি হালদারকেই সরিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র করে। অবশ্য এটাও ঠিক রিচার্ডের হেল্প ছাড়া এতবড় ক্রাইমটা ধরতেই পারতাম না। কম্পিউটারটা শিখব ভাবছি ওর থেকে। নিজেকে আপডেট না করলে আর গতি নেই দেখছি।'

ছবি: হর্ষমোহন চট্টরাজ

লোভে পাপ

রাহুল মজুমদার

সকালে ঘুম ভাঙতে একটু দেরিই হল কৃষ্ণকান্তবাবুর। গতকাল মেজোভাই চন্দ্রকান্তর বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরতে বেশ রাত হয়েছিল, প্রায় পৌনে বারোটা। তারপর পোশাক পালটে হাতমুখ ধুয়ে শুতে শুতে মাঝরাত পেরিয়ে গিয়েছিল।

কৃষ্ণকান্তবাবুরা তিন ভাই—কৃষ্ণকান্ত বড়, চন্দ্রকান্ত মেজো, সূর্যকান্ত ছোট। ওঁরা বংশানুক্রমে স্বর্ণব্যবসায়ী। কলকাতার বুকে ওঁদের তিন তিনটে শো-রুম। তিনটে শো-রুমে তিন ভাই বসেন। কৃষ্ণকান্তবাবু বসেন আদি দোকানে, বউবাজার এলাকায়; চন্দ্রকান্ত বসেন ভবানীপুরে আর সূর্যকান্ত যাদবপুরে। তিনজন থাকেনও তিন জায়গায়। কৃষ্ণকান্ত সল্টলেকে বাড়ি করেছেন, চন্দ্রকান্ত তাঁদের আদি বাসস্থান শ্যামবাজারেই থাকেন আর সূর্যকান্ত ফ্ল্যাট কিনেছে যাদবপুরে। বাকি দু-ভাই বিয়েথা করলেও মেজো চন্দ্রকান্ত অবিবাহিতই রয়ে গেছেন; পরিবারের পুরোনো কাজের লোক জয়রামকে নিয়েই তাঁর সংসার।

গতকাল চন্দ্রকান্ত-র পঞ্চাশতম জন্মদিন ছিল। এই উপলক্ষ্যে তাঁর বাড়িতে জড়ো হয়েছিলেন সকলে সন্ধ্যাবেলা। সূর্যকান্ত তাঁর স্ত্রী আর দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছিলেন। কৃষ্ণকান্তবাবু অবশ্য এসেছিলেন একাই। তাঁর ছেলে এখন ব্যাঙ্গালোরে, থুড়ি, বেঙ্গালুরুতে এম.বি.এ. পড়ছে। তার পরীক্ষা সামনে, তাই কৃষ্ণকান্তবাবুর স্ত্রী সেখানে। ওখান থেকেই ফোনে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন দেওরকে। তাঁর ছেলেও কাকামণিকে প্রণাম জানালো, উইশ করল। অনেকদিন বাদে তিনভাই বসে আড্ডা দিলেন অনেকক্ষণ।

খাওয়া দাওয়া সেরে সূর্যকান্ত সপরিবারে বিদায় নিলেন দশটার আগেই। আগামীকাল ছেলেমেয়ের স্কুল আছে। কৃষ্ণকান্ত আরো ঘন্টাখানেক ছিলেন। জয়রামকে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়তে বলে ওঁরা চন্দ্রকান্ত-র শোবার ঘরে বসেই কথাবার্তা বলছিলেন। বাড়ির পুরনো গ্র্যান্ডফাদার ক্লকে এগারোটার ঘন্টা বাজতে বুঝি দু-জনের হুঁশ হল। তার পরেই চন্দ্রকান্তর কাছে বিদায় নিয়েছিলেন কৃষ্ণকান্ত।

ঠিকে কাজের লোক মালতীর বানানো এককাপ চা আর খবরের কাগজটা নিয়ে সবে আয়েশ করে বসেছেন, সেলফোনটা বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুললেন কৃষ্ণকান্ত।

'হ্যালো, কৃষ্ণকান্ত দত্ত বলছেন?' ওপার থেকে প্রশ্ন ভেসে এল।

—'বলছি।'

—'আপনার ভাই কাল রাত একটায় মারা গেছেন।'

—'সে কী!' আঁৎকে উঠলেন কৃষ্ণকান্ত, 'কাল রাত এগারোটা পর্যন্ত তো আমি চন্দ্র-র সঙ্গে গল্প করেছি! কী হয়েছিল ওর? হার্ট অ্যাটাক?' শেষদিকে ওঁর গলা কান্নায় প্রায় বুজে এল।

ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল, 'আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছে। তবে, আমরা নিশ্চিত নই। পোস্টমর্টেমের পর ঠিক বলতে পারব। আপনি একটু আসবেন? সূর্যকান্তবাবুকেও খবর দেওয়া হয়েছে।'

'নিশ্চয়ই।' প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে কৃষ্ণকান্ত ধরা গলায় বললেন, 'আমি আধঘন্টার মধ্যেই আসছি।'

শ্যামবাজারে পৌঁছে কৃষ্ণকান্ত দেখলেন, বাড়ির সামনে বেশ ভিড় জমে গেছে। একটা পুলিশের জিপ আর একটা অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে। দুজন কনস্টেবল ভিড়কে ঠেকিয়ে রেখেছে। গাড়ি থেকে নেমে নিজের পরিচয় দিয়ে একরকম ছুটেই বাড়িতে ঢুকলেন কৃষ্ণকান্ত। যে অবস্থায় ছিলেন, সে অবস্থাতেই চলে এসেছেন—পোশাক পালটাবার কথা মনেও আসেনি। তাঁকে দেখে এগিয়ে এলেন একজন অফিসার। পরিচয় পেয়ে তাঁকে নিয়ে গেলেন চন্দ্রকান্তর শোবার ঘরে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় ঘুমিয়ে রয়েছেন—শুধু মুখটা একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে।

মুখে একটু যন্ত্রনার ছাপ কি? কৃষ্ণকান্ত বুঝতে পারলেন না। মৃত ভাইয়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, আটকে দিলেন অফিসার, 'উহু, লাশ ছোঁবেন না। ডাক্তার বলেছেন, এটা পয়জনিংয়ের কেসও হতে পারে।'

'পয়জনিং!' থমকে গেলেন কৃষ্ণকান্ত, 'বিষ? কে বিষ দেবে চন্দ্রকে? কেনই বা দেবে?'

—'সেটা তদন্তসাপেক্ষ। ওঁর মৃত্যুতে যার বা যাদের লাভ, তারাই বিষ দিতে পারে।'

'সে তো আমি আর সূর্য। কিন্তু আমরা বিষ দেব কী করে? সূর্য তো আগেই চলে গিয়েছিল। আমিও যখন যাই, চন্দ্রতো তখনও বেঁচে। ও-ই তো দরজা বন্ধ করল।' কৃষ্ণকান্ত অবিশ্বাসের সুরে বললেন।

'কেন, উনি দরজা বন্ধ করলেন কেন? ও কী করছিল?' ইনভেসটিগেটিং অফিসারের আঙুল বরাবর তাকিয়ে কৃষ্ণকান্ত জয়রামকে দেখতে পেলেন—একপাশে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছে। ওর মুখে ভয় আর দুঃখ মিলেমিশে একাকার।

'জয়রাম তো খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছিল। আমরাই ওকে বলেছিলাম শুয়ে পড়তে।' কৃষ্ণকান্ত বললেন, 'না, না, ওকে সন্দেহ করবেন না। ও আমাদের বহুদিনের বিশ্বাসী লোক। একরকম এ বাড়ির সদস্যই বলতে পারেন।' এগিয়ে গিয়ে জয়রামের কাঁধে হাত রেখে কৃষ্ণকান্ত সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তুমি ভয় পেয়ো না জয়রাম। তোমার ভয় কী? তুমি তো কিছু করনি।' এই সময় বজ্রাহতের মতো চেহারা নিয়ে ঢুকলেন সূর্যকান্ত। ঢুকেই এক ঝলক ছোড়দাকে দেখে বড়দার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল, 'এ কী হল বড়দা! কাল রাতেও তো গত গল্প করলুম....আর আজ—'

তাঁকেও পুলিশের জেরার মুখোমুখি হতে হল। তবে, গত রাতে আগে চলে যাওয়ার সুবাদে ছাড়া পেয়ে গেলেন বেশ তাড়াতাড়ি। সূর্যকান্তও জয়রামকে সন্দেহের কোনো কারণ দেখলেন না।

কৃষ্ণকান্ত অফিসারকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, আপনারা খুনের ওপর এত জোর দিচ্ছেন কেন? এটা তো সিম্পল হার্ট অ্যাটাকও হতে পারে। আপনিই তো বললেন, ডাক্তারও তাই বলেছেন। তা হলে আর কাটা ছেঁড়ার মধ্যে কেন যাবেন? আমাদের প্রিয় ভাইয়ের শরীর এভাবে কাটাকুটি হবে, ভাবতেই পারছি না। তাছাড়া আমাদের ফ্যামিলির একটা প্রেস্টিজও তো আছে।'

সূর্যকান্ত-র বক্তব্যও একই। ছোড়দাকে কেউ কেন খুন করবে? তারা সকলেই তো স্বচ্ছল কোনো মন কষাকষিও ছিল না। গত রাতেই তো তারা একসঙ্গে হৈ হুল্লোড় করেছে।

অফিসার বললেন, 'আমি নাচার। ডাক্তার যখন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তখন পোস্ট মর্টেম হবেই। আমরা এই ঘর এখন সীল করে দিচ্ছি। মৃত্যু যদি অস্বাভাবিক প্রমাণিত হয়, তাহলে এই ঘরের জিনিসপত্রের ফরেনসিক টেস্ট হবে। আপনারা এখন যেতে পারেন, তবে শহর ছেড়ে যাবেন না। প্রয়োজনে থানায় ডেকে পাঠানো হতে পারে। আর, পোস্ট মর্টেম হয়ে গেলে লাশ আপনারা পেয়ে যাবেন।'

মৃতদেহের ছবি টবি তোলা হয়ে যাবার পর ঘরটা সীল করে অফিসার দেহটা পোস্ট মর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। কৃষ্ণকান্ত আর সূর্যকান্ত-র সঙ্গে জয়রামও কাঁদতে লাগল সশব্দে। অফিসার তার দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বললেন, 'শোনো, তুমি পাড়া ছেড়ে এক পা-ও নড়বে না। ডেথ যদি ন্যাচারাল হয়, তাহলে তুমি বেঁচে গেলে। আর যদি বিষ পাওয়া যায়, তাহলে তোমার হাতে হাতকড়া পড়বে, মনে রেখো।'

তিনদিন পর বউবাজার থানায় ডাক পড়ল দু-ভাইয়ের। ও.সি.র ঘরে ঢুকে দেখলেন সেই অফিসারও সেখানে হাজির। ওঁদের বসতে বলে একটা ফাইল খুলে ও.সি. বললেন, 'আমরা যা অনুমান করেছিলাম, তাই; চন্দ্রকান্তবাবুকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল—স্ট্রিকনিন। স্ট্রিকনিনের লক্ষণ অনেকটা হার্ট অ্যাটাকের মতো। জয়রামকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। বাড়ির বেশ কিছু জিনিস আমরা ফরেনসিক টেস্টের জন্য পাঠিয়েছি। আশা করছি, এক সপ্তাহের মধ্যেই রির্পোট পেয়ে যাব।'

কৃষ্ণকান্ত বললেন, 'শেষ পর্যন্ত জয়রাম!'

সূর্যকান্ত বললেন, 'কিন্তু কেন?'

ও.সি. বললেন, 'মোটিভটাই তো জানতে হবে। বাড়িতেও তো অনেক সোনাদানা থাকত, তাই না? তার লোভেই হয়ত—'। তারপর সেই ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ততক্ষণ একটু কড়া ডোজে জিজ্ঞাসাবাদ চালাও দাস। ফরেনসিক রিপোর্টের আগেই হয়তও কনফেস করবে। দেখে তো হার্ড-কোর ক্রিমিনাল মনে হয় না।'

'হয়তো স্যার কম্পালশনে করে ফেলেছে।' ইনসপেকটর দাস বললেন, 'এমনও হতে পারে, বহুদিন ধরেই টাকাপয়সা গয়নাগাটি সরাচ্ছিল, ধরা পড়ে গিয়ে এই চরম পন্থা নিয়েছে।'

দু-ভাইয়েরই বিশ্বাস হচ্ছিল না জয়রাম এমন করতে পারে। প্রায় চল্লিশ বছর ধরেও ওঁদের বাড়িতে আছে। সে কথা ওঁরা জানালেনও ও. সি.-কে। তিনি ওঁদের কথায় তেমন গুরুত্ব দিলেন বলে মনে হল না।

সাত-দিন পর।

আবার থানা থেকে ডাক পড়ল। এবার দেখলেন, অন্য একজন ভদ্রলোকও আছেন। তাঁর হাতে একটা ব্রিফকেস।

ওঁরা বসতে ও.সি. বললেন, ''আপনাদের এই জয়রামের তো পোয়া বারো মশাই! এই যে এঁকে দেখছেন, ইনি আপনাদের ভাইয়ের সলিসিটার।

চন্দ্রকান্তবাবু উইল করেছিলেন, আপনারা জানতেন?'

'উইল!' দু-জনের গলাতেই বিস্ময়, 'ওর এই বয়সে উইল করার কথা মনে এল কেন?'

'হয়ত উনি কোনো বিপদের আশংকা করেছিলেন।' ইনসপেকটর দাস বললেন, 'জানেন, উনি ওনার সমস্ত সম্পত্তি কাকে দিয়ে গেছেন?'

'কাকে?'

'জয়রামকে।'

ঘরে বাজ পড়লেও এত চমকাতেন না দু-ভাই।

'আরো আছে' দাস বলে চললেন, 'ফরেনসিক রিপোর্টও এসে গেছে। চন্দ্রবাবুর জলের গ্লাসে স্ট্রিকনিন পাওয়া গেছে।'

'জয়রামই তো রোজ শোবার আগে চন্দ্রকে জল দিত' কৃষ্ণকান্ত বলে উঠলেন, 'সেদিনও জলটা রেখে তবেও শুতে গিয়েছিল। এত লোভ ছিল ওর মনে!'

'ঠিক বলেছেন। লোভ আর পাপ চাপা দেবার চেষ্টাই এই খুনের মোটিভ।'

ইনসপেকটর দাস বললেন, 'দেড় কোটি টাকা আত্মসাৎ করা, সম্পত্তির বখরা আর চোরাই সোনার কারবারের সাক্ষী লোপ।'

'মানে?' চমকে উঠলেন কৃষ্ণকান্ত।

সূর্যকান্ত কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে রয়েছেন।

'মানে অতি প্রাঞ্জল কৃষ্ণকান্তবাবু', দাস একবার ও.সি.-র দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'আপনি সল্ট লেকের বাড়ির করার সময় চন্দ্রকান্তবাবুর থেকে ওই টাকা ধার হিসাবে নিয়েছিলেন। যদিও আসলে আপনি তা লাগিয়েছিলেন আপনার চোরাই সোনার ব্যবসায়। চন্দ্রকান্তবাবুকেও এতে জড়াতে চেয়েছিলেন আপনি। উনি রাজি হননি। তবে, হ্যান্ডনোট লিখিয়ে বাড়ি তৈরির জন্য টাকাটা এক বছরের কড়ারে উনি দিয়েছিলেন। সেই হ্যান্ডনোট ওঁর সলিসিটারের কাছে গচ্ছিত আছে। তাছাড়া আপনার সই করার মুহূর্তটুকুও চন্দ্রকান্তবাবুর ক্যামেরা ফোনে ধরা আছে। সেই টাকা ফেরৎ চাইছিলেন উনি বেশ কিছুদিন ধরে। টাকা ফেরৎ দেবার কোনো ইচ্ছেই আপনার ছিল না। সেটা বুঝতে পেরে উনি আপনাকে ভয় দেখান, আপনার বেআইনি ব্যবসার কথা পুলিশকে বলে দেবেন। তখনই আপনি সিদ্ধান্ত নেন ওঁকে সরিয়ে দেবার। ওঁর পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন উদ্‌যাপন করার প্রস্তাবও কিন্তু আপনারই। সেইদিন সূর্যকান্তবাবুরা চলে যাবার পর আপনিই জয়রামকে শুয়ে পড়ার কথা বলেন। সুযোগ বার করে গ্লাসে স্ট্রিকনিন মিশিয়ে দেওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি চলে যান এরপর। জানতেন, বিষের ব্যাপারটা ধরা পড়লেও, সন্দেহটা জয়রামের ওপরেই পড়বে। বেশ নিখুঁত পরিকল্পনাই করেছিলেন। অনেকটা সফলও হয়েছিলেন। আমরা আপনার চালিত পথেই চলেছিলাম। কিন্তু, আপনার সব প্ল্যান ভেস্তে গেল তিনটে কারণে। আমরা জেরা করে বুঝতে পারছিলাম, জয়রাম নেহাৎই একজন নিরীহ মানুষ। তখন আমাদের সন্দেহ চালিত হল আপনাদের দু-জনের দিকে। কারণ, জয়রামের মতো একজন অশিক্ষিত মানুষের পক্ষে খোঁজখবর করে স্ট্রিকনিন জোগাড় করা এক রকম অসম্ভব। আপনাদের দু-জনের পক্ষেই সেটা সম্ভব। তবে, সূর্যকান্তবাবুর ওপর থেকে সন্দেহের তীর সরিয়ে দিতে আর আপনাকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করল আপনার একটা মস্ত বড় ভুল।'

ইনসপেকটর দাস একটু থামতেই সূর্যকান্ত ব্যগ্রভাবে জিগ্যেস করলেন, 'কী সেটা?'

ইনসপেকটর দাস একটু হেসে বললেন, 'ব্যাপারটা আমার মাথায় সে ভাবে প্রথমে আসেইনি, একটু খটকা লেগেছিল মাত্র। আমি যখন ওঁকে ফোন করি, বলেছিলাম, ওঁর ভাই রাত একটায় মারা গেছেন। আমি বলিনি আমি কোথা থেকে ফোন করছি। আমি এও বলিনি ওঁর কোন ভাই মারা গেছেন। অথচ উত্তরে উনি বললেন, তা কী করে হয়, আগের রাত এগারোটা পর্যন্ত উনি ''চন্দ্র''-র সঙ্গে গল্প করেছেন। উনি এও ইঙ্গিত দেন যে, মৃত্যুর কারণ হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। অর্থাৎ, উনি জানতেন, কে মারা গেছেন এবং আপাতদৃষ্টিতে মৃত্যুর কারণ কী মনে হতে পারে।' একটু থেমে দাস আবার বললেন, 'বিষ উনি কোথা থেকে জোগাড় করেছিলেন, সেটা বার করতে আমাদের খুব একটা অসুবিধে হবে না, কী বলেন, কৃষ্ণকান্তবাবু?'

কৃষ্ণকান্ত মাথা নীচু করে বিড়বিড় করলেন, 'লোভে পাপ, পাপে.....'

সূর্যকান্ত তখন বড়দার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সেই দৃষ্টিতে অপার বিস্ময় আর ঘৃণা ঝরে পড়ছে।

ছবি: লেখক

শব্দছক—৩

অরুণেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ফেলুদা শব্দছক

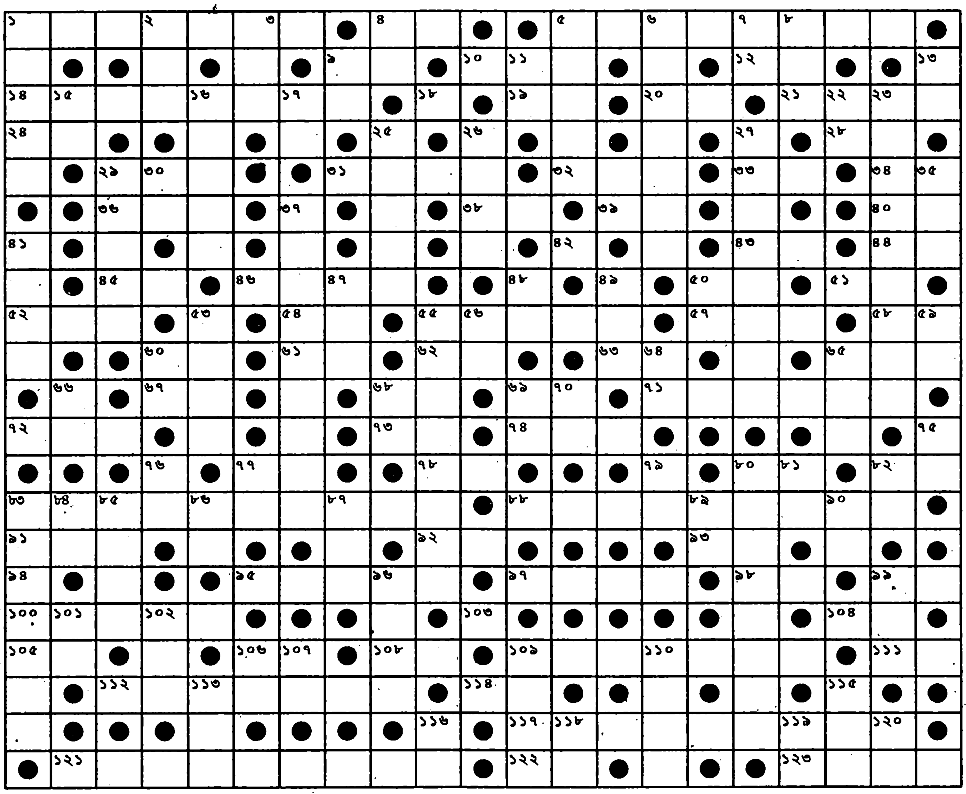

এই শব্দছকের সব সূত্রই জড়িয়ে আছে ফেলুদার নানান কাহিনির সঙ্গে।
উত্তর পাঠাও ৩১শে মার্চ, ২০০৮ এর মধ্যে।

ঃ বিশেষ উপহার ঃ
একজন সফল উত্তরদাতা পাবে এক দারুন উপহার।
অরুনেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা "পরশ মাণিক"।

পূর্ণাঙ্গ সব ফেলু কাহিনির সম্পূর্ণ/আংশিক নাম লুকিয়ে আছে এই শব্দছকে

পাশাপাশি—(১) এই 'মামলা'র শুরুতেই শার্লক হোমসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ফেলুদা। (৪) ত্রিকুটা দুর্গ নিয়ে ফেলুকাহিনীর শেষাংশ। (৫) 'সন্দেশ'-সম্পাদক পরিচালিত বড়পর্দায় প্রথম ফেলুচিত্র। (৯) নকশা। (১০) দস্তানা। (১২) অ্যালকালি। (১৪) ফেলুদার এই শেষ গল্পে সত্যজিৎ রায় তাঁর 'অভিযান' ছবিটার উল্লেখ করেছেন। (১৯) শত্রু। (২০) অবগত হওয়া। (২১) ভামের। (২৪) সিঞ্চন। (২৮) দেহ। (২৯) সিঁথির গয়না। (৩১) জটায়ুর লেখা কারাকোরামের গল্প নিয়ে পুলক ঘোষাল এখানেই জমজমাট ছবি করতে এসেছিলেন। (৩২) গাছের রস থেকে তৈরি। (৩৩) বিশ্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কবির ডাকনাম। (৩৪) হালকা। (৩৬) নট। (৩৮) ব্যাটারির মশাল। (৩৯) বলো। (৪০) বিলম্ব। (৪৩) চোখ। (৪৪) নদী এবং সাগরে ভাসন্ত পিপে। (৪৫) দাগ। (৪৬) অপরিবাহী। (৫০) নাক। (৫১) নেতৃত্বপ্রদানকারী ব্যক্তি। (৫২) স্থানীয় উচ্চারণে মুসম্বি জাতের একটি লেবু। (৫৪) মুনাফা। (৫৫) সেনহাটিতে ঘনিয়ে উঠেছে এই রহস্য। (৫৭) প্রাচীন ইহুদিদের ভাষায় সরল বানান। (৫৮) বিশাল এক কাল্পনিক পাখি। (৬০) বহুব্যবহৃত আনাজ। (৬১) স্বাদ। (৬২) সীতার যমজ পুত্রের অন্যতম। (৬৩) মা লক্ষ্মীর একটি নাম। (৬৫) মুহূর্ত। (৬৬) চরণ। (৬৭) গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিনী প্রখ্যাতা এক বাঙালি নারী। (৬৮) ভীম এই রাক্ষসকে মেরেছিল। (৬৯) লক্ষ। (৭১) এই রহস্যে জড়িয়ে আছেন সুনীল তরফদার। (৭২) 'সুন্দরবন' বল্লেই যার কথা মনে হয়, তার ইংরেজি নামের প্রথম অংশ। (৭৩) 'পায়ে ধরে-/রা নাহি দেয় রাধা'—রবীন্দ্রনাথ। (৭৪) ফেলুদার কলেজের বন্ধু ডাঃ বিকাশ দত্তর শহরে এসে হাজির হয় ফেলু অ্যান্ড কোং। (৭৭) একটি পদবি। (৭৮) পায়ের গয়না। (৮০) রাজা। (৮২) জগৎ। (৮৩) ফেলুদা এই প্রথম তার ভিজিটিং কার্ড ছাপায়। (৮৮) পানিহাটির শঙ্করপ্রসাদ চৌধুরী এখানে ফেলুদার মক্কেল। (৯১) রক্তিমা। (৯২) ঘোড়া। (৯৩) সমান দুই রাশির গুণফল। (৯৪) সর্বনাম। (৯৫) ১৯৭২ সালে মাত্র ১১ দিনে এই গল্পটি লিখেছিলেন সত্যজিৎ রায়। (৯৭) মস্তকহীনা এই দেবীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক ফেলুকাহিনি। (৯৮) অবলম্বন। (৯৯) গুম্ফ। (১০০) সত্যজিৎ রায় প্রথমে যে গল্পের নাম দিয়েছিলেন 'কেদারদা বদ্রিদা আর ফেলুদা', সেই গল্পের নতুন নামের শেষাংশ। (১০৪) দারুণ। (১০৬) আটার আঠা। (১০৬) অবসাদগ্রস্ত। (১০৮) সত্যজিৎ রায়ের ফেলু চরিত্রাভিনেতার ডাকনাম। (১০৯) দ্বিতীয় ফেলুকাহিনী। (১১১) আখ। (১১২) সন্দীপ রায়ের তোলা এই ফেলু-গল্পের দূরদর্শনচিত্ররূপে দুই প্রধান চরিত্রে ছিলেন শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। (১১৪) পাঠানদের কথ্য ভাষা। (১১৭) ১৯৭৫ সালে মাত্র দুদিনে লেখা এই গল্পটির প্রথম নাম ছিল 'তোতা রহস্য'। (১২১) এই গল্পেই ফেলুদার প্রথম আত্মপ্রকাশ। (১২২) কাঠের শত্রু এক ধরনের পোকা। (১২৩) নানাবিধ।

উপর-নিচ—(১) ফেলুদার এই গল্পের শুরুতেই আছে মৃত্যুঞ্জয় সোমের নাম। (২) গবেষণালব্ধ। (৩) 'পৃথিবী-বশ।'—দাদাঠাকুর। (৪) 'বড়দিন' বললেই এর কথা মনে হয়। (৫) এখানকার 'খুন'-এর কিনারা হয়েছে সন্দীপ রায়ের এক দূরদর্শনচিত্রে। (৬) সূর্যকুমারের কেরামতি নিয়ে ফেলুদার গল্প। (৭) বাঁচানো, উদ্ধার করা। (৮) মুসলিম মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্র। (৯) চিত্র। (১১) আগে সোনা-রূপা মাপা হতো এই এককে। (১৩) তালু, খাজনা। (১৪) কথা, ক্রিয়েন্দ্রিয়। (১৬) বিশ্বখ্যাত এক ব্যক্তির চিঠি নিয়েই এই ফেলুকাহিনি। (১৭) 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর ছোট্ট ছেলেটি। (১৮) আকাশ। (২২) '-মাটি, মাটি-।' -শ্রীরামকৃষ্ণ। (২৩) এই ফেলুকাহিনিতে আনুবিসকে নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। (২৫) ইচ্ছানুযায়ী। (২৬) এখানে ফেলু-তোপসের সঙ্গে বিমানে সহযাত্রী ছিলেন শশধর বোস। (২৭) এই গল্পেই জানা যায় জটায়ুর গাড়ি কেনার কথা। (২৯) এঁর আঁকা একটা ছবি নিয়েই লেখা গল্প অবলম্বনে তৈরি ছবিটাই বড়পর্দায় সন্দীপ রায়ের দ্বিতীয় ফেলুচিত্র হতে পারত। (৩০) ষড়স্বাদের প্রথম রস। (৩৫) 'ঘুরে'র সাধুরূপ। (৩৭) এই গল্পে ফেলুদার সঙ্গে ট্রেনে সহযাত্রী ছিলেন হেক্টর জয়ন্ত বিশ্বাস। (৪১) যে জায়গাকে ঘিরে এই ফেলুকাহিনি, তার শেষার্ধে আছে মধ্যপ্রদেশের একটি জায়গার নাম। (৪২) —অক্ষর গোমাংস। (৪৭) আনন্দ। (৪৮) সত্যজিৎসৃষ্ট বিখ্যাত যুদ্ধবিরোধী ছবির অন্যতম প্রধান চরিত্র। (৪৯) এই পেশা আইনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। (৫০) 'বিনা যুদ্ধে— দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।'—মহাভারত। (৫৩) ফেলুদার যে গল্পে শশী পাল খুন হন, তার শেষাংশ। (৫৫) এই গল্পের শুরুতেই ফেলুদা 'মহাভারত' পড়ছে। (৫৬) বটের পাখি। (৫৯) হ্রাস পাওয়া। (৬০) এর থেকে চিনি হয়। (৬৪) এক ধরনের কচু। (৬৫) ঢেউ। (৬৬) পদে। (৬৮) উপবেশন করা। (৬৯) 'জটায়ু'-র নামের প্রথমাংশ। (৭০) অংশ। (৭৫) সকল। (৭৬) সত্যজিৎ রায় ইউনিটের ব্যবস্থাপকের নামের আদ্যাক্ষর। (৭৭) মহিলা। (৭৯) সংক্রান্তি। (৮০) এই ফেলুকাহিনিতে আছেন এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারক সিদ্ধেশ্বর মল্লিক। (৮১) পান। (৮২) মার্জিতারুচিসম্পন্না মহিলা। (৮৩) ইলোরায় ঘটে যাওয়া ফেলুকাহিনি। (৮৪) 'গোলাপ গালের-'—নজরুল। (৮৫) রাধারমণবাবুর নামেই লুকনো এই ফেলুকাহিনির সূত্র। (৮৬) প্রাচুর্য। (৮৭) গোপনে অপসারণ। (৮৯) শব্দ। (৯০) প্রধান। (৯৬) এখানে জটায়ুকে নিয়ে ফেলুদার লেখা একটি লিমেরিক আছে। (৯৯) এই 'পুর'-এর জমিদারবংশের বংশধর শ্যামলাল মল্লিক। (১০১) ধাত্রীর চলিতরূপ। (১০২) নৃত্য। (১০৩) হতভম্ব। (১০৬) এই মরুভূমিতেই আছে ত্রিকুটা দুর্গ। (১০৭) পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় 'কে?' (১০৯) বহুদিন ধরে বাড়িতে থাকা অনিষ্টকারী লোক। (১১০) —ছুট। (১১৩) '—মাঝে অসীম তুমি'—রবীন্দ্রনাথ। (১১৫) পদবিবিশেষ। (১১৬) সোনালি / রূপোলি তার বা পাতে মোড়া সুতো। (১১৮) যুদ্ধ। (১১৯) বাড়ি। (১২০) অবতরণ করা।

আমার কল্পনায় আদর্শ মেয়ে গোয়েন্দা হলেন লীলাদি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আমি ছোটবেলা থেকেই ছিলাম গোয়েন্দা গল্পের পোকা। বাংলা ইংরেজি দু-ধরনের গোয়েন্দা গল্পই আমি পড়তাম। আনন্দবাজারে ঢোকার পর আমি দুটো আগাথা ক্রিস্টি অনুবাদ করেছিলাম। বই দুটি ছিল যথাক্রমে Big Four আর Towards Zero, বাংলায় এদের নাম দিয়েছিলাম চতুরঙ্গ ও পঞ্চমাঙ্ক। গোয়েন্দা গল্পে আমার বিরাট আসক্তি দেখে আমার বন্ধু রমাপদ চৌধুরী আনন্দবাজারে গোয়েন্দা গল্প লেখার জন্য আমাকে বার বার প্ররোচিত করতে থাকেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি আমি গোয়েন্দা গল্প লেখা শুরু করি। পর পর কয়েকটা গল্প লিখলেও তখনো কোনও নির্দিষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র ছিল না। হঠাৎ একটি গল্পে চারু ভাদুড়ীর চরিত্রটি নিয়ে আসি। তখনকার গোয়েন্দা গল্পগুলো বরুণের (সেনগুপ্ত) খুব ভালো লেগেছিল। ও-ই আমাকে বর্তমানে আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধে গোয়েন্দা উপন্যাস লিখতে বলে। আমার প্রথম উপন্যাস যা বর্তমানের রবিবাসরীয়তে বেরিয়েছিল—'মুকুন্দপুরের মনসা'। প্রায় একই সময়ে লিখেছিলাম 'ভোর রাতের আর্তনাদ' নামে আরেকটি উপন্যাস—পরে যার নাম বদলে হয় 'শ্যামনিবাস রহস্য'। তারপরে আমি প্রায় সতেরোটি গোয়েন্দা উপন্যাস লিখেছি, তারমধ্যে সবগুলো অবশ্যই ছোটোদের গল্প নয়। তবে ভুতুড়ে ফুটবল ও মিসেস তালুকদারের—আংটি' ছোটোদের অবশ্যই পড়া উচিৎ।

আমার প্রিয় গোয়েন্দা হলেন ফাদার ব্রাউন। চেস্টারটনের ডিটেক্‌শন পদ্ধতি এবং ভাষার ব্যবহার আমার খুব পছন্দ। বিশেষত লন্ডন শহরের বিভিন্ন সন্ধ্যার বর্ণনা খুবই সুন্দর। চেস্টারটনের গোয়েন্দা গল্প আমি বাংলায় অনুবাদ করার চেষ্টা করিনি, কারণ ওটাকে বাংলা পরিবেশে পাল্টানো খুবই কঠিন। তবে 'The Club of quertrade' বইটি 'আজব জীবিকা' নামে অনুবাদ করেছি। বাংলায় ফেলুদা, ব্যোমকেশ দুইই আমার খুব প্রিয়। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখাও আমার যথেষ্ট ভালো লাগে। আমার প্রিয় গোয়েন্দা ছবি হলো 'Death on the night'। ফেলুদার সব ছবিগুলোই আমার কমবেশি প্রিয়। আমার নিজের লেখা প্রিয় গোয়েন্দা উপন্যাস হল 'বিষাণগড়ের সোনা'। প্রথমে এটি লিখেছিলাম ছোটোগল্প হিসেবে। ওটাতে একটি জমকালো রাজবাড়ির বর্ণনা আছে যা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত। আমি প্রায় একমাস ময়ূরভঞ্জ রাজবাড়িতে কাটিয়েছি। সদানন্দবাবুর চরিত্রটি আমার দেখা একজনের আদলে। যিনি সত্যি সত্যিই ওইরকম 'করিচি', 'খেয়েচি' কথাগুলো হরদম ব্যবহার করতেন— ছিলেন নির্বিরোধী, ভীতু স্বভাবের মানুষ।

স্টিফেন লিককের একটা ধারণার সঙ্গে আমি একমত, যে গোয়েন্দা অতিরিক্ত চালাক হলে আমাদের খানিকটা বিরক্তি লাগে। সবজান্তা বেশি বুদ্ধিমানকে কে আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে। সেইজন্যই একটা সাধাসিধে বোকাসোকা ভালোমানুষ চরিত্রের সৃষ্টি করা হয়। এতে কিছুটা সামঞ্জস্যও আসে। সুন্দরবাবু, অজিত, লালমোহনবাবু, সদানন্দবাবু সবই একগোত্রের চরিত্র। আমার গল্পগুলি ছবি হবে এটা আমি মোটেই ভাবিনি। তবে মাণিকদা বেঁচে থাকলে খুব সম্ভবতঃ ভাবতাম। মেয়ে গোয়েন্দা ব্যাপারটা আমার বিশেষ পছন্দের নয় তবে একটা মজার কথা মনে হল। মেয়ে গোয়েন্দা সৃষ্টি করলে অবশ্যই আদর্শ করতাম লীলাদিকে। যেমন ডাকাবুকো তেমনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তেমন অসামান্য রসবোধ। সব মিলিয়ে ইনি হতেন সত্যিই ব্যতিক্রম।

অনুলিখন : সুগত রায়

গোয়েন্দা গল্প লেখা আমার কাছে একটা কঠিন সিঁড়িভাঙা অঙ্ককষা

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

আমার প্রথম গোয়েন্দা গল্পটাই বড়দের জন্য লেখা। রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে তখন নিয়মিত ধারাবাহিক গোয়েন্দা কাহিনি বেরোত। সেই সময়ে রমাপদবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করেন লিখতে পারবো কি না! সাহসে বুক ঠুকে আমি চটপট রাজি হয়ে যাই। সেই লেখাটাই হল 'পালাবার পথ নেই'। মোটামুটি সমাদৃতও হল লেখাটা। মেয়ে গোয়েন্দা এনেছিলাম খানিকটা ইচ্ছে করেই। মেয়েরা এতসব দায়িত্বশীল কাজ করতে পারেন—রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারেন, কোনো বড় সংস্থা চালাতে পারেন আর গোয়েন্দা হতে পারবেন না! তার আগেই ছোটোদের জন্য একটা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছিলাম 'ভাঙা ডানার পাখি'—তাতে কিছু জরুরী তথ্য দেবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু উপন্যাসটি বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেনি। তখনই আমি ছোটোদের জন্য গোয়েন্দা উপন্যাস লেখার কথা ভাবি। এখানেও আমার গোয়েন্দা প্রজ্ঞাপারমিতা ওরফে মিতিন— যে এখানে ছোটোদের কাছে পরিচিত মিতিন মাসি হিসেবে, যার সহকারী হল তারই বোনঝি টুপুর। ছোটোদের গোয়েন্দা উপন্যাসে আমি ইচ্ছে করেই বেড়ানোর ব্যাপারটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিই। এর ফাঁকে ফাঁকে আমি কিছু জরুরী তথ্য দেওয়ারও চেষ্টা করি। এর প্রেরণা আমি পেয়েছি অবশ্যই সত্যজিৎবাবুর লেখাগুলো থেকে। ছোটোদের লেখাগুলোতে আমি খুনোখুনি, রক্তারক্তি, জটিলতা কম রাখি।

গোয়েন্দা কাহিনী লিখতে আমার দিব্যি লাগে। অনেকটা জটিল অঙ্ক কষার মজার মতো। একটা মজাও আছে— শেষটা আগেই ভেবে নিতে হয়। এমনিতে গোয়েন্দাকাহিনীর আমি একজন আগ্রহী পাঠকও। শার্লক হোম্স্, ব্যোমকেশ, ফেলুদা—সকলেই আমার প্রিয় চরিত্র। হিচককের ছবিগুলোও আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। আমি গোয়েন্দা গল্পগুলিকে নিছক গোয়েন্দা কাহিনী হিসেবে দেখি না। সেগুলো কোনো সমাজ বিচ্ছিন্ন আজগুবি লেখা নয়। আমি মনে করি গোয়েন্দা কাহিনী লেখকের অস্ত্র হল তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, details-এর প্রতি নজর ও ব্যাপক পড়াশুনো। বড়দের লেখার মধ্যে ইচ্ছে করেই আমি টুপুরকে আনি না—এবং সেগুলি মোটামুটি কোলকাতা কেন্দ্রিক। গোয়েন্দা কাহিনী লেখা আমার কাছে একটি সুন্দর বিনোদন, যদিও তাতে কখনও সামাজিক সমস্যা ঢুকে পড়তে পারে। কে জানে, কখনো হয়ত এই রিজানুরের ঘটনাও আমার লেখায় অন্যভাবে স্থান পেতে পারে।

অনুলিখন : সুগত রায়

ইন্দ্রনাথ রুদ্র হলেন অনেকটা আমারই প্রতিচ্ছবি

অদ্রীশ বর্ধন

ছোটোবেলা থেকেই আমি ছিলাম বইয়ের পোকা। সিরিয়াস বই তো পড়তামই—তাছাড়া গোয়েন্দা গল্পেরও ছিলাম পোকা, বাড়িতেই গড়ে উঠেছিল একটা পারিবারিক গ্রন্থাগার। প্রথম কৈশোরে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রবার্ট ব্লেক পড়ে বেশ ভালো লাগত—তবে দস্যু মোহন কোনোদিনই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। তবে বিশেষভাবে আকর্ষণ করত দেবসাহিত্য কুটীরের কাঞ্চনজঙ্ঘা ও পিরামিড সিরিজের বইগুলি। সেই প্রভাবেই বোধহয় একটু বড় হতেই লিখে ফেলি একটি ভূতের গল্প—'পোড়ো বাড়ির খাঁড়া'। তারপর ক্রমশ গোয়েন্দা গল্প লেখায় মন দিই। মূলত রোমাঞ্চ পত্রিকাতেই লিখতাম এই গল্পগুলো। সেই সময়ের লেখা 'ব্রোঞ্জের গণেশ' গল্পটি বেশ উত্‌রেছিল। গল্পটি এখনও পড়লে বেশ ভালো লাগে। সেই সময়ে আমি সৃষ্টি করি ইন্দ্রনাথ রুদ্র চরিত্রটি। তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন কবি স্বভাবের মানুষ, ধুতি পাঞ্জাবী পরেন, চুরুটসেবী—আদ্যোপান্ত বাঙালি চরিত্র—অনেকটা আমারই প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করতে চেয়েছি তার মাধ্যমে।

এই সময় থেকে গোয়েন্দা কাহিনী অনুবাদ শুরু করেছি নিয়মিতভাবে। আমার বিশ্বাস ভালো অনুবাদ আসলে মৌলিক সাহিত্যকে অনেকটাই পুষ্ট করে। অনুবাদ করার সময় অনেক ভিনদেশী গোয়েন্দা সাহিত্য পড়েছি আগ্রহ সহকারে। বিদেশী গোয়েন্দা সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষ প্রিয় কোনান ডয়েল এবং জি. কে. চেস্টারটন। বাংলায় প্রিয় গোয়েন্দা কিরীটি রায়, ফেলুদা, পরাশর বর্মা এবং অতি অবিশ্যি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী মশাই। প্রিয় গোয়েন্দা কাহিনী বাছাই করা শক্ত হলেও ভেবেচিন্তে মনে পড়ে দুটি উজ্জ্বল নাম : হাউন্ড অব বাস্কারভিল ও পথের কাঁটা। আর প্রিয় গোয়েন্দা ছবির ক্ষেত্রে হিচককের প্রায় যে-কোনো ছবি, মানিকদার চিড়িয়াখানা ও অর্ধশতাব্দী আগে তৈরি সেই সাড়া জাগানো গা ছমছমে জিঘাংষার কথা মনে পড়ে। কোনান ডয়েল, শরদিন্দুবাবু বা মানিকদা দীর্ঘদিন ধরে গোয়েন্দা সাহিত্যের চর্চা করলেও তা কখনই কুলীন সাহিত্যের সম্মান পায়নি। এই জন্যই আমি তথাকথিত সিরিয়াস সাহিত্য ছেড়ে গোয়েন্দা সাহিত্যেই মগ্ন থেকেছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব। একটি ভালো গোয়েন্দা বই অবশ্যই উৎকৃষ্ট সাহিত্যের নিদর্শন।

গোয়েন্দা সাহিত্যে আমার প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি দুইই আছে। আমার 'কাচের দরজা' বইটি সম্বন্ধে দেশ পত্রিকা মন্তব্য করেছিল, "রচনারীতির দিক দিয়ে শরদিন্দুর উত্তরসূরী"। এটা নিঃসন্দেহেই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। চেয়েছিলাম "শার্লক হোমস মিস্ট্রি ম্যাগাজিন" নামে এক অভিনব গোয়েন্দা পত্রিকা প্রকাশ করতে। সরকারী অনুমতি পেলেও নানা কারণে সেটা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। আর আমার "ভয়ঙ্কর" উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করার কথা ছিল মহানায়ক উত্তমকুমারের। প্রাথমিক কিছুটা কথাবার্তা এগোলেও ওঁর আকস্মিক মৃত্যুতে ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে যায়। ছবিটা হলে নিশ্চয়ই কিছুটা ব্যতিক্রমী চরিত্রের হতো। জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে এখন বারবার গুন গুন করি, কী পাইনি তার হিসেব মিলাতে।

অনুলিখন : সুগত রায়

———

প্রস্তুতি ছাড়াই লিখতে হয়েছিল প্রথম গোয়েন্দা উপন্যাস

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোটদের জন্য গোয়েন্দা গল্প লেখার তেমন কোনো পরিকল্পনা ছিল না। সেবার পুজোর আগে হঠাৎ এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে বাধ্য হয়েছিলাম প্রথম গোয়েন্দা কাহিনিটি লিখতে। কোনো প্রস্তুতি ছিল না, তাই সেই প্রথম গোয়েন্দা উপন্যাসটিতে এনিড ব্লাইটনের বেশ কিছুটা প্রভাব ছিল। অবশ্য আমি বহুদিন ধরেই এনিড ব্লাইটনের ভক্ত। ভায়োলেন্সকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে ছোটদের জন্য এত জমজমাট অ্যাডভেঞ্চার কাম গোয়েন্দা কাহিনি লেখায় ভদ্রমহিলার জুড়ি মেলা ভার। আমি যখন ছোটদের জন্য গোয়েন্দা কাহিনি লিখতে শুরু করলাম, সেই সময় বাংলায় ছোটদের গোয়েন্দা সাহিত্যে ভায়োলেন্স প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়েছে। আমার প্রথম গোয়েন্দা উপন্যাস "কেল্লা রহস্য" লেখার সময় মাথায় ছিল যাতে ভায়োলেন্স কোনোভাবেই না গ্রাস করে লেখাটিকে। প্রথম গল্পটি লেখার সময় সিরিজ তৈরির কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। কিন্তু পাঠকদের অনুরোধে পরের বছর আবার ফিরিয়ে আনতে হ'ল আমার খুদে গোয়েন্দা মিউ, মোয়া, বুয়া, বাবুদের এবং প্রতিবছর সেই পাঠকদের অনুরোধেই লিখে চলেছি ওদের নিয়ে একেকটি গোয়েন্দা উপন্যাস। তবে ইচ্ছে আছে আগামী বছর থেকে এই খুদে গোয়েন্দাদের নিয়ে আর কোনো উপন্যাস লিখব না। এই গোয়েন্দা কাহিনিগুলি লেখার সময় আমার মাথায় যাকে একটাই ভাবনা—ভায়োলেন্সকে বাদ দিয়ে মগজাস্ত্রকে সম্বল করে ছোটদের জন্য ছিমছাম গোয়েন্দা কাহিনী তৈরি করা। আমার গল্পের গোয়েন্দারা সকলেই ছোট ছেলে মেয়ে। এর কারণ একটাই। বাচ্চাদের কৌতূহল বেশী। প্রত্যেকটি বাচ্চার মধ্যেই একজন গোয়েন্দা লুকিয়ে থাকে। আমি এনিড ব্লাইটনের ভক্ত হলেও চরিত্রগুলি তৈরির সময় তাঁর সৃষ্ট কোনো চরিত্রের প্রভাব পড়েনি। মিউ, বাবু, মোমা, বুয়ারা আমার মেয়ে, ভাইপো আর তাদের বন্ধু বান্ধবরা। আমার সৃষ্টি করা আরেকটি চরিত্র বিভূও বেশ কিছু রহস্যের সমাধান করেছে। বিভূ কিন্তু গোয়েন্দা নয়। সে একজন জার্নালিস্ট, আসলে বিভূর মধ্যে 'আমি'ই লুকিয়ে আছি। বিভূ হল একজন ইনভেস্টিগেটিং রিপোর্টার। আমার অল্প বয়সের বেশ কিছু ঘটনার (বিশেষ করে খেলার মাঠের) প্রভাব রয়েছে বিভূর নানান কাহিনিতে, এছাড়াও বড়দের জন্য রহস্য অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছে আমার আরো একটি চরিত্র—পুলিশ অফিসার রাঘব। রাঘবকে ছোটদের আসরে নিয়ে আসা যায় কিনা সেটা একবার ভেবে দেখতেই পারি। আমার প্রিয় গোয়েন্দা দুজন—ব্যোমকেশ বক্সী ও ফেলুদা। বাংলা গোয়েন্দা কাহিনির মধ্যে আমার প্রিয় সত্যজিৎ এবং শরদিন্দুর লেখা সবকটি গল্প এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বেশ কিছু লেখা।

অনুলিখন : সুগত রায়

শার্লক হোমস, ব্যোমকেশ বক্সী, ফেলু মিত্র—
তিন গোয়েন্দার সব গল্পই সেরা

অশোক দাশগুপ্ত

চারটে প্রশ্ন আমরা রেখেছিলাম সিদ্ধার্থ সেনের স্রষ্টা শ্রী অশোক দাশগুপ্তর কাছে।
(ক) কেন গোয়েন্দা গল্প লিখলেন?/প্রথম 'গোয়েন্দা গল্প' লেখার গল্প।
(খ) সিদ্ধার্থ সেন চরিত্রটিতে কি কোনো বাস্তব চরিত্রের ছায়া আছে?
(গ) আপনার প্রিয় গোয়েন্দা (বাংলা এবং ইংরিজি) কারা? কেন? প্রিয় গোয়েন্দা গল্প/উপন্যাস?
(ঘ) অনেকদিন আমরা সিদ্ধার্থ সেনকে পাচ্ছি না। কেন?

অশোকদা লিখেই দিয়েছেন তার উত্তর :

১। ক্রিয়েটিভ লেখক নই। পুজো সংখ্যায় এসে দু-একটা গল্প, যা তা, লিখি। খেলার গল্প। গোয়েন্দা গল্পও এসেছিল সেই সূত্রে। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য জানতে চাওয়া মানে, আমাকে লজ্জিত করা। আমার প্রথম গোয়েন্দা গল্প রচনায় সিদ্ধার্থ সেন ছিলেন না। ফুটবলে গড়াপেটা নিয়ে তখন তোলপাড় কলকাতা ময়দান। সেই নিয়ে গল্প বা 'উপন্যাস'। গোয়েন্দা তোপসে, ওর 'প্রথম কেস'। লালমোহনবাবু ছিলেন। ফেলুদা কাঠমাণ্ডু গিয়েছিলেন। কিন্তু তদন্তে সরাসরি নয়। পুজো সংখ্যা 'খেলা' প্রকাশিত হওয়ার পর সত্যজিৎ রায় ফোন করে বললেন, এটা উচিত হয়নি। তোপসে, জটায়ুকে রেখে অন্য কারও গল্প লেখা ঠিক নয়। বললাম, এর আগেও ওদের নিয়ে গল্প লিখেছেন কেউ কেউ। বললাম, অন্য ভাষাতেও এমন উদাহরণ আছে। সত্যজিৎ রায় এরপর একটা দীর্ঘ চিঠি দিলেন। আমি উত্তর দিলাম। কিন্তু তখনই ঠিক করে ফেললাম, আজকাল-এর মাস্টহেড যাঁর আঁকা, সেই বিশ্ববরেণ্য স্রষ্টার আপত্তি শিরোধার্য। ড. ক্ষেত্র গুপ্ত বললেন, নিজের গোয়েন্দা তৈরি করে নিন না! পরের বছর সিদ্ধার্থ সেন। সে-ও তো পুজো সংখ্যার চাপে, সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে। প্রথম লেখা—'আকাশ কোথায়'। লেগ স্পিনারের কথা। গোয়েন্দা কাহিনী উপলক্ষ মাত্র।

২। বাস্তব চরিত্র? শার্লক হোমস বা ব্যোমকেশ বক্সি বা ফেলু মিত্তির 'বাস্তব' নয়? পড়তে পড়তে ছাপ পড়বেই। খুচরো মিল লেখকের সঙ্গে। যথা, অবাক ধূমপান। সুযোগ পেলেই আলসেমি। যে-কোনও বিষয়ে ভাবতে গেলেই কাগজে কাটাকুটি খেলা। চারপাশে নানারকম মিষ্টি সম্পর্ক নিয়ে থাকা।

৩। কেন এবং কী বলতে সময় লাগবে। ইংরেজিতে নিঃসন্দেহে শার্লক হোমস। বাংলায় ব্যোমকেশ বক্সি ও ফেলু মিত্র। এই তিন গোয়েন্দার সব গল্পই সেরা। আগাথা ক্রিস্টি পড়তে বেশ, ছাপ রাখেননি। এক বন্ধু বলত, অযথা সৃষ্টি!

৪। সিদ্ধার্থ সেন এমন কোনও গোয়েন্দা চরিত্র নয়, এমন কেউ লেখেননি যে, কেন পাওয়া যাচ্ছে না বলে প্রশ্ন উঠতে পারে। কেন লজ্জা দেন?

———

লোনলি ইন্

স্যাপার

অনুবাদঃ সুভদ্রকুমার সেন

বিস্তীর্ণ প্রান্তর আর জংলাগাছের মধ্যে থেকে কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ছে। উত্তুরে হাওয়া তুষারপাতের আগাম খবর নিয়ে আসছে। থেকে থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ঠাণ্ডায় শরীরের হাড় পর্যন্ত কেঁপে যাচ্ছে। ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে আর ভাসমান কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে দূরের পাহাড়ের চূড়াগুলো এক একবার মুখ দেখিয়েই অন্ধকার আর কালো মেঘের ঘোমটা টেনে দিচ্ছে। বিশ্বচরাচর কে যেন অন্ধকারের এক কালো কম্বল দিয়ে ধীরে ধীরে মুড়ে দিচ্ছে।

'লোনলি ইন্'-এর একতলার একটা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে এক ব্যক্তি নিবিড় মনে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখন কিন্তু আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

সেই ঘরের ছাদের কালো হয়ে যাওয়া প্রাচীন কাঠের বরগা থেকে একটা আলো ঝুলছে। আলোটি লোকটির পিছনে। আলোটি জোরালো নয় ফলে সেই আলো জানালা দিয়ে বাইরে বেশি দূর অবধি যাচ্ছে না। সামনের রাস্তাটায় আলো আঁধারি তৈরি হয়েছে। এক এক সময় ঘন কুয়াশা যখন চারদিক থেকে ভেসে আসছিল তখন সেই ক্ষীণ আলোর আলোকরশ্মি কুয়াশার প্রাচীরে প্রতিবিম্বিত হয়ে ঘরের মধ্যেই প্রতিফলিত হচ্ছিল যেন।

ঠাণ্ডায় ওভার কোটের কলার তুলে, প্যান্টের মধ্যে হাত দুটো ঢুকিয়ে ঈষৎ সামনের দিকে তাকিয়ে লোকটি এতই নিবিষ্ট ও অচঞ্চল হয়ে বাইরে তাকিয়েছিল যে ঘরের দরজা খোলার শব্দ তার কানে গেল না।

'ওদের তো কোনও পাত্তা নেই।'

'নাহ্। ওদের টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। এই সাংঘাতিক কুয়াশার জন্যে সমস্ত আয়োজন পণ্ড হবে বলে মনে হচ্ছে।'

এতক্ষণে পর্যবেক্ষণকারী ঘরে প্রবিষ্ট আগন্তুকের দিকে ফিরল। আগন্তুক ফায়ার প্লেসের আগুন ঠিক করতে ব্যস্ত। আগন্তুকের পরণে সবুজ এপ্রন থেকে বোঝা যাচ্ছে সে এই ইন-এর কর্মচারী। আসলে এই লোকটিই

হোটেলের পোর্টার, বারম্যান এবং ম্যানেজার সবই। ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল।

'ব্যাপারটা খুবই খারাপ হবে', ম্যানেজার বললে। তবে পরিষ্কার ঝকঝকে রাত্রির চাইতে আজকের মতো রাতই আদর্শ। অবশ্য ওরা যদি আসে...।'

'ওরা অবশ্যই আসবে', পর্যবেক্ষণকারী রুক্ষভাবে বলে উঠল। তারপর ফায়ার প্লেসের দিকে দুপা এগিয়ে বললে, 'অন্যথা...'।

কথাটা সে শেষ করলে না। ম্যানেজার সামান্য কাঁধ ঝাঁকালে।

'এই হতচ্ছাড়া কুয়াশায় অবশ্যই আসবে একথা খুব জোর করে বলা যায় না।' ম্যানেজার বললে। 'এইরকম দুর্ভেদ্য কুয়াশায় যে কোনো গাড়ি যে কোনো সময়ে আটকে পড়তে পারে। আর তা হলে...'।

কথাটা শেষ না করে ম্যানেজার বারের দিকে এগিয়ে গেল।

'তুমি কী খাবে?'

একটা ডাব্‌ল্ হুইস্কি। তুমিও একটা নাও না। উহ্ কি পাণ্ডব বর্জিত দেশ রে বাবা।'

পর্যবেক্ষণকারী উৎকর্ণ হয়ে উঠল। ম্যানেজার যখন হুইস্কির পাত্র নিয়ে তার দিকে আসছিল তখন হঠাৎ পর্যবেক্ষণকারী জানালার দিকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল।

'ওটা কিসের শব্দ? নিশ্চয়ই ওটা গাড়ির শব্দ', পর্যবেক্ষণকারী উত্তেজিত কণ্ঠে বললে। ম্যানেজার তার পাশে এসে দাঁড়াল। দুজনে কান খাড়া করে প্রতীক্ষা করতে লাগল। বাতাসের চাপা 'শোঁ-শোঁ' শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

'গাড়ির দরজা বন্ধ করার মতো শব্দ হলো বলে মনে হল। তুমি শুনতে পাওনি?'

'না, আমি শুনিনি' ম্যানেজার বললে। 'আর তাছাড়া আমি তো ঐ দিকে ছিলুম। সে যাই হোক। ওরা হোটেল থেকে অতদূরে গাড়ি রাখবে কেন? যদি এতটা পথই ঠিক মতো চলে আসতে পারে, এই পথটুকুতে কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়।...নাও তোমার হুইস্কি।'

ওভারকোট পরা লোকটি এক চুমুকে হুইস্কির পাত্র শেষ করে টেবিলে নামিয়ে রেখে নিজের জায়গায় ফিরে গেল। ইতিমধ্যে ম্যানেজারের পাত্রও খালি হয়ে গেছে। সে পাত্রটা না রেখে পর্যবেক্ষণকারীর দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখের চাউনিতে অবিশ্বাস আর দুশ্চিন্তা ফুটে উঠছিল। সে এতই মনযোগের সঙ্গে তার সঙ্গীকে দেখছিল যে সামনের জানালার কাচের শার্সিতে তাকে যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল সে কথা তার মনেই ছিল না।

পর্যবেক্ষণকারী প্রথমটায় কোনও গুরুত্ব দেয়নি। তারপর পিছন ফিরে তাকিয়ে রূঢ় কণ্ঠে বললে, 'আমার দিকে কী দেখছ?'

ম্যানেজার কোনো কথা না বলে সরে গেল।

'তোমার কি ভয় হচ্ছে', ম্যানেজার জানতে চাইলে।

'বাজে বকো না। এত সহজে আমি ভয় পাই না। তবে এই কুয়াশার জন্যেই ভাবছি।'

'ওরা যদি নাই আসে তো তোমার কী বয়ে যাবে?'

'ডুবে যাব। অতলে তলিয়ে যাব। ...আর তোমার পাঁচশো পাউন্ড লোকসান হবে', পর্যবেক্ষণকারী বললে।

'তা আমি জানি। কিন্তু আমি ভাবছি বখরা কি ঠিক হল?...ধীরে মিঃ বেন্টন', পর্যবেক্ষণকারীর ক্রুদ্ধ, কুটিল মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে ম্যানেজার বলে চলল, ''মাথা গরম করে কোনও লাভ হবে না। আপনি তো এখানে উড়োপাখির মতো দু-ঘন্টার জন্যে এসেছেন আর তারপর ফুরুৎ করে উড়ে যাবেন। আমাকে কিন্তু এখানেই থাকতে হবে। এখানকার লোকেরা কথা চালাচালি করতে আর ঘোঁট পাকাতে ওস্তাদ। আমাকেই তো সব সামলাতে হবে।'

'কী নিয়ে ঘোঁট করবে শুনি?'

মিঃ বেন্টনের সেই রাগতভাব আর নেই। তিনি শান্তভাবেই প্রশ্নটা করলেন। 'আর তা ছাড়া এসব কথা নিয়ে তো সবরকম আলোচনাই হয়ে গিয়েছে।'

'হ্যাঁ, সব কথাই হয়ে গেছে ঠিকই। তবে তার মানে তো এই নয় যে নতুন করে আর কোনো আলোচনা হবে না! যা বলছিলুম, পাঁচশো পাউন্ড খুবই কম হচ্ছে।'

'কম হচ্ছে? এখন তোমার তাই মনে হচ্ছে বুঝি? কিন্তু এখন তো তুমি আর পেছতে পার না', মিঃ বেন্টন খেঁকিয়ে উঠল।

'আমি তো পিছিয়ে যাবার কথা বলিনি। আমি বলেছি, আমার মতে আমার ভাগে কম হচ্ছে। তুমি তো যাকে বলে গোটা রাজত্ব লাভ করতে যাচ্ছ।'

'একদম বাজে কথা বলো না', বেন্টনের ঝটতি জবাব, আর তা ছাড়া অনেক টাকাই খরচা হয়ে গেছে।

'সে তোমার ব্যাপার, তুমি বুঝবে।' ম্যানেজার ঈষৎ কাঁধ ঝাঁকাল। 'তুমি যদি কাউকে ঠকাও তো পুলিশও জেনে যাবে যে তুমি আরও কাউকে ঠকিয়েছ। আরও খুলে বললে, তুমি বেঁচে যাবে আর নিজে উপভোগ করবে। আর আমি এখানে বসে বসে একদিকে স্থানীয় লোকদের ধাক্কা আর অন্যদিকে পুলিশের জেরা সামলাব তা হবে না। না মিঃ বেন্টন, পাঁচশো পাউন্ডে এত ঝক্কি পোষাবে না, আমাকে হাজার পাউন্ড দিতে হবে।'

বেন্টনের ভাবগতিক দেখে মনে হল যে, সে ম্যানেজারকে দু-ঘা কষিয়েই দেবে। তার শরীরটা শক্ত

হয়ে উঠল। সরল হাতের পেশীগুলো ফুলে উঠল। হাত দুটো মুঠি পাকিয়ে গেছে। বেন্টন খেয়াল করলে ম্যানেজারের হাতে হুইস্কি ভর্তি বোতলের ছিপির দিকটা ধরা। সেও একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

বেন্টন নিজেকে সামলে নিলে।

'আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে তোমাকে প্রায়ই বেয়াড়া গুন্ডা মাতালদের সামলাতে হয়।'

তারপর জোর করে মুখে হাসি এনে মিটমাটের ভঙ্গীতে বললে, 'দেবো। আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা ঠিক হচ্ছে না।'

হুইস্কির বোতলটা যথাস্থানে রাখতে রাখতে ম্যানেজার বললে, 'আমি তো ঝগড়া করছি না।'

বেন্টন বললে, 'আমরা দুজনেই কিন্তু সমান ভাবে জড়িয়ে পড়েছি।'

'না। আমি এখনো পর্যন্ত কোনোভাবেই জড়াইনি। আর আমার শর্তে রাজি না হলে আমি এ ব্যাপারে নেই।'

বেন্টন উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললে, 'তোমার মুশকিল কী জানো? তুমি জীবনের সব কিছুই তাৎক্ষণিক ভাবে নাও। আমি এখন ভবিষ্যতের কথা বলিনি, তোমার অতীত জীবনের কথা বলেছি। আমি জানি যে দেনার দায়ে তোমার মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে আছে। আর এ-কথাও তুমি ভালো করেই জানো যে আমি চাইলে পেকিন্সকে দিয়ে তোমাকে বিপদে ফেলতে পারতুম। আর তা হলে আজ তুমি থাকতে কোথায়? তোমার পাওনাদারেরা তোমাকে ছিঁড়ে খেত।....এখন তোমার বোধোদয় হয়েছে তো?'

বেন্টন একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বলতে শুরু করলে।

'ঠান্ডা মাথায় আমার কথা শোনো। এতে আখেরে তোমার লাভই হবে। তুমি খুব ভালো করেই জানো যে আমি নির্বোধ লোককে সহ্য করতে পারি না। তোমাকে আমার কখনই বুদ্ধিহীন বলে মনে হয়নি। আমি যখন বললুম যে আমরা দুজনেই দুজনের ওপর নির্ভরশীল, তখন আমি আক্ষরিক অর্থেই সত্যি কথা বলেছি। তুমি সাহায্য না করলে আমি ডুবব, আমি না করলে তুমি। অর্থাৎ আমরা একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ না করলে দুজনের ভবিষ্যৎই অন্ধকার।'

নিজের জেদ বজায় রেখে ম্যানেজার বললে, 'হ্যাঁ এসবই ঠিক আছে। তবে ভাগাভাগিটা ঠিক মতো হচ্ছে না।'

বেন্টন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'বেশ, আমি তোমাকে আমার শেষ কথা বলছি। তুমি অতিরিক্ত যা চাইছ তার অর্ধেক দিতে পারি। তার বেশি একটি পেনিও নয়।'

'ঠিক আছে।' ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হলেও ম্যানেজার চুপ করে গেল। এটা তার ভালো করেই জানা আছে যে বেন্টনের সঙ্গে বেশি দর কষাকষি করা চলে না, আর তাতে ফল ভালো তো হবেই না, উল্টে খারাপ হবে। সবচেয়ে বড় কথা বেন্টনের কথায় যে যুক্তি আছে তা সে নিজেও জানে।

'সাড়ে সাতশো পাউণ্ড—তাই তো। সব কিন্তু এক পাউন্ডের নোটে—'।

'তোমার কি ধারণা তোমাকে আমি একটা চেক লিখে দেব! এরপর কী ভাবে কী করবে তোমার ব্যাপার। বুঝে বললে কোনো গোলমাল হবে না। তবে বড়লোকী করে তুমি যদি নোটের তাড়া যত্রতত্র দেখিয়ে বেড়াও তো বিপদে পড়বে। অনেকে অনেক কথা বলবে। শেষকালে কানাকানি হতে হতে সব জানাজানি হয়ে যাবে।'

'সে ভাবনা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

'ভালো কথা। আহ্ এখন অসময়ে আবার কারা জ্বালাতে এল।'

বাইরের রাস্তা থেকে বেশ উচ্চকণ্ঠে কথাবার্তা শোনা গেল। ঠিক, ঠিক হিউ। এখানে একটা হোটেল আছে।'

বেন্টন জিজ্ঞেস করলে, 'গলাটা কি চিনতে পারছ?'

মাথা নেড়ে ম্যানেজার বললে, 'নাহ্। চেনা লোক নয়।'

'ভুলে যাবে না যে আজ রাত্রে ইন্-এর একটা ঘরও খালি নেই। আজ রাত্রে এখানে অজানা অচেনা লোকের থাকাটা ঠিক নয়।'

দরজা খুলে গেল। চশমা পরা একটি যুবক ঘরে ঢুকল।

বেশ রসিকতার ঢঙেই যুবকটি বললে, 'শুভ সন্ধ্যা—যদি কিনা সামাজিক আচারের এই মিথ্যাটুকু মার্জনা করা যায়। সত্যি কথা বলতে গেলে এমন কুৎসিত, নারকীয় আবহাওয়া আমি কমই দেখেছি।'

এই কথা বলতে বলতে ওভারকোট ছেড়ে ফেলে যুবক বারের দিকে এগিয়ে গেল।

'মদিরা! এরকম পরিবেশে এ রকম আবহাওয়া শরীরকে চাঙ্গা করবার একমাত্র উপায়, মদিরা সেবন। আমার বন্ধুটি এসে এই কথাই বলবে।'

ম্যানেজার প্রশ্ন করলে, 'আপনারা কোথা থেকে আসছেন জানতে পারি কি?'

'আপাতত এই সামনের রাস্তা ধরে বরাবর তিনশো গজ মতো হাঁটলে' এই মুহূর্তে যে গাড়িটা এক গভীর গাড্ডায়— যে রকমভাবে কোনো গাড়িকে ইতিপূর্বে আমি কখনো কোথাও পরিপূর্ণভাবে গাড্ডায় পড়তে দেখিনি—

পড়ে আছে, সেখান থেকে। পুরো একটি ব্যাটেলিয়ন সৈন্য আর কয়েকটা ট্র্যাকশন ইঞ্জিন ছাড়া ওকে ওখান থেকে নড়ায় কার সাধ্যি। আমরা দ—শ মিনিট চেষ্টা করেছি।'

দরজা ফের খুলে গেল। যুবকটি দরজার দিকে তাকাল। সেই সুযোগে বেন্টন আর ম্যানেজারের চোখে চোখে ইশারা হয়ে গেল। ম্যানেজার কাঁধ সামান্য ঝাঁকিয়ে জানালে যে সে নিরুপায়। ইতিমধ্যে নবাগত দ্বিতীয় যুবক ও ওভারকোটটা ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে দিলে। ভীমের আধুনিক সংস্করণ এই দীর্ঘদেহী যুবকটিকে দেখলেই বোঝা যায় যে সে অমিতশক্তির অধিকারী। আর বর্তমানে তার মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে।

'অ্যাল্‌গি, তুমি একটি অপদার্থ কুষ্মাণ্ড। তোমার জোর বরাত যে পরীক্ষা দিয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাবার যুগের আগেই তুমি লাইসেন্স পেয়ে গেছ।' তারপর ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আচ্ছা এই হোটেলটার নাম কী?'

''লোন্‌লি ইন্‌।'' নামটা অদ্ভুত লাগতে পারে, তবে পরিবেশের সঙ্গে দিব্যি খাপ খেয়ে যায়।'

''লোন্‌লি ইন্‌''! অ্যালগি, পিটার তো এই হোটেলের কথাই বলেছিল। আমাদের আরও দশ মাইল যেতে হবে।

'আমি জানি না, আজ এই দুর্যোগের রাতে ওখানে কী করে যাবে। গাড়িটা তো চেপে বসে গেছে। একমাত্র উপায় হাঁটা। সে-ও অসম্ভব।

বেন্টন বললে, 'আমরা কি কোনোভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি? হয়তো চারজনে চেষ্টা করলে গাড়িখানা তোলা যেতে পারে।'

হুইস্কির পাত্রটা নামিয়ে রেখে সেই ভীমকায় যুবকটি বললে, 'অসম্ভব, কোনো আশা নেই। আমার বন্ধু লংওয়ার্থ সে গুড়ে বালি ঢেলে দিয়েছে। ব্রেকডাউন ভ্যান ছাড়া ওকে এক চুলও নড়ানো যাবে না।...ম্যানেজার, আপনি কি আজ রাত্তিরের জন্যে আমাদের মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন?'

'বলতে খুবই খারাপ লাগছে, কিন্তু সেটা কোনোমতেই করা সম্ভব নয়। আমার তিনটে ঘর আর তিনটেই ভাড়া হয়ে গেছে।'

'মোটেই সুখবর নয়' বলে যুবকটি হুইস্কির পাত্র নামিয়ে রাখল। 'আচ্ছা আর একবার করে হুইস্কি হয়ে যাক! ম্যানেজার, আপনি দিন। আরে মশাই আপনিও নিন না।...হুঁ অ্যালগি, এখন তা হলে কী করা যায়?'

'আপনারা কোথায় যাবেন জানতে পারি কি'? ম্যানেজার প্রশ্ন করলে।

'ডান্‌কান্টন হল। আপনি জানেন।'

'খুব জানি। ডান্‌কান্টন হল স্যর জেরাল্ড মর্শবির বাড়ি। আপনি ঠিকই বলেছেন, এখান থেকে আন্দাজ মাইল দশেক হবে। আমি যদি এখান থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ করি তো কিছু সুবিধে হতে পারে কি?'

'চেষ্টা করতে দোষ নেই। দেখুন যদি মিঃ ডারেলকে পেয়ে যান। পেলে বলবেন যে ক্যাপ্টেন ড্রামন্ড তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান। আর ওঁকে না পেলে যিনি ফোন ধরবেন, তাঁকে বলবেন যে মিঃ ডারেল ফিরে এলেই যেন আমার সঙ্গে এখানে যোগাযোগ করেন।'

'ঠিক আছে। আমি এক্ষুনি ফোন করছি।'

ম্যানেজার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে, ড্রামন্ড ফায়ার প্লেসের দিকে এগিয়ে গেল।

'আপনারা কি এদিকে এই প্রথম আসছেন', বেন্টন প্রশ্ন করলে।

'হ্যাঁ। এখানকার আবহাওয়া কি এই রকমই নাকি?'

'কুয়াশা হয় বটে, তবে এই সময়ে এমন বিশ্রী ধরণের কুয়াশা সাধারণত হয় না।'

বেন্টনের কথা শেষ হতেই মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল আর তার সঙ্গে সঙ্গেই হেডলাইটের জোরালো আলো জানালায় ঝলসে উঠল।

'এঁরা আপনাদের চেয়ে ভাগ্যবান' বেন্টন বললেন। 'মনে হচ্ছে আমার পরিচিত লোকেরাই এলেন।'

বেন্টন দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আর ঠিক তখনই ম্যানেজার এসে বললে যে ফোনে মিঃ ডারেলকে পাওয়া গেছে।

'আপনি আমার সঙ্গে এদিকে আসুন।'

ড্রামন্ড ম্যানেজারকে অনুসরণ করলে। দু-এক সেকেন্ডের বিরতি, তারপর টেলিফোনের অপর প্রান্তে পিটারের গলা শোনা গেল।

'পিটার, অপদার্থ অকম্মার ধাড়ি অ্যালগি গাড়িটাকে এমন গভীর গাড্ডায় ফেলেছে যে আজ রাত্তিরে ওটাকে তোলা যাবে না। তুমি আমাদের এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে? আমরা এখন হোটেল লোন্‌লি ইন্‌-এ।'

'বন্ধু হে, এখন এখানে যা অবস্থা তাতে নিজের হাতই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থায় গাড়ি নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তার চাইতে আজ রাতটা ওখানেই কাটাও। আমি কাল সকালে যাব।'

'এখানে তো ঘর নেই। হোটেলের তিনটে ঘর আর তিনটে ঘরই ভাড়া হয়ে গেছে।'

'কী বলছ...তিনটে ঘর...আর তিনটে ঘরই ভাড়া হয়ে গেছে! আমি নিশ্চিত জানি প্যারিশ বজ্জাতের হোটেলে আটটা ঘর আছে।'

ঠিক তখনি ড্রামন্ডের নজরে পড়ল দরজার বাইরে মেঝের ওপর একটা ছায়া সরে গেল। ম্যানেজার আড়ি পেতে কথা শুনছিল।

ঘরের ভেতরে অনেকের গলা শোনা যাচ্ছে—তাদের একটি মহিলা কণ্ঠ। ড্রামন্ডের চোখে-মুখে বিস্ময়।

'হ্যালো হিউ, তুমি কি শুনছ?'

'শুনছি বৈ কী, আর ভাবছি।'

ম্যানেজার ঘর নিয়ে মিছে কথা বললে কেন? ...উপরি উপার্জনের লাভ ছাড়ল কেন?...পিটার লোকটাকে বজ্জাত বললে কেন?

'আজ আর কিছু করা যাবে না।' পিটার জোরের সঙ্গেই বললে।, 'যদি কুয়াশা কেটে যায় তো আমি যাব। তবে সে আশা কম।'

'আমি বুঝতে পারছি।'

ড্রামন্ডের মুখের ভাব পালটে গেছে। এখন তাঁর ঠোঁটের কোণে এক টুকরো রহস্যময় হাসি।

'পিটার, একটা কথা, মনে রেখো। কোন ঝিনুকের পেটে যে মুক্তো থাকে তা কেউই বলতে পারে না। কী বললে? ও কিছু নয়...হেঁচকি তুললে। ভালো, ভালো। আমি আর অ্যালগি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব।'

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে ড্রামন্ড বার রুমের দিকে গেল। নতুন অতিথিরা বসে আছেন। এঁদের একজন বৃদ্ধ— মাথার চুল সব সাদা। ভদ্রলোকের চেহারা দেখলেই মনে হয় নির্ভেজাল ভালোমানুষ। আর তখন তিনি ফায়ার প্লেসের সামানে সামান্য ঝুঁড়ে পড়ে দাঁড়িয়ে হাত পা ঘষে শরীর গরম করছিলেন। আর একজন তরুণী—অল্প বয়সী। অ্যাল্‌গি গভীর মনোযোগের সঙ্গে মেয়েটিকে লক্ষ্য করছিল। বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি হবে না। পোশাক বেশ দামী, রুচিসম্মত অথচ সাধারণ ও মানানসই। ড্রামন্ড ঘরে ঢুকতে সে একবার তার দিকে তাকিয়ে বেন্টনের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। ভাবভঙ্গী থেকে বোঝা কষ্ট নয় যে মেয়েটি খুব কষ্টে আছে।

'সে সব কথা এখন থাক। টিনি কোথায়?' মেয়েটি বেন্টনকে প্রশ্ন করলে।

'কই এখনও তো এসে পৌঁছল না। এই রকম কুয়াশায় এসে পৌঁছতে পারবে কিনা তা-ও ঠিক বুঝতে পারছি না। এখনও অবশ্য তার আসবার অনেক সময় আছে। ব্যস্ত হবার বা হতাশ হবার কোনোই কারণ নেই। ...আমি বরঞ্চ আপনার গাড়িটা গ্যারেজে তুলে দিয়ে আসি।'

'তা হলে তো খুব ভালো হয় হ্যারল্ড', বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন। 'আজ সারাদিন গাড়ি চালাতে যে পরিশ্রম হয়েছে তাতে মেরী আজ আর গাড়ি চালাতে চাইবে বলে মনে হয় না।'

'এই রকম একটা ধাপধাড়া জায়গায় যে ও আমাদের কেন আসতে বললে কে জানে'। বেন্টন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মেয়েটি ঝাঁঝিয়ে উঠল।

'জায়গাটা তো মাঝামাঝি কিনা। টিনির পক্ষেই বলো, আমাদের দিক দিয়েই বলো আর ওর পক্ষেও আসা সোজা। তুমি কিন্তু ভুলো না যে বেন্টন খুব ব্যস্ত মানুষ। আর এরকম বিশ্রী কুয়াশা হবে তা কে কী করে জানবে বলো।'

'এ জায়াগাটা রীতিমতো ভীতিপ্রদ, তাই না? আপনারা অবশ্য আমাদের চেয়ে ভাগ্যবান। আমাদের গাড়িটা তো আন্দাজ তিনশো গজ দূরে গাড্ডায় পড়ে রয়েছে'। ড্রামন্ড বললে।

মেয়েটি বললে, 'হ্যাঁ, আসতে আসতে রাস্তায় দেখলুম বটে। দুর্ভাগ্যই বটে।' মেয়েটির কথার মধ্যেই বেন্টন ঘরের ঢুকল। 'মিস প্যাটসনের গাড়িটা গ্যারেজ করবার আগে কি আমি আপনাদের গাড়িটা তোলবার একবার চেষ্টা করব? আমার কাছে মোটা কাছি আছে। টেনে দেখতে পারি।'

ড্রামন্ড বললে, 'না, ভুলেও সে চেষ্টা করবেন না। গাড়িটা ওখানেই থাক। ডানবান্টন হল থেকে আমার বন্ধু আসবে বলেছে। যদি একান্তই না আসতে পারে তো এখানেই যা হোক করে রাতটা কাটাতে হবে।'

বেন্টন চলে গেল। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি স্যার জেরাল্ডকে চেনেন নাকি?'

ড্রামন্ড বললে, 'একটু আধটু। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এখন ওঁর কাছে আছে। কথা ছিল স্কটল্যান্ড যাবার আগে ওঁদের সঙ্গে দেখা করে যাব।'

'স্যার জেরাল্ড ভারি চমৎকার মানুষ। আমাদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছে।'

'আপনারা কি কাছাকাছি থাকেন নাকি?'

'মাইল চল্লিশেক দূরে। এখানে আমাদের আর আমার মেয়ের হবু স্বামীর সঙ্গে সলিসিটারের কিছু বৈষয়িক কথাবার্তা আছে।'

ড্রামন্ড নীরবে সেই ভদ্রলোককে পর্যবেক্ষণ করছিল প্রায় অর্ধ নিমিলিত দৃষ্টিতে। চমৎকার এই বয়োবৃদ্ধ মানুষটি যে-কোনও অপরিচিত ব্যক্তির কাছেই তার জীবনের সব কথা অকপটে বলতে পারেন। এমনি এঁর স্বভাব। মেয়েটি বাবাকে থামাবার জন্যে বললে, 'আহ্ বাবা, এসব কথা বলে ওঁকে বিব্রত করছ কেন?' মেয়েটি ড্রামন্ডের দিকে তাকিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গীতে হাসল। ড্রামন্ডও প্রত্যুত্তরে হাসল। আর তখনি তার নজর পড়ল হোটেল মালিকের দিকে। সে বারের কাছে অকারণেই ব্যস্ততার ভাব দেখাচ্ছে।

'আচ্ছা, ওই আর এক ভদ্রলোক এলে শোবেন কোথায়?' ড্রামন্ড হোটেল মালিককে প্রশ্ন করল। 'আপনার তো তিনটে ঘর আছে শুনেছি।'

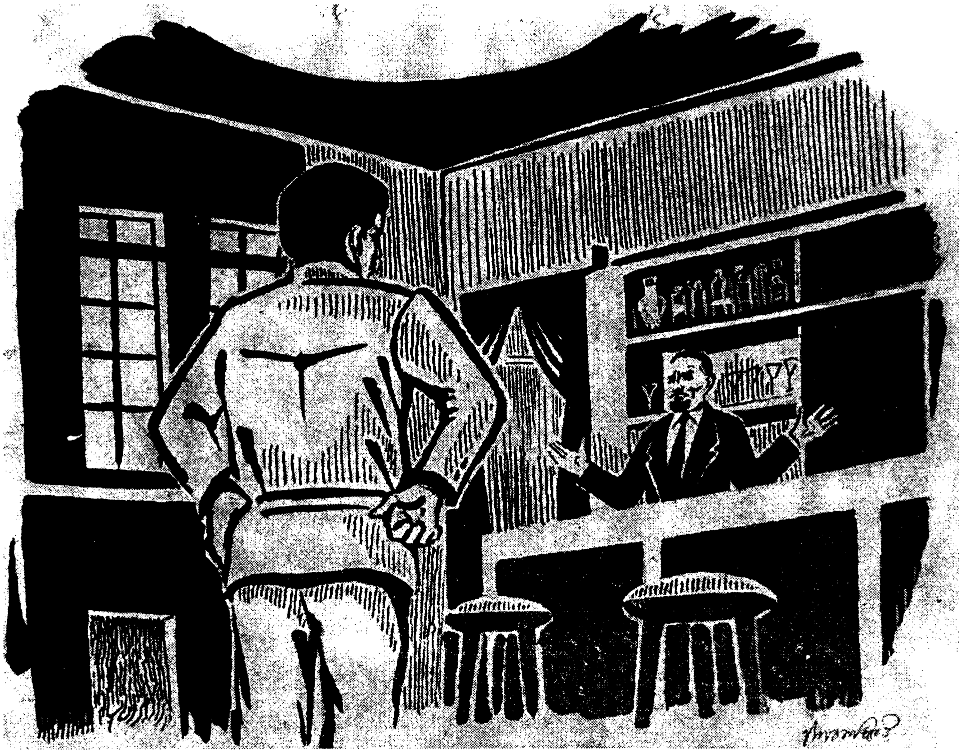

'যদি তিনি আসেন' হোটেল মালিক বেশ বিগলিত ভাবে বললে, 'আমি আমার ঘরটাই ছেড়ে দেব।' দেখুন হোটেলে আরো ঘর আছে তবে সেগুলো ঠিক ব্যবহারযোগ্য নয়।'

'ওঃ', ড্রামন্ড নিস্পৃহভাবে বললে। তারপর অ্যাল্‌গি যে টেবিলে বসেছিল সে টেবিলে উঠে গেল। মেয়েটি আর তার বাবা ফায়ারপ্লেসের কাছে একটা টেবিলে বসে বেন্টনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

'অ্যালগি', ড্রামন্ড নীচু গলায় বললে, 'আমাদের হোটেলের ম্যানেজারটি খুব ঘড়েল নন। সেটা কি তুমি লক্ষ করেছ? উনি বলেছেন, যদি তিনি আসেন—'যদি' কেন?'

'কুয়াশা, মাকাল ফল, কুয়াশা।'

'কুয়াশা এক ঘন্টা আগে পর্যন্ত ছিল না। তা হলে ততক্ষণ পর্যন্ত মেয়েটির হবু স্বামী যে আসবেন সে কথা তিনি জানতেন এবং তৎসত্ত্বেও কেন উনি সেই ভদ্রলোকের জন্যে একটা ঘরের ব্যবস্থা করে রাখেননি?'

'তুমি কী বলতে চাইছ, হিউ?'

'এই মুহূর্তে কিছুই বলছি না। পিটার টেলিফোনে ওকে বজ্জাত বললে। পিটার আরও বললে যে সে জানে হোটেলে আটটা ঘর আছে। এগুলো তাৎপর্যপূর্ণ হতেও পারে আবার না হতেও পারে। ও ওকে আদর করে বজ্জাত বলতে পারে আর হোটেলে এখন যে ঠিক কটা ঘর আছে সেটা পিটারের না জানা জানতে পাবে। এ সব সত্ত্বেও....

ড্রামন্ড একটা সিগারেট ধরালে। ওর দৃষ্টি ফায়ারপ্লেসের কাছে যারা বসে রয়েছে। তাদের দিকে নিবদ্ধ। মুখ চিন্তাক্লিষ্ট।

'অ্যালগি, আমি বুঝতে পারছি না যে আমি লাগাম ছাড়া উদ্ভট কল্পনা করছি কি না।' তারপর মুচকি হেসে বললে, 'আমি জানি না ইচ্ছে থেকে ভাবনার উৎপত্তি হয় কিনা! তবে আমি মেয়েটির সঙ্গে এ বিষয়ে এক মত যে আজকের দিনে যাতায়াতের এত যখন সুবিধে হয়েছে তখন বৈষয়িক কথাবার্তার জন্যে এরকম একটা বাজে হোটেলকে ঠিক করা হল কেন? মেয়েটি বাবার সঙ্গে ওপরে যাচ্ছে। হোটেল মালিকও যাচ্ছে। এই সুযোগে আমরা মিঃ বেন্টনের একটু আলাপ করতে পারি। চল ওরা যে টেবিলে বসেছিল সেটায় যাই।'

'আমাদের পক্ষে খুবই সুখের ব্যাপার হবে যদি মিস্ প্যাটসনের হবু স্বামী ভদ্রলোকটি এখানে আসতে না পারেন। তা হলে আমাদের থাকার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

'আমার কিন্তু মনে হয় না যে এই আশার ওপর বসে থাকা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে', বেন্টন বললে। 'একেবারে ভগবানের অসাধ্য না হলে ও আসবেই।'

'কিন্তু তিনটে ঘরেই যদি লোক থাকে তাই ওর পক্ষেও খুব সুখকর হবে না।' ড্রামন্ড বললে।

'তিনটে ঘর!...তিনটে ঘর! তবে তো...প্যারিশ!

ম্যানেজার বাররুমে এল।

'প্যারিশ—তুমি তিনটে ঘর বললে কেন? তুমি নিশ্চয়ই চারটে ঘরের কথা বলেছ। মিঃ মন্টগোমারির জন্যে একটা ঘর ঠিক করে রাখা আছে তো?'

একটু থেমে হোটেল মালিক বললে, 'আমি আমার ঘরটাই ওঁকে ছেড়ে দেব।'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক—ঠিক, তোমার নিজের ঘরটা...আমি ভুলে গিয়েছিলুম' বেন্টন বললে।

ড্রামন্ড ভালোমানুষের মতো বললে, 'দেখো ম্যানেজার, তোমার রিসেপশন ডেস্কে একজন লোক রাখা

দরকার। এমন একজন পাকা মাথাওলা লোক যে এত লোকের ভিড় সামলাতে পারবে। আর তা হলে তুমিও কোনো অসুবিধো পড়বেন না।'

বেন্টন হেসে বললে, 'ওর পক্ষে সৌভাগ্যের কথা আজ রাতে এ ব্যাপারে আর বেশিক্ষণ মাথা ঘামাতে হবে না ওকে।' বেন্টন বাইরে দিকে তাকিয়ে বললে। 'কুয়াশা একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে—যদিও এ এ কুয়াশা কাটবে বলে মনে হয়নি। তা হলে মিঃ মন্টগোমারি নিশ্চয়ই আসবেন আর আপনারা ও ডানকান্ট হলে যেতে পারবেন।

বেন্টনের ধারণা ঠিক। একটি-দুটি করে তারা ফুটতে শুরু করছে। আকাশ—চারদিক—সব কিছুই ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

'যাক্, সকলের পক্ষেই সমস্যার সুচারু সমাধান হয়ে গেল', ড্রামন্ড প্রায় অস্ফুট স্বরে বললে। ঠিক সেই সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল। ম্যানেজার ফোন ধরতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ড্রামন্ড বললে, 'সত্যি খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু হলে আমার আর, উত্তরটা জানা হল না।'

বেন্টন তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'উত্তর? কিসের উত্তর?'

'সেই বিরাট সমস্যার। কুয়াশা না কাটলে আমরা রাত কাটাতুম কী করে!'

ড্রামন্ডের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার ঘরে ঢুকে বললেন, 'মিঃ ডারেল ফোনে জানতে চাইছিলেন এখানকার অবস্থা কেমন। আমি বলেছি ভালো। তিনি আপনাদের নিতে আসছেন।'

'ধন্যবাদ', বলে ড্রামন্ড চুপ করে ফায়ার প্লেসের জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল। অ্যালগি তাকে দেখতে লাগল। বেন্টন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, ম্যানেজার বার-এর কাছে ঘুর ঘুর করছে।

'হিউ তোমার হল কী? একদম চুপ করে গেলে যে।'

'প্রথমে যখন ম্যানেজার বলেছেন তিনটে ঘর তখন বেন্টন কিন্তু কোনো আপত্তি করেনি; যদিও তার কথায় চারটে ঘরের দরকার ছিল। আর চারটে ঘরই বেন্টন রিজার্ভ করেছিল। কিন্তু আমি যখন তিনটে ঘরের কথা বললুম তখন তো ও রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়ে গেল। চারটে ঘরের দরকার। ...তাহলে ধরে নিতে হয় যে বেন্টন জানত না যে ম্যানেজার যে তাঁর নিজের ঘরটা ছেড়ে দিচ্ছে। আর ম্যানেজার যখন তিনটে ঘরের কথা বলেছিল তখন মিঃ মন্টগোমারির নাম পর্যন্ত বেন্টন বলেনি।'

'ব্যাপারটার গোলমালটা কোথায় বুঝতে পেরেছ কি?'

'পুরোটা নয়।'

'যতক্ষণ না মেয়েটি মিঃ মন্টগোমারির কথা বলেছে ততক্ষণ ওর কথা ওদের মনেই পড়েনি। আর আমরা যখন এসে পড়লুম তখন এ কথাটার উত্তর ওরা আগে থেকে ভেবে ঠিকঠাক করে রাখেনি।'

'কিন্তু মিঃ মন্টগোমারির কথা উঠল না-ই বা কেন? যদি উনি এসে পড়তেন!'

'যদির কথা বাদ দাও। তুমি কি বুঝতে পারছ না অ্যালগি যে যদি সব ব্যাপারটাই খোলাখুলি হত, তাহলে ম্যানেজার যখন তিনটে ঘরের কথা বলেছিল তখন বেন্টন চুপ করে থাকত। কেন না তা হলে তার এটাও জানা থাকত যে ম্যানেজার নিজের ঘরটাই মিঃ মন্টগোমারিকে ছেড়ে দেবে। আর এ কথাটাই বেন্টন একটু আগে পর্যন্ত জানত না।'

'কিন্তু এ সবের অর্থ কি?'

'অর্থ? মন্টগোমারি আসছেন না। তিনটে ঘরই রিজার্ভ করা হয়েছে। আর আমি যখন ম্যানেজার চেপে ধরলুম তখনও ঐসব কথা বললে। আগেই যদিও চারটে ঘরের কথা বলত তা হলে আমাদের ঐ ঘরটা দিতে হত। তুমি আমি এখানে থাকি তা ওরা চায় না।'

'কিন্তু সব ব্যাপারটা কি বড্ড বেশি কষ্ট কল্পনা হয়ে যাচ্ছে না।'

'তোমার কি তাই মনে হচ্ছে? সব ব্যাপারটা বেশ ভালো করে ভেবে দেখ। আমার কিন্তু কেমন সন্দেহ হচ্ছে অ্যালগি। ঐ বেন্টন সলিসিটার হতে পারে, কিন্তু ও আমার সলিসিটার হলে আমি ফার্ম বদলে ফেলতুম। না—ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না। বাপ বেচারা নেহাৎই ভালোমানুষ। ঐ লোকটার হাতে উনি তো নিতান্ত শিশু।'

'এ ব্যাপারে তুমি কী করবে ভাবছ?'

'এখনও পর্যন্ত ভেবে উঠিনি। দেখা যাক পিটার কী বলে।'

প্রায় আধঘন্টা পর পিটার এল। এ ব্যাপারে সেও বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখালে না। গাড়িতে স্যুটকেস তোলা হয়ে গেলে ড্রামন্ডেরও মনে হল ব্যাপারটা হয়ত সত্যি সত্যি তত গুরুতর নয়। আর তাছাড়া যে অকুস্থলে ছিল না তার কাছে ঘরের সংখ্যার সমস্যাটা কোনও রহস্যই নয়।

পিটার বললে, 'আমি প্যারিশকে যে পাজী বলেছি সেটা একটা কথার কথা। বাজারে লোকটার অবশ্য সুনাম নেই। তার কারণ হচ্ছে ও অনেকের কাছ থেকে টাকা ধার করে বসে আছে। অবশ্য এই হোটেলটারও বদনাম আছে। এই হোটেলে দু-একটা খুন হয়েছে, দু-একজন ঐ হোটেল থেকে উধাও হয়েছে যাদের আর সন্ধানই

পাওয়া যায়নি। তবে সে সব বহুদিন আগেকার কথা। বর্তমান মালিকের সঙ্গে এ সব ঘটনার কোনও যোগাযোগ নেই। চল চল, এখন এগিয়ে পড়ি। আবার কুয়াশা হলে অসুবিধে হবে। আর তাছাড়া ঐ মেয়েটির কী-ই বা হতে পারে? বেন্টন কোনো বদমাইশি করবে বলে তোমার মনে হচ্ছে কি?'

'যদি বেটা সেরকম কিছু করে আমি ওকে ফুলকপি করে দেব' বেশ উৎফুল্লভাবে অ্যাল্‌গি বললে। পিটার গাড়ি ছাড়—কিছু পেটে পুরতে হবে।'

সব কিছুই হয়তো স্বাভাবিক, ড্রামন্ড মনে মনে ভাবলে। তবু তার মনের মধ্যে অশান্তির একটা কাঁটা বিঁধে রইল। একটা শঙ্কা, একটা বিপদের সম্ভাবনাকে সে মন থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। বেন্টন আর হোটেলের ম্যানেজার যে প্যাটসনদের ওপর কোনোরকম নিগ্রহ চালাবে তা কল্পনা করা কঠিন। সে রকম কিছু করলে তার ফল তারা হাতে হাতেই পাবে। বিশেষ সে আর অ্যালগি যখন অকুস্থল থেকে সদ্য সদ্য ঘুরে এসেছে। বেন্টন একলা যে খারাপ কিছু করবে সেটা ভাবাও সহজ নয়। কিন্তু একটা অস্ফুট আশংকা ড্রামন্ডের মনে পাক খেতে লাগল। বৈষয়িক কথাবার্তার জন্যে এরকম একটা জায়গা ঠিক করা হল কেন? ঘরের সংখ্যা নিয়ে এত বৈষম্য কেন। শেষকালে ড্রামন্ড আর থাকতে পারলে না।

'পিটার', ড্রামন্ড বললে, 'আমি একটি নিরেট গাধা হতে পারি, কিন্তু আমি ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছি না। আমাকে নিশ্চিত হতেই হবে। মোরেসবি প্যাটসনদের চেনে। যেন মোরেসবি তোমাকে বলেছে, এইভাবে লোনলি ইন-এ ফোন করে তুমি মিস্ প্যাটসন বা তার বাবাকে চাও। তারপর যাহোক দু-চার কথা বলে জেনে নাও মন্টগোমারি ভদ্রলোক এসেছে কিনা।'

'যো হুকুম চীফ্। আর যদি এসে থাকে—'

'তা হলে যাহোক, বলে ফোন ছেড়ে দেবে। তারপর তুমি ফিরে এলে আমরা জোর ফূর্তি করব।'

পিটার হল থেকে বেরিয়ে গেল। ড্রামন্ড পার্টিতে উপস্থিত লোকেদের দেখতে লাগল। বেশ বড় পার্টি। অনেকে এসেছেন। ড্রামন্ড বুঝতে পারছিল যে সে পার্টিতে ঠিকমতো যোগ দিতে পারছে না। কিন্তু যতক্ষণ না মন থেকে ওই ব্যাপারটার একটা সন্তোষজনক সমাধান হচ্ছে, ততক্ষণ তার মনের এই অস্থিরতা কাটবে না। হঠাৎ সে পিটারকে আসতে দেখলে। আর পিটার কিছু বলবার আগেই সে উত্তরটা জেনে গেল।

পিটার যা বললে তার অর্থ মোটামুটি এই রকম, ভদ্রলোক আসেননি, আর ভদ্রলোকের না আসাটা ওদের চিন্তায় ফেলেছে। সবচেয়ে বড় কথা ভদ্রলোকটি যে কেন ফোন করে কোনও খবর দিলেন না, তা ওঁরাও বুঝতে পারছেন না।

'অ্যাল্‌গি'। ড্রামন্ড লংওয়ার্থকে ডাকলে। অ্যাল্‌গি এগিয়ে এল। 'মন্টগোমারি লোনলি ইন্-এ আসেনি। টেলিফোনে কোনো খবরও দেয়নি। এখন মোটে সাড়ে দশটা। আবহাওয়া মোটামুটি পরিষ্কার। তা হলে সব ঠিক হয়ে গেল।'

'হায় ভগবান! কী ঠিক হল?'

'যাও, জামাকাপড় বদলে এস।' ড্রামন্ডের সংক্ষিপ্ত উত্তর। 'পিটার আসছ তো? আমরা পাশের দরজা দিয়ে ছিপ ছিপ করে বেরিয়ে যাব আর যত শিগ্‌গির সম্ভব ফিরে আসব।'

'পিটার, আলো নেভাও। এইখানে গাড়ি থেকে নেমে আমরা হাঁটব।'

অল্পদূরের লোনলি ইন-এর দোতলার ঘরে একটি মাত্র আলো জ্বলছে। সেই আলো বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ওপর ছড়িয়ে পড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। এখন আর ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে না বটে, তবে এমন ঘোর অন্ধকার যে কাছের কোনও জিনিসও নজরে পড়ে না। রাস্তাটা বরাবর সিধে চলে গেছে। কাদা প্যাচ্ প্যাচ্ করছে। দূর থেকে ভেসে আসা জল পড়ার ক্ষীণ শব্দ ছাড়া রাত্রির অলৌকিক নিস্তব্ধতা কোনোভাবেই ব্যাহত হচ্ছে না।

ওদের সকলের পায়েই শোলের জুতো। এখন ওদের দেখলে ভৌতিক ছায়ামূর্তি ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। ওরা নিঃশব্দে চলাফেরা করছিল। অন্ধকারে একবার দেখা দিয়েছে ওরা কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে! ওরা যখন হোটেল থেকে আন্দাজ একশো গজ দূরে, তখন দোতলার জানালার আলো নিভে গেল। এখন রাস্তার ওপরে একটা ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছে। বাররুমের আলো। এখনও ওখানে কেউ কেউ আছে। বাররুমের জানালার পর্দা ফেলা। কিন্তু একটা ফোকর দিয়ে বাইরে থেকে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফায়ার প্লেসের দিকে পিছন করে বেন্টন দাঁড়িয়ে। ম্যানেজার বার-এর পিছনে তার নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। যদিও ম্যানেজার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল তবু বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে সে একটু বেশিই... নেশাগ্রস্ত।

'ওর ঘরের আলো নিভে গেছে', ম্যানেজার বললে। জানালায় ফোকরের জন্যে ঘরের সব কথা বাইরে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। 'চল, কাজটা এবার সেরে ফেলা যাক।'

বেন্টন বললে, 'সব কিছু ঠিক ঠাক আছে তো?'

ম্যানেজার মাথা নাড়ল তারপর সে বার-এর টেবিলের

তলায় ঝুঁকে কিছু করতে লাগল। যখন সে উঠে দাঁড়াল তখন তার হাতে মংগ্রেল জাতীয় একটা কুকুর।

'প্যাসেজের আলোটা নেভোতে ভুলো না যেন। আমি ওপরে যাচ্ছি', বেন্টন বললে।

'ব্যাপারটা কী', ড্রামন্ড ফিসফিসিয়ে বললে। 'আমরা কি শেষ পর্যন্ত ভুলই করলুম?'

অ্যালগি স্বগত উক্তি করলে, 'আমরা ভুল...আহ্ কী আনন্দ।'

কিন্তু ম্যানেজার অন্ধকারে কালো ছায়ার মতো ইতিমধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেছে। এরপর তাকে ওঁরা দেখতে পেল পিছনের উঠোনের এক কোণে। উল্টো দিকে একটা আস্তাবলের সামনে একটা মোমবাতি জ্বলছে।

পিটার আর অ্যালগি সেই আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখলে মোমবাতির শিখায় একজন লোকের ছায়া শরীর নড়াচড়া করছে।

'ম্যানেজার', ড্রামন্ড ফিস ফিস করে বলল। 'ওখানে কুকুরটাকে নিয়ে গেল।'

কিছুক্ষণ পরে মোমবাতিটা কেউ নিভিয়ে দিলে। আর ওরা আস্তাবলের দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে পেলে। উঠোনে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। খিড়কি দরজা বন্ধ হয়ে গেল। রাতের সব কাজ শেষ করে ম্যানেজার এবার শুতে গেল।

পিটার অনুযোগের সুরে বললে, 'দেখো বাপু, আমার আর কিন্তু ভালো লাগছে না। চল আমরাও ফিরে যাই। তোমার মাথায় কী ভূত চাপল বলো তো?'

আস্তাবল থেকে কুকুরের করুণ আর্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছে, ড্রামন্ড স্থির হয়ে ঐ অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পিটার আর অ্যালগির হাত দুটো শক্ত করে তার হাতে ধরা।

'যেখানে আছ সেইখানেই থাকো' প্রায় অস্ফুট স্বরে এই কথা বলে ড্রামন্ড অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল।

'ওর কি ভীমরতি হল নাকি', অ্যালগি জিজ্ঞেস করলে। 'তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছো পিটার? উহ্ কুকুরটা কী রকম ডাকছে শোনো!'

আস্তাবল থেকে কুকুরটা একটানা আর্তনাদ করেই চলেছে করুণ কাতর ক্রন্দন! হঠাৎ দোতলায় একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠল। জানালার একটি মেয়ের ছায়া ওরা দেখতে পেল।

আর ওরা দেখলে একটি কালো ছায়ামূর্তি বাগানে প্রেতধোনীর মতো একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল উঠোনের খিড়কির দিকে।

কিছুক্ষণ মেয়েটি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর সরে গেল। পিটার কিন্তু মেয়েটিকে দেখছিল না। খানিকক্ষণ পরে অ্যালগির দিকে তাকালে।

'খিড়কি দরজা থেকে আন্দাজ তিন গজ আগে দেখ', পিটার ফিস ফিস করে বললে। 'ঐ বাগানে! দেখতে পেয়েছ কি আমি যা দেখতে বলছি? ভিজে ভিজে পাথরের মাঝখানে ঐ শুকনো চতুষ্কোণ জায়গাটা...আলো পড়াতে আমি দেখতে পেয়েছি। ওইটের কথাই কি হিউ বলতে চাইছিল?'

এখন হোটেল থেকে কিছু কিছু কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল, তবে বোঝা যাচ্ছিল না। ওপর তলার আলো হঠাৎ নিভে গেল। খিড়কি দরজার চাবি খোলার শব্দ ওদের কানে এল। আর কানে এল বেন্টনের গলা।

'খুব সাবধানে মিস প্যাটসন। একেবারে সোজা যান। হতভাগা ম্যানেজারটা পাঁড় মাতাল।'

আর তারপরই কুকুরটার আর্ত করুণ চীৎকারকে ছাপিয়ে শোনা গেল এক তীক্ষ্ণ চীৎকার। সেই মহিলা কণ্ঠের চীৎকার, এতই আকস্মিক যে ওরা দুজনেই এগিয়ে গেল। চীৎকারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে ভারি কোনো কিছু পড়ে যাবার ঝপ্ করে শব্দ হল। এই গোলমালে কুকুরটা চুপ করে গেছে। আর ডাকছে না। হোটেলের জানালা খুলে গেল। ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলে উঠল। গোলমালের মধ্যে ড্রামন্ড এসে উপস্থিত। তার সঙ্গে একটি মেয়ে। ক্ষীণ আলোয় দেখা গেল ড্রামন্ডের চোখ থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরোচ্ছে।

'পিটার গাড়ি নিয়ে এস। তোমার জন্যে আমরা বার-এ অপেক্ষা করব।'

উঠোন থেকে বেন্টনের গলা শোনা যেতে লাগল, 'মিস্ প্যাটসন, মিস্ প্যাটসন!' ওপর থেকে হোটেল মালিক বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'ব্যাপার কী?' তারপর মিঃ প্যাটসন উদ্বিগ্নভাবে ডাকতে লাগলেন, 'সোনামণি কী হয়েছে?'

সিঁড়ির মুখেই বৃদ্ধের সঙ্গে ওদের দেখা হল।

'আপনার কন্যা সুস্থ আছেন', শান্তভাবে ড্রামন্ড তাকে জানাল। 'যেহেতু আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই একটা কথা বলবেন কি? মিঃ বেন্টনই বা কে আর আপনাদের সঙ্গে ওর সম্পর্কই বা কি?' আর আপনারা এখানে এসেছেনই বা কেন?'

'আমার মেয়ের হবু স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে আর সম্পত্তির ব্যবস্থা করতে। মিঃ বেন্টন আমার সলিসিটার—আমার মেয়ের বিষয় সম্পত্তি ও টাকাকড়ির দেখাশোনা তিনি করেন।'

'ও হো', ড্রামন্ড সহজভাবে বললে। 'বুঝলুম।'

বাইরে থেকে বেন্টনের চিৎকার শোনা গেল, 'নির্বোধ!

কুয়োর মুখটা খোলা আছে—ও কুয়োয় পড়ে গেছে।'

অত্যন্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে ড্রামন্ড বললে, 'ঠিক তাই। কুয়োর মুখটা খোলাই বটে-কিন্তু উনি কুয়োয় পড়েন নি।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মশাই; বৃদ্ধ উদ্‌ভ্রান্তের মতো বললেন।

ড্রামন্ড গম্ভীরভাবে বললে, 'আপনি শিগ্‌গিরি সব কিছু জানতে পারবেন—ভালো করেই জানবেন।'

'বাপী, কুকুরটা এমন কাতরভাবে ডাকছিল', ড্রামন্ডের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বললে, 'মিঃ বেন্টন আমার ঘরে এসে বললেন, আমি যদি কিছু করতে পারি।'

'তিনি বললেন, 'ভাবলেশহীন মুখে ড্রামন্ড বললে।

'আর তারপরে হঠাৎ এই ভদ্রলোক অন্ধকারে আমাকে খপ্ করে ধরে ফেললেন—ভয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম। আচ্ছা জলে পড়ে যাবার শব্দ কিসের?'

'এক বস্তা আলু। আমি লাথি মেরে বস্তুটা গর্তে ফেলে দিয়েছিলুম', ড্রামন্ড বললে। 'দেহটা খুঁজে পেলেন মিঃ বেন্টন?'

দরজার কাছে সলিসিটার লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল। সে ঘরে উপস্থিত সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যে কথা বলা দূরে থাক ওঁর ঢোঁক গিলতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। অতিকষ্টে নিজেকে সামলে জিবে বিড় বিড় করে বললে, 'ঈশ্বর করুণাময়। আমি ভয় পাচ্ছিলুম।'

'হ্যাঁ' অত্যন্ত ভদ্রভাবে ড্রামন্ড বললে, 'আপনার ভয় হচ্ছিল।'

'যে মিস্ প্যাটসন কুয়োর জলে পড়ে গেছেন।' এতক্ষণে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে মিঃ বেন্টন। 'আহাম্মক প্যারিশ হয়তো কুয়োয় ঢাকা দিতে ভুলে গিয়েছিল।'

'ঠিক', ওর কথার রেশ ধরে ড্রামন্ড বললে। 'আমি সেটা লক্ষ করেছিলুম। এই যে পিটার, এসো তোমার সঙ্গে মিস্ প্যাটসন আর ওর বাবার আলাপ করিয়ে দিই। মিঃ ডারেল।' মিস্ প্যাটসন বাইরে পিটারের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমার ইচ্ছে আপনি আর মিঃ প্যাটসন তৈরি হয়ে ওর সঙ্গে ডানকান্টন হল-এ চলে যান আজ রাত্তিরের জন্যে। পিটার, ওঁদের পৌঁছে দিয়ে তুমি আমাকে আর অ্যালগিকে নিয়ে যাবে।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটু দোনামনা করে বললেন, 'এখন অনেক রাত হয়ে যায়নি কি?'

'না বাপী চলো' সে যে জোর করে বললে। 'তুমি তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। মেয়েটি নিজের জায়গা ছেড়ে ড্রামন্ডের কাছে উঠে এল।

'আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়াটা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে', অত্যন্ত আবেগপূর্ণ গলায় সে বললে। 'কিন্তু আপনারা কেন থাকছেন?'

ড্রামন্ড একটু রহস্যময় হাসি হেসে বললে, 'মিঃ বেন্টনের সঙ্গে কিছু কথা আছে। নাহ্, আপনারা এখন তৈরি হয়ে এগিয়ে পড়ুন।'

প্রায় মিনিট দশেক হল পিটার মিস্ প্যাটসন আর ওঁর বাবাকে দিয়ে ডানকান্টন হলের দিকে রওনা হয়ে গেছে। এখন বাররুমে অ্যাল্‌গি, ড্রামন্ড, বেন্টন আর ম্যানেজার বসে।

'খুবই বরাতজোর বলতে হবে যে আপনি তখন কাছাকাছি ছিলেন', বেন্টন বললে। 'তবে আপনি যে এই রাতে আবার ফিরে কেন এলেন সেটা আমি জানি না।' কথাগুলো বেশ ঠাট্টার মেজাজে হাল্কা স্বরে বলতে চাইলে একথা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না যে ওই ভীমকান্ত ড্রামন্ডের সামনে আর যাইহোক সে মোটেই স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল না। 'সে যে কোনো কারণেই হোক আপনি যে এসে পড়েছিলেন সেই জন্যে আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।'

আমতা আমতা করে ম্যানেজার বললে, 'কুয়োটা যে কী করে খোলা ছিল সেটাই আমার মাথায় ঢুকছে না।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ ড্রামন্ডই কথা শুরু করলে।

'মিঃ বেন্টন, আপনি তো আইনজ্ঞ, মানে আইনের লোক তাই না?' ড্রামন্ডের গলায় বিনয়ের সুর।

'হ্যাঁ।' বেন্টনের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'আপনাদের আইনে তো আবার প্রমাণ ছাড়া এক পাও এগোনো যায় না—তাই না? আমার এটা ভেবে খারাপ লাগছে যে আমার হাতে কোনো প্রমাণই নেই।'

জিব দিয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে বেন্টন বললে, 'কিসের প্রমাণ?'

'যে আপনি আর আপনার ঐ গুণধর বন্ধুটি ভেবে চিন্তে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় একটা জঘন্য, নৃশংস খুনের আয়োজন করেছিলেন।'

সলিসিটার ভদ্রলোক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। চীৎকার করে বললেন, 'কী যা তা বলছেন? আপনার স্পর্দ্ধা তো কম নয়।'

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ড্রামন্ড বললে, 'মিঃ মন্টগোমারিকে আপনারা আদৌ কোনো খবর দিয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে আমার মনে ঘোর সংশয় আছে। আপনারা ঐ বুড়ো মানুষটিকে আর ওঁর মেয়েকে ভুল বুঝিয়ে এখানে আনতে চেয়েছেন ঐ মেয়েটিকে খুন করবার উদ্দেশ্যে। আমার বিশ্বাস আপনি টাকা পয়সা নিয়ে অনেক গোলমাল করেছেন। ধরা পড়লে আপনার খুবই

অসুবিধে হবে। তাই আপনি এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে চেয়েছিলেন যেখানে পরিকল্পিত নৃশংস হত্যাকে দুঃখজনক দুর্ঘটনা হিসেবে সহজেই চালিয়ে দেওয়া যাবে। তাই নয় কি মিঃ বেন্টন? আপনি জানতেন আস্তাবলে আটকে রাখলে কুকুরটা আর্তনাদ করবেই। একটি সহানুভূতিশীল অল্পবয়সী মেয়ে কুকুরটাকে দেখতে যাবে আর তারপর অন্ধকার রাত্রি আর ঢাকা খোলা কুয়া। নিছকই দুর্ঘটনা। দুর্ভাগ্যজনক সন্দেহ নেই তবে দুর্ঘটনাই। কাউকে সন্দেহ করবার কোন রকম অবকাশই নেই। কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্য এই যে অন্ধকারের মধ্যে সব কিছু স্পষ্ট দেখবার অদ্ভুত ক্ষমতা আমার আছে। আর তাই আমি কুয়োর খোলা মুখটা দেখতে পেয়েছিলুম।

'ডাহা মিথ্যে কথা', বেন্টন ঝাঁঝিয়ে উঠলে। 'আপনার কথাবার্তা আপত্তিজনক মানহানিকর। আপনি কিছুই প্রমাণ করতে পারবেন না।'

'আমি জানি যে তা আমি পারব না' ড্রামন্ড শান্তভাবে বললে। 'আর আপনার পক্ষে যে খারাপ খবর সেটা হল আমি এ কথাটা জানি।'

'আপনি কী বলতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ আমি জানি যে যদি বোবার মতো আমি আপনার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে নালিশ করি, তো আমি কিছু-ই প্রমাণ করতে পারব না। উলটে আমাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ জরিমানা দিতে হবে।

'যাক্। আপনার বুদ্ধি তাহলে খুলছে।'

'হ্যাঁ। আর সেটা আপনার পক্ষে মোটেই ভালো হচ্ছে না। কেন না, যদিও আমি কোনো কিছুই প্রমাণ করতে পারব না কিন্তু আমি সব ব্যাপারটি জেনে গেছি। তা হলে আমরা এখন কী করব?'

'আপনি কী করবেন তা আমি জানি না। তবে এখন রাত হয়েছে আমি শুতে যাব।'

'না, না, বেন্টন আপনি যাবেন না', ড্রামন্ড বেশ ধীরে সুস্থিরে বললে। 'আপনি অন্তত এখনি শুতে যাচ্ছেন না। বিচার ও আইন সমাজের সবচেয়ে বড় জিনিস। আমি অন্তত এর কোনও অবমাননা ঘটাব না। যেহেতু আমি আপনার বিপক্ষে কোনো মোকদ্দমা রুজু করতে পারব না, তাই আমি আপনাকে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করবার সুযোগ দেব। আমার ইচ্ছে হয়েছিল আপনাকে ঐ কুয়োয় ছুঁড়ে ফেলে দিতে। কিন্তু তাতে জল দূষিত হবে বলে বোর্ড অফ্ হেলথ্ সঠিকভাবেই আপত্তি করবে। আর সেই কারণে আমি সুবিচারের সবচেয়ে ভালো যে রাস্তা সেটাই গ্রহণ করব। আপনাকে আমিই শাস্তি দেব। এটাই হবে আমার মতে আপনার বিচার—অবিচারও বলতে পারেন। ও, ও, আপনার বন্ধুটি পালিয়েছে দেখছি। চিন্তার কিছু নেই ওকে আমি ঠিক খুঁজে বের করব। আর তখন ওর-ও যথাযোগ্য বিচার হবে।'

'হে ভগবান', ড্রামন্ডের মুখ-চোখ থেকে ক্ষমাহীন ক্রোধের বিচ্ছুরণ দেখে বেন্টন ককিয়ে উঠল। 'দয়া করুন, আমাকে ছেড়ে দিন, দয়া করুন।'

মিনিট দুয়েক পর অ্যালগির গলা শোনা গেল।

'থাম হিউ। তুমি ওকে মেরে ফেলতে চাও নাকি!'

গভীর সমুদ্রের তল থেকে উঠে আসা ডুবুরীর মতন মিট মিট করে চারদিকে তাকায় ড্রামন্ড। ধাতস্থ হয়ে সে অ্যালগির দিকে তাকাল। তারপর বেন্টনের দেহটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

'না, না হতে পারে না। আমরা ওকে হারাতে চাই না অ্যালগি। এখন তো মোটেই নয়', প্রায় ঘরের মধ্যে ড্রামন্ড বললে। 'চল এখন ম্যানেজারটার খোঁজ করি।'

কিন্তু সে আর এক কাণ্ড। হোটেলের প্রতিটি ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না। সেই বৃহৎ প্রান্তরে কোনো এক নিভৃত কোণে সে রাত্রির মতো গা ঢাকা দিয়েছিল। ফলে হোটেলে ফিরে এসে পিটার ডারেল বেন্টনকেই দেখতে পেয়েছিল।'

'তোমার হাতে কাজের এটা একটা ভালো নমুনা, হিউ, তারিফ করে ডারেল বললে। তবে ওর ডান কান বাঁ কানের সামঞ্জস্য চলে গেল। অবশ্য ওর পক্ষে ঐ সিমেট্রির খুব দরকারও কিছু ছিল না।

লেখক পরিচিতি : স্যাপার (Sapper) ইংরেজ লেখক হেনরি সিসিল ম্যাক্‌নীল (Henry Cecil Macneile)-এর ছদ্মনাম। ম্যাকনীলের জন্ম ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে, মৃত্যু ১৯৩৭-এ। অনেক উপন্যাসের লেখক ম্যাকনীলের সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র ক্যাপ্টেন হিউ ড্রামন্ড, যিনি বুল ডগ ড্রামন্ড (Bull-dog Drummond) নামে বেশি পরিচিত। লেখকের জীবৎকালে বুলডগ ড্রামন্ডকে নিয়ে পাঁচটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। স্যাপার ড্রামন্ডকে নিয়ে ছোটোগল্প লেখবার কথা ভেবেছিলেন। কয়েকটি গল্প লিখেওছিলেন, কিন্তু যতগুলি গল্প লিখবেন ভেবেছিলেন ততগুলি লিখে উঠতে পারেননি। লেখকের মৃত্যুর বহু বছর পরে ১৯৮৪ সালে Dent এইগুলি ও অন্যান্য কতগুলি গল্প 'SAPPER' The Best Short Stories নামে প্রকাশ করে। অনূদিত গল্পটি এই লেখকের ড্রামন্ডকে নিয়ে প্রথম ছোটো গল্প।

ছবি: শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

প্রত্যর্পণ

অরুণিমা রায়চৌধুরী

না ও ছাড়িয়া দে,
বাদাম উড়াইয়া দে!—প্রায় যেন সেই সুরেই হাঁক দিলেন রমজান মণ্ডল,—মেশিন ছেড়ে দে রে জাঙ্গিরে! ছেলে জাহাঙ্গীর নাও ছেড়ে দিল। তবে বাদাম উড়ানো গেল না। পালতোলা নৌকো তো নয়। মেশিন চালু হল ঘট্-ঘট্ ঘট্-ঘট্ করে।

ঢেউয়ের বুকে সোনালি রোদ্দুরের নাচ দেখতে দেখতে সন্টু বলল—ওই ছুঁচলো বর্শার ফলার মতো ওগুলো কী রে? সুরঞ্জন একটু অন্যমনস্ক হয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়েছিল। সন্টুর কথায় ঘাড় ফিরিয়ে বলল—কোনগুলো?

—ওই যে শূলের মতো?

—ওঃ ওগুলো? ওগুলোই তো বাদাবন।

—কী গাছ ওগুলো?

সুরঞ্জন অল্প হেসে বলল—ওগুলো গাছের শিকড়। জোয়ারের সময় অনেক দূর অবধি জলে ডুবে যায়। গাছেরা তখন নিঃশ্বাস নিতে পারে না। শিকড়গুলো নিঃশ্বাস নেবার জন্য আস্তে আস্তে আকাশমুখী হয়ে উঠে আসে।

—বাব্বা! কত কীই যে জানতে বাকি আছে এখনও। তুই অনেকবার এসেছিস এখানে, না?

—খুব অনেকবার নয়। বার দুয়েক এসেছি। প্রথমবার বাবা-মার সঙ্গে, ঠাকুমাকে পৌঁছে দিতে। সে সময় বেশ কিছুদিন ঠাকুমা আমাদের কাছে গিয়ে ছিলেন। তারপরই দেশে ফেরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আর দ্বিতীয়বার ঠাকুমা যখন মারা যান। সে বছর দশেক আগে।

—তোর ঠাকুর্দা এখনও বেঁচে আছেন?

—হ্যাঁ, ঠাকুর্দার জোর তলব পেয়েই তো বাবা চলে গিয়েছেন। এদিকে বাবার শরীরটা খুব একটা ভালো নয়। সবে জ্বর থেকে উঠেছেন। তাই মা একটু দুশ্চিন্তা করেছিলেন। সেজন্যই আচমকা ছুটি-ফুটি নিয়ে এই সুন্দরবন যাওয়া।

—ভালোই হল। তুই আসবি শুনেই আমিও জুটে পড়লাম তোর সঙ্গে।

সুরঞ্জন হালদার সন্টুর সহকর্মী। দুজনেই ইঞ্জিনীয়ার। এবং দুজনেই একটা নামী সংস্থায় কাজ করে। সুরঞ্জন বিশেষ দরকারে দেশে যাচ্ছে এবং সে দেশ সুন্দরবনে—শুনেই সন্টুও সঙ্গে সঙ্গে ছুটির দরখাস্ত দিয়েছিল। ছুটি পেতে অসুবিধেও হয়নি, কারণ পুজোর কদিনের ছুটিতে ওকে অফিসের কাজে ব্যাঙ্গালোর যেতে হয়েছিল। পুরো পুজোর ছুটিতে কর্মব্যস্ত থাকার পর ও ছুটি দাবী করতেই পারে।

—তোর দাদু কি একাই থাকেন?

—হ্যাঁ। ঠাকুমা মারা যাবার পর কিছু স্থানীয় আদিবাসী মানুষ ওঁর দেখাশোনা করেন। এঁরা প্রায় সবাই এককালে ঠাকুর্দার সহকর্মী ছিলেন। কারো কারো সঙ্গে আত্মীয়তাও আছে। আসলে আমরাও আদিবাসী তো।

—তাই নাকি?

সুরঞ্জন অল্প হাসল—জানতিস না?

সন্টু কথা ঘুরিয়ে বলল—তোর ঠাকুরদা কী করতেন, শিক্ষকতা?

—হঠাৎ শিক্ষকতা মনে হল কেন তোর?

—ওই যে বললি—সহকর্মীরা দেখাশোনা করেন, —সহকর্মীরা সবাই স্থানীয় মানুষ, —শুনেই মনে হল।

—দাদু কী করতেন শুনলে তুই চমকে উঠবি। আমার অবশ্য বলতে আপত্তি নেই কোনো।

সন্টু একটু অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে—চমকে উঠব কেন? সুরঞ্জন একটু গম্ভীর হয়ে বলল, —দাদু ডাকাতের সর্দার ছিলেন। দাদুর সহকর্মীরাও তাঁর দলের ডাকাত ছিলেন।

—বলিস কী?

—চমকে গেছিস তো? ভয় নেই। ডাকাতি করা দাদু ছেড়ে দিয়েছেন বহুদিন।

—মানুষ খুনও করেছেন নাকি?

—তা ডাকাতি করতে গিয়ে দু-একটা করেও থাকতে পারেন।

সন্টু একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ভাবতেই পারছিল না এই নিরীহ শান্তশিষ্ট সুরঞ্জন এক খুনী ডাকাত সর্দারের নাতি। একটু চুপ করে থেকে বলল—

—পুলিশে ধরেনি?

—ধরেছিল, একবার বড় নৌকো ভাড়া করে একটা বড় পার্টি যাচ্ছিল সজনেখালিতে। তাদের ওপর চড়াও

হয়ে লুটপাট করেছিলেন। হয়তো খুনজখমও হয়েছিল কেউ কেউ। সেবারই পুলিশ ধরেছিল দাদুকে। জেলও হয়েছিল দশ বছরের। অবশ্য পুরো দশ বছর জেল খাটতে হয়নি দাদুর। বন্দী থাকাকালীন সদাচারের পুরস্কারস্বরূপ কিছুদিন আগেই ছাড়া পেয়েছিলেন।

—এসব তুই কার কাছে শুনেছিস?

—ঠাকুমার কাছে।

—তোর বাবা জানেন?

—সবাই সব কিছু জানে। প্রথমে ঠাকুমা জানতেন না। সবে নতুন বউ হয়ে গিয়েছেন। তখন, কিন্তু কিছুদিন পরেই দাদুর এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের হাবভাব দেখে একটু একটু সন্দেহ হত তাঁর। জিজ্ঞেস করলে দাদু এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু সেই বড় নৌকো লুটপাট করবার পর ঠাকুমা সবই জেনে গেলেন। লজ্জায়, ঘেন্নায়, বাবাকে নিয়ে চলে গেলেন বাপের বাড়ি।

—সে কোথায়?

—গেঁওখালি। বাবা তখন নেহাৎ ছোট, —সাত-আট বছরের। ভাইদের বললেন, একে কোনো বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দে। ওখানে থাকলে ও মানুষ হবে না। বড় হয়ে সেই ডাকাতিই করবে। মামারা অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে হলদিয়ার মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন বাবাকে।

—ঠাকুমার সঙ্গে দাদুর আর দেখা হয়নি?

—হয়েছিল। দাদু জেল থেকে বেরিয়ে একদিন ঠাকুমাকে নিয়ে যাবার জন্য এসে হাজির হলেন।

—ঠাকুমা গেলেন?

—হ্যাঁ। তাঁর ভয় ছিল বাবার জন্যই। তার যখন একটা সুব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে, তখন আর তাঁর ফিরতে আপত্তি হয়নি। ফিরে এসে চাষবাসে মন দিলেন। ডাকাতির পয়সায় জমি-জিরেত করেছিলেন প্রচুর। তারপরই হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন, তাঁর ডান হাতের আঙুলগুলোয় সাড় নেই।

—সে কী?

—হ্যাঁ। তখন ওখানে হেলথ্-সেন্টার বা ডাক্তার-টাক্তার ছিল না। দাদু স্থানীয় এক কবরেজ-মশাই-এর কাছে গেলেন। তিনি দেখেই বললেন,—এ তো কুষ্ঠ হয়েছে তোমার। এ রোগের চিকিৎসা আমি করতে পারব না।

—তারপর?

—প্রথমটায় খুবই মুষড়ে পড়েছিলেন দাদু। শুধু বলতেন, এই হাতে অনেক মানুষের রক্ত লেগে আছে। কত নিরীহ লোকের সর্বস্ব লুট করেছি। সেই পাপেরই ফল। হয়তো ঠাকুমাও এ ধরণের কথাই বলতেন সর্বক্ষণ। কিন্তু শেষ অবধি তিনিই সাহস দিলেন দাদুকে। বললেন,—ভাইদের কাছে শুনেছি কুষ্ঠরোগের খুব ভালো ভালো ওষুধ বেরিয়েছে। সময়ে চিকিৎসা করালে এ রোগ সেরে যায়। চল আমরা শহরে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাই।

—তোর বাবা তখন কত বড়?

—বাবা তখন সবে ডাক্তারি পড়তে শুরু করেছেন। বাবাই শেয়ালদায় তাঁর বন্ধুর বাড়িতে একটা ঘরে ওঁদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। দাদুকে নিয়ে গিয়েছিলেন ট্রপিক্যালে।

—তারপর?

—চিকিৎসা চলল বেশ কিছুদিন। কয়েকমাস পরে ওষুধ-বিষুধ নিয়ে ওঁরা দেশে ফিরেও গেলেন। অবশ্য মাঝে মাঝে ওষুধ নিয়ে যাবার জন্য কলকাতায় আসতে হত তাঁকে। এবং অবশেষে দাদু রোগমুক্ত হলেন।

—মানে সেরে গেল অসুখটা?

—হ্যাঁ। ঠাকুমা ঠিকই বলেছিলেন—যথাসময়ে ঠিকমতো চিকিৎসা হলে কুষ্ঠ সেরে যায়। তবে বেশ দীর্ঘ সময় ধরেই চিকিৎসা চলেছিল তাঁর। কতদিন, ঠিক বলতে পারব না। তবে রোগটা তাঁর চিহ্ন রেখে গেল শরীরে। ডান হাতের অবশ আঙুলগুলো মুঠো পাকিয়ে গিয়েছিল। সেই রকমই রইল। দাদু মাঝে মাঝে কোলকাতায় এসে চেক-আপ করিয়ে যেতেন। ঠাকুমাও আসতেন সঙ্গে। ঠাকুমার মৃত্যুর পর সেটা ছেড়েই দিলেন। বাবা মাঝে মাঝে যেতেন। আমার আর যাওয়া হয়নি পড়াশোনার চাপে।

সন্টু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, —তুই সুন্দরবনের দেশে আসছিস শুনে যখন তোর সঙ্গ নিলাম, তখনও ভাবিতেই পারিনি—

সুরঞ্জন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—জানলে আসতিস না নিশ্চয়ই? সন্টু হেসে বলল—আসতাম না মানে? এসব জানবার পর তোর এই রহস্যময় ঠাকুর্দাকে দেখবার জন্য ঔৎসুক্য তো আরও বেড়ে গেল আমার।

সারেঙ রমজান মণ্ডল হাঁক দিলেন—দয়াদ্বীপ এসে গেল গো কর্তা।

খেয়াঘাটে সুরঞ্জনের বাবা দাঁড়িয়েছিলেন। সুরঞ্জন বলল—দাদু কেমন আছেন বাবা?

—ভালো নয়। জ্বর কমছে না এ্যান্টিবায়োটিক দিয়েও। বুকে সর্দি বসে গিয়েছে। কলকাতায় নিয়ে যেতে পারলে ভালো হত। কিন্তু বাবা কিছুতেই যাবেন না।

ঠার্কুদা চোখ বুজে শুয়েছিলেন। সুরঞ্জনদের সাড়া পেয়ে চোখ মেললেন। রুগ্ন কঙ্কালসার মুখ হলেও শরীরের কাঠামো দেখলে বোঝা যায় একসময়ে দশাসই চেহারা

ছিল। সুরঞ্জনকে দেখে বৃদ্ধের কোটরগত চোখ উজ্জ্বল হল। বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—এসেছ দাদুভাই? সুরঞ্জন তাঁর মুঠো পাকিয়ে যাওয়া ডান হাতখানাও টেনে নিয়ে বলল—তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। ঠাকুর্দা ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন,—আর আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন? এখন আমার যাবার সময় হল। তোমাদের একটা কথা বলবার জন্য শুধু কোনোমতে প্রাণটাকে ধরে রেখেছি।

সুরঞ্জনের বাবা একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন, বিশেষতঃ সন্টুর সামনে এসব কথা তাঁর ভালো লাগছিল না। তিনি বললেন, এখন এসব কথা থাক বাবা।

ঠাকুর্দা বললেন—না এরপর হয়তো আর সময় পাব না। দাদুভাই, খাটের নিচে একটা তোরঙ্গ আছে। সেটা বের করে খোলো তো।

তোরঙ্গটা টেনে বের করল সুরঞ্জন। তার ভেতরে অনেক পুরনো জামাকাপড়, শাড়ি,—বোধহয় ঠাকুমার। দাদু বললেন—একটা রেশমী কাপড়ে বাঁধা পুঁটলি আছে না? সেটা বের করো।

পুঁটলির মধ্যে একটা সোনার মটরমালা, একজোড়া মকরমুখো বালা, আটগাছা চুড়ি আর একজোড়া ঝুমকো। দাদু বললেন—এগুলো তোমার ঠাকুমার। বিয়ের সময় তাঁর বাবা দিয়েছিলেন তাঁকে। পুঁটলিতে আরও ছিল একজোড়া কানের মাকড়ি, আর ছোট্ট একছড়া হার। ঠাকুর্দা বললেন—একটা ফুলের মতো ছোট্ট খুকির গলা থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম হারটা। তার গলা ছড়ে গিয়েছিলে। মাকড়ি দুটো টেনে নিয়েছিলাম কান থেকে। কচি কচি কান দুটো কেটে ছিঁড়ে গিয়েছিল। সেই কান্না এখনও শুনতে পাই ঘুমের ঘোরে। খুকিটার নাম বোধহয় সোনা,—ওর মা বারবার বলেছিল—সোনাকে ছেড়ে দাও তোমরা, সোনাকে ছেড়ে দাও। খুকির বাবার নাম বোধহয় মহেন্দ্র সিং। আমাদেরই লাঠির ঘায়ে মাথা ফেটে গিয়েছিল তার। শুনেছি পরে হাসপাতালে মারা গিয়েছিল।

দাদু দম নেবার জন্য একটু থামলেন। তারপর বললেন— সে খুকি এখন কোথায় কেমন আছে জানি না। যদি খুঁজে বার করতে পারো—তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিয়ো। আর তোমার ঠাকুমার এই গয়নাগুলোও তাকেই দিয়ো। এগুলো পরিষ্কার। এতে কোনও রক্ত লেগে নেই।

ঠাকুর্দা প্রচণ্ড কাশতে লাগলেন। তার মধ্যেই বারবার বলতে লাগলেন—পারবে তো? তাকে খুঁজে বার করতে পারবে তো? সুরঞ্জন বলল—দাদু, আর কথা বলো না। আমরা ঠিক খুঁজে বার করব তাকে।

ঠাকুর্দা মারা গেলেন পরদিন ভোরেই। প্রতিবেশীরা অনেকেই এলেন। শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে করতে বিকেল হয়ে গেল।

সন্টু পরদিনই ফিরে গেল কোলকাতায়। সুরঞ্জন আর তার বাবা বাড়ি ঘর-দোরের একটু ব্যবস্থা করে পরদিন আসবেন। প্রতিবেশী দশরথ মণ্ডল তার নৌকো নিয়ে এল। ভট্‌ভটি নয়, পালতোলা—দাঁড়টানা নৌকো। বাসন্তী অবধি সে পৌঁছে দেবে। দাঁড় টানতে টানতে দশরথ বলল—আপনার আর বেড়ানো হল না। পরে যদি আবার আসেন, আপনাকে সজনেখালি, নেতি ধোপানির ঘাট, সব দেখিয়ে দেব। সন্টু বলল—শুনেছি এখানে আগে খুব ডাকাতি হত। এখনও কি হয়?

—ডাকাতি? দশরথ সতর্ক চোখে তাকাল। —না ডাকাতি এদিকে হয় না। জলপুলিশ আছে তো।

—আমাদের চেনা একজন,—নাম মহেন্দ্র সিং, ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন, সজনেখালি যাবার পথে।

—মহেন্দ্র সিং? আপনি চেনেন তাকে?

সন্টু বলল—না, না। আমার তখন জন্ম হয়নি। আমি আমার মার কাছে শুনেছি।

—আপনি কি সুতাহাটায় থাকেন?

—না তো। আমি কোলকাতায় থাকি। মহেন্দ্র সিং কি সুতাহাটার লোক?

—জানি না দাদা। দশরথ মণ্ডল আর একটিও কথা না বলে দাঁড় বাইতে লাগল।

বাড়ি ফিরতে বিকেল। জামাকাপড় পালটে পরিচ্ছন্ন হয়ে সন্টু যখন চায়ের টেবিলে বসেছে, তখন টিয়া ফিরল। টিয়া সন্টুর যমজ বোন। সন্টুর মতো সেও ইঞ্জিনীয়ার। আপাততঃ একটা কনস্ট্রাকশন কম্পানিতে কাজ করে। সন্টুকে দেখে একটু অবাক হয়ে বলল—কীরে? আজই ফিরে এসেছিস? এর মধ্যেই সুন্দরবন দেখা হয়ে গেল?

সন্টু বিমর্ষমুখে বলল—নৌকোয় যাবার সময় তীরঘেঁষা বাদাবন দেখলাম, গোলপাতার গাছ, আর অজস্র নাম না জানা পাখি। একজায়গায় একটা কুমিরও দেখেছিলাম। তীরে উপুড় হয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল।

—ব্যস্? আর সজনেখালি? পাখিরালয়? নেতি ধোপানি?

নাঃ, সে আর হল কোথায়? আমরা পৌঁছবার পরদিনই সুরঞ্জনের দাদু মারা গেলেন। ওরা রয়ে গেল। ওদের নানান কাজকর্ম আছে এখন। আমি চলেই এলাম। টিয়া বলল—যাঃ, এত করে ছুটি-টুটি নেওয়া বৃথা গেল। সন্টু চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, —একেবারে বৃথা যায়নি। এক প্রাক্তন দুর্ধর্ষ ডাকাতের সর্দারের সঙ্গে দেখা হল।

মা আঁৎকে উঠে বললেন—বলিস কী?

টিয়া বলল,—তার পাল্লায় কখন পড়লি? সন্টু হেসে বলল, বললাম না প্রাক্তন? তার সঙ্গে যখন দেখা হল, তখন তার অবস্থা খুবই করুণ। একেবারে শয্যাশায়ী। ডাকাতি করা তো দূরের কথা উঠে দাঁড়াতেই পারেন না।

—বাব্বা! মা কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন—খুব বাঁচা বেঁচে গেছিস।

টিয়া বলল—তা গল্পটা বলবি তো! সন্টু আড়মোড়া ভাঙল—আজ বড় ক্লান্ত রে! অতক্ষণ নৌকোয় পা গুটিয়ে ঠায় বসে,—তারপর বাসন্তী থেকে ভিড়ের বাস ধরে বালিগঞ্জ স্টেশন,—আর পারছি না। আগে একটু লম্বা হই। গল্পটা পরে হবে।

টিয়া অবশ্য বুঝল, সন্টু মার সামনে সব কথা বলতে চাইছে না।

পরদিন শনিবার। সন্টুর অফিস ছুটি। টিয়াদের অবশ্য শনিবার ছুটি থাকে না। একটু পরেই ওদের দুই ডাক্তার বন্ধু সঞ্জয় আর চন্দন এসে হাজির। ছুটি পেলেই ওরা চলে আসে এ বাড়িতে। আর আজ তো আসতেই হবে। সন্টু সকালেই ফোন করেছিল ওদের। টিয়া ওদের দেখে বলল—বাঃ, দুজনেরই অফ ডিউটি? ইস, আমার যদি ছুটি থাকত আজ!

সঞ্জয় বলল—তা, ছুটি করে নে না।

—দুর তাই হয়? তোরা তো সন্ধে অবধি আছিসই। আমি চলে আসব তিনটের মধ্যে। আজ তো হাফ।

চন্দন বলল, কী করে জানলি, সন্ধে অবধি আছি?

—বাবা মা তোদের দুপুরে মাছের-মাথা-দিয়ে লাউঘন্ট, সুক্ত, তেতো ডাল, ট্যাংরা মাছ আর বিকেলে চা-এর সঙ্গে লুচি-আলুর দম না খাইয়ে ছাড়বে নাকি?

সন্টু বলল, একটু বেশিক্ষণ না থাকলে রহস্যভেদ হবে কী করে?

বাবা জানালার সামনে বসে কাগজ পড়ছিলেন, বললেন—আবার কিসের রহস্য?

—আছে বাবা। এবার অপরাধী নয়, খুঁজে বার করতে হবে victim-কে। বলতে বলতেই ফোনের ক্রিং ক্রিং শব্দ। সন্টু রিসীভার কানে তুলতেই সুরঞ্জনের গলা ভেসে এল। সুজিত, আমরা কাল সকালে কলকাতা যাচ্ছি। সোমবার জয়েন করব। অফিসে একটু বলে দিস।

আর দাদু যে কাজের ভার দিয়ে গেলেন, সেটা একটু মনে রাখিস।

—সে কাজ তো তোর, আমি তো দর্শকমাত্র।

—দূর, আমি একা পারব কী করে, তোর সাহায্য ছাড়া?

—ঠিক আছে, তুই আয় তো।

সন্টু ফোন নামিয়ে রাখতে সঞ্জয় আর চন্দন দুজনেই বলল,—কী ব্যাপার রে?

—বলছে, তবে নাম-ধাম বলব না।

—আদ্যোপান্ত শোনার পর সঞ্জয় বলল, তোর বন্ধুর ঠাকুর্দা কিন্তু কয়েকটা ক্লু দিয়ে গিয়েছেন। সেই খুকিটির নাম সোনা। তার কানের লতি ছেঁড়া। গলায় ছড়ে যাওয়ার দাগ থাকতেও পারে। নাও থাকতে পারে। মেয়েটি পিতৃহীন। তার বাবার নাম মহেন্দ্র সিং।

চন্দন বলল, কিন্তু এখন সেই খুকি তো আর খুকিটি নেই। তার বয়েস এখন,—চন্দন সন্টুর দিকে তাকিয়ে বলল—কত হবে? সন্টু বলল—তা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ তো হবেই। সুরঞ্জনের বাবার বয়েসই তো তখন বছর আষ্টেক হবে। চন্দন মুচকি হাসল,—তোর বন্ধুর নাম তাহলে সুরঞ্জন?

—হ্যাঁ। বলে ফেললাম, না?

—তুই কতক্ষণ লুকিয়ে রাখবি আমাদের কাছে? সুরঞ্জনের বাবা কি ডঃ নিরঞ্জন হালদার?

—কী করে বুঝলি?

—বা, এটুকু বুঝব না? আমরা তো ওঁর ছাত্র। সুরঞ্জন নাম শুনেই বুঝেছি এ নিশ্চয় ডঃ নিরঞ্জন হালদারের ছেলে।

সন্টু বলল, আর একটা ক্ষীণ সূত্র আছে।

—কী?

—সূতাহাটা। ফেরার সময় নৌকোর মালিকের কাছে মহেন্দ্র সিং নামটা করাতে তিনি হঠাৎ বলেছিলেন—আপনি কি সূতাহাটায় থাকেন? কিন্তু তারপরই তিনি মুখে একেবারে কুলুপ আঁটলেন।

—সূতাহাটা? সঞ্জয় বলল, ওর কাছাকাছি আমার পরিচিত একজন থাকেন। আমার একজন দূরসম্পর্কের কাকা।

—তাই? সন্টু টানটান হয়ে বসল,—ওখানকার বাসিন্দা?

—আসলে হলদিয়া সেন্ট-জেভিয়ার্স-স্কুলে উনি পড়ান। এবং সেই সূত্রে ওখানেই থাকেন। উনি চৈতন্যপুর, সূতাহাটা, ওই অঞ্চলগুলো ঘুরে দেখেছেন। মাঝে মাঝে ফোনে কথা হয়। আমাদেরও বলেন ওখানে বেড়িয়ে আসতে।

—বাঃ, তাহলে তো—

সঞ্জয় সন্টুর উৎসাহে প্রায় জল ঢেলে দিয়ে বলল,—দ্যাখ্ আগামী দুটো উইক-এন্ডই আমি ছুটি নিতে পারছি না। তবে দেখা যাক। আগে ওঁর সঙ্গে কথা বলে দেখি।

টিয়া ফিরল ঠিক তিনটের সময়। পোশাক পালটে, চার কাপ কফি ট্রেতে সাজিয়ে এনে বলল—তোদের রহস্যভেদ হল? চন্দন কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল—তুই শুনেছিস?

—হ্যাঁ। কালই সন্টু রাতে খাওয়ার পর বলেছে সব। আচ্ছা, আমি একটা কথা ভাবছিলাম। খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলে কেমন হয়?

—কী বিজ্ঞাপন?

—এই ধর, বছর চল্লিশ আগে সজনেখালি যাওয়ার পথে ডাকাতের হাতে নিহত হন মহেন্দ্র সিং। তাঁর স্ত্রী-কন্যা সম্বন্ধে কারো কিছু জানা থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

—শুধু ঠিকানা? ফোন নম্বর নয়?

—না, না বাবা। আমরা তো অফিসে থাকব। মা-বাবা ক্রমাগত ফোন ধরতে ধরতে অতিষ্ঠ হবেন।

সন্টু বলল—মন্দ বলিসনি। চার বন্ধু মিলে তখনই বিজ্ঞাপনটার মুসাবিদা করে ফেলল। খবরের কাগজের অফিসে দিয়েও এল সন্ধ্যাবেলায়।

দিনকয়েক পরে এক সন্ধ্যায় কলিং বেল শুনে টিয়া খুলে দিল দরজা। ডঃ নিরঞ্জন হালদার নেমে এলেন গাড়ি থেকে। পায়ে হাওয়াই চটি। চুল অগোছালো, না-আঁচড়ানো। পরনে সাদা থান, গায়ে উত্তরীয়। বগলে কম্বলের আসন। সঙ্গে সুরঞ্জনও রয়েছে। ডাঃ হালদার সন্টুর হাতে একটা চিঠি দিয়ে বললেন, সুজিত, সামনের বুধবার আমার বাবার কাজ। তুমি অতি অবশ্য আসবে।

সন্টু একটু লজ্জিত হয়ে বলল—নিশ্চয়ই যাব। তবে আপনি এত ব্যস্ততার মধ্যে নিজে না এসে অফিসে সুরঞ্জনের হাতে চিঠি পাঠিয়ে দিলেই পারতেন।

—তাও কি হয়? পিতৃদায় তো আমার। আর তুমি তো শ্মশানবন্ধু। সন্টু বাবা-মা আর টিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে, বললেন—আপনারাও যদি যান, খুব খুশি হব। তারপর টিয়াকে বললেন—তুমিও যেও মা।

ওঁরা বিদায় নিতেই সঞ্জয়ের ফোন এল, সন্টু, একটু আগে চুনিবাবু ফোন করেছিলেন। এর আগে ওঁর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল। উনি বললেন, সূতাহাটা বা তার কাছাকাছি অঞ্চলগুলোয় উনি খোঁজখবর করেছিলেন। ওখানে মহেন্দ্র সিং নামে কেউ কোনোকালে ছিল কিনা

কেউ বলতে পারল না। তোরা বিজ্ঞাপনের কোনো উত্তর পেলি? সন্টু সংক্ষেপে বলল—এখনও পর্যন্ত না।

—আমার মনে হয় আসবেও না। অতদিন আগের ব্যাপার!

বুধবার টিয়ার অফিস ছিল। কিন্তু অফিস থেকে ছুটি নিয়ে টিয়াও গেল সন্টুর সঙ্গে। বলল—ডাকাতের সর্দারকে একবার দেখবার এই সুযোগ কি আর আসবে? সন্টু অবাক হয়ে বলল—তাকে কোথায় পাবি ওখানে?

—বা, আজ শ্রাদ্ধবাসরে তার একটা ফটো নিশ্চয়ই থাকবে?

ডাক্তারের বাড়ি। কাজেই বহু ডাক্তার এসেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে। চন্দন আর সঞ্জয়ের সঙ্গেও দেখা হল। ওরা ডাঃ হালদারের ছাত্রই শুধু নয়,—ওঁর সহকর্মীও। একজন খুবই সম্ভ্রান্ত আর অভিজাত চেহারার মহিলা সন্টুর হাত থেকে মালার মোড়ক নিয়ে ফটোতে মালা পরিয়ে দিলেন। সন্টু ভেবেছিল উনি হয়তো সুরঞ্জনের মা। কিন্তু না। সুরঞ্জনের মা তখন ওর বাবার সঙ্গে শ্রাদ্ধবাসরে কাজে বসেছেন। চন্দনকে জিজ্ঞেস করতে ও বলল—উনি তো রিনাদি। চাইল্ড-স্পেশালিস্ট। দারুণ ভালো মহিলা। টিয়া নিচু গলায় সন্টুকে বলল—ভদ্রমহিলার গলায় একটা কাটা দাগ আছে।

ডাঃ রিনা মল্লিক নিজেই এসে আলাপ করলেন—তোমাদের দুই ভাইবোনের কথা এদের মুখে খুব শুনেছি। তোমরাই তো চার রহস্যভেদী, তাই না?

চন্দন বলল—আপনার হাতে কোনো রহস্য-টহস্য আছে নাকি? মহিলা হাসলেন,—না বাবা আমার কোনো রহস্য নেই। আমি নিতান্তই সাদা-মাটা মানুষ। তবে একটা ব্যাপারে একটু সমস্যায় পড়েছি।—কী সমস্যা?

—আর বোলো না। সেদিন পাসপোর্ট অফিসে গিয়েছিলাম দুটো ফর্ম আনাবার জন্য। গিয়ে দেখি, বাপরে, কী যে লম্বা লাইন—সাপের মতো এঁকেবেঁকে সে আর কী বলব! এদিকে আমার তো চেম্বার আছে চারটে থেকে। শেষটায় তিনটে অবধি দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলাম।

সুরঞ্জন বলল, রিনামাসি, বাইরে যাচ্ছ নাকি? কবে?

—কবে যাচ্ছি, জানি না রে। তবে ছেলেটা ক-মাস আগে চলে গেল এফ-আর-সি-এস করবে বলে। তাই ভাবছি, আমরাও পোসপোর্টটা করিয়ে রাখি। ওর বাবা তো সারাক্ষণ অফিস নিয়েই ব্যস্ত। যা করবার আমাকেই করতে হবে।

টিয়া বলল—আপনি কোনো ট্র্যাভ্‌ল্‌-এজেন্টকে বলছেন না কেন? আপনার মতো ব্যস্ত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে লাইন দেওয়া।

—কিন্তু আমি তো কাউকে চিনি না ভাই। আমার ছেলে তো ওর বন্ধুদের সঙ্গে একসঙ্গে মিলে কবে যে পাসপোর্ট করল, আমাদের জানায়ওনি পাছে আমরা না যেতে দিই।

—আপনি যদি চান, আপনাকে আমরা নিয়ে যেতে পারি একজনের কাছে। মিঃ এ. কে. ঘোষ, আমার বাবার বিশেষ বন্ধু। খুবই হেল্পফুল।

—চাইব না কেন? তোমরা যদি নিয়ে যাও, তাহলে তো খুবই ভালো।

শনিবার সকালেই ডাঃ রিনা মল্লিককে সন্টু নিয়ে গেল ট্রাভেল এজেন্ট মিঃ এ-কে-ঘোষের কাছে। তিনি প্রথমেই বলে দিলেন পাসপোর্ট সাইজ ফোটো সমেত আর কী কী কাগজপত্র ফর্মের সঙ্গে জমা দিতে হবে। তারপর দুটো ফর্ম এগিয়ে দিয়ে বললেন—একটা ফর্ম বরং আমি ভরেই দিই। যেখানে আপনার সই করতে হবে সেখানে চিহ্ন দিয়ে দিচ্ছি।

ফর্মে ওঁর নাম লিখতে লিখতে মিঃ ঘোষ বললেন—আপনার কোনো আইডেনটিফিকেশন মার্ক, মানে দেহে বিশেষ কোনো চিহ্ন আছে, যাতে আপনাকে চেনা যায়? রিনা মল্লিক হেসে বললেন—তার কোনো অভাব নেই। গলার একটা কাটা দাগ,—তবে এই স্কার মার্কটা খুব হালকা। বরং আমার দুটো কানেরই লতি ছেঁড়া,—Torn ear-lobes—এটাই লেখা ভালো।

সন্টু স্থির হয়ে তাকিয়েছিল মহিলার দিকে। তাঁর কথা শেষ হলে বলল—রিনাদি, আপনার বাবার নাম কী ছিল?

—ছিল কেন? বাবা তো এখনও আছেন।

—আছেন?

—হ্যাঁ। বাবা-মা দুজনেই আছেন। বাবার নাম রণেন্দ্র সেন।

সন্টু অবাক হয়ে বলল—রণেন্দ্র? মহেন্দ্র নয়?

—মহেন্দ্র সেন আমার কাকা। তিনি অবশ্য নেই। তাঁর কথা আমার বিশেষ মনে নেই। তিনি তো বিয়ে-থা করেননি, কাজেই আরোই মনে নেই তাঁর কথা। কাকা সূতাহাটায় থাকতেন। বোধহয়, ওখানেই কোনো ব্যবসা ছিল তাঁর।

—মহেন্দ্র সেন? সিং নয়?

—নাঃ। সিং হবে কেন? আমার বাপের বাড়ি সেনগুপ্ত। অবশ্য গুপ্তটা ওঁরা লেখেন না।

ফেরার সময় গাড়িতে বসে সন্টু বলল—রিনাদি, আপনি আমাকে অবাক করে দিয়েছেন। গত ক-দিন ধরে আমরা আপনাকেই খুঁজছি। আমরা মানে সুরঞ্জন আর আমরা। কিন্তু কে জানত, সেই আপনি আমাদের এত কাছে রয়েছেন? খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, সঞ্জয় সূতাহাটায় খোঁজ নিয়েছে।

ডাঃ মল্লিক অবাক হয়ে বললেন—কী ব্যাপার বলো তো?

সন্টু বলল—আমাদের কাছে অবশ্য একটা ভুল খবর ছিল। আমরা জানতাম, সেই ফুলের মতো ফুটফুটে খুকির বাবার নাম মহেন্দ্র সিং। আর সেই খুকির নাম সোনা। সত্যিই কি আপনার নাম সোনা?

রিনা মল্লিক বললেন—আমার মা আমাকে সোনা বলে ডাকেন। কিন্তু তুমি কার কাছে শুনলে?

—এক মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের কাছে। মহেন্দ্র সেন নয়, তিনি বলেছিলেন মহেন্দ্র সিং। হয়তো আমরাই ভুল শুনেছিলাম। কিংবা তিনিই ভুল জানতেন। আর তাঁর ধারণা ছিল—তাঁর লাঠির ঘায়ে আহত হয়ে যাঁর মৃত্যু হয়েছিল—তিনিই সেই খুকির বাবা।

—কিন্তু সেই বৃদ্ধ কে, সুজিত?

—সে কথা আমি বলব না রিনাদি। যাদের বলবার তাঁরাই বলবেন।

পরদিন সকালেই ফোন এল সুরঞ্জনের—সুজিত, বাবা-মাকে সব জানিয়েছি পারলে বিকেলে একবার আয়। রিনামাসিও থাকবেন।

বিকেল পাঁচটা। ডাঃ নিরঞ্জন হালদারের বসবার ঘরে উপস্থিত রয়েছেন, —তিনি স্বয়ং, সন্টু, সুরঞ্জন, তার মা আর ডাঃ রিনা মল্লিক। ডাঃ হালদার ইচ্ছে করেই আর কাউকে ডাকেননি। সুরঞ্জন একটা রেশমী কাপড়ে বাঁধা পুঁটলি খুলে বলল,—রিনামাসি, এই কানের মাকড়িজোড়া তোমার কান থেকে,—আর এই হার তোমার গলা থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন আমার ঠাকুর্দা। তারপর থেকে প্রতিদিন তোমার কান্না শুনে তাঁর ঘুম ভেঙে যেত। মৃত্যুর আগে তিনি আমাকে হাত ধরে অনুনয় করেছিলেন যেন আমি তোমাকে খুঁজে বের করে তোমার জিনিস তোমাকে ফিরিয়ে দিই। আর ঠাকুমার এই গয়না—হার দুল, বালা, চুড়ি এসবই তিনি তোমাকে দিতে বলেছেন।

ডাঃ রিনা মল্লিক কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন—আমি তো বেশি কিছু হারাইনি। আর যাঁকে হারিয়েছি তাঁর কথা কিছুই মনে নেই আমার। কিন্তু তোমার ঠাকুর্দার শেষ জীবনে শান্তি বোধহয় একেবারেই ছিল না। তিনি তো যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্তই করলেন।

এবার কথা বললেন সুরঞ্জনের মা। বললেন—রিনাদি, তবু আপনি এগুলো নিন, যদি সত্যি পরলোক বলে কিছু থাকে, তাহলে হয়তো তাঁর আত্মা একটু শান্তি পাবে। রিনা উঠে দাঁড়িয়ে রেশমী কাপড়ে জড়ানো সুরঞ্জনের ঠাকুমার গয়না ওর মার হাতে দিয়ে বললেন,—বৌদি, এ তো তোমার শাশুড়ির জিনিস। এগুলো রেখে দাও সুরঞ্জনের বউ-এর জন্য। ওর ঠাকুমাও নিশ্চয়ই তাই চেয়েছিলেন। শুধু ওই ছোট্ট মাকড়ি আর হারছড়াই আমাকে দাও।

ছবি: সুদীপ্ত দত্ত

সোনালী ফাঁদ

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

।। এক ।।
(বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা)

রীতিমতো হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলেন ইন্সপেক্টর রঙ্গলাল তলাপাত্র। ঢুকেই সামনের সোফাটায় ধপ করে বসে বললেন, —এবার মশাই হাতে হাতে প্রমাণ। ঘুঘুকে এবার ফাঁদে ফেলবোই। বলেই যথারীতি নাক থেকে 'ফোড়ৎ' করে একটা আওয়াজ ছাড়লেন।

মেঘনাদ বললো,—তা, আপনার হাতে গরম প্রমাণটিকে ঘরের বাইরে দাঁড় করিয়ে এলেন কেন মিঃ তলাপাত্র? ভেতরে ডাকুন।

—হ্যাঁ, আসলে আমার এই শ্যালক দাদাটি খুবই লাজুক প্রকৃতির, কিছুতেই আসতে চাইছিলেন না। নেহাত আমার স্ত্রী অনেক করে বললেন, বলতে বলতেই রঙ্গলাল তলাপাত্র হাঁক দিলেন,—ভেতরে আসুন দাদা। চোখে না দেখেও আপনার উপস্থিতি রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজ টের পেয়ে গেছেন। অতএব আর দ্বিধা করে লাভ নেই।

ইনসপেকটর তলাপাত্রের ডাক শুনে তাঁর শ্যালক দাদা পরিচয়ে এবার যে ব্যক্তিটি ঘরে ঢুকলেন তাঁর বয়স বছর পঞ্চাশ হবে। রোগা হাড়গিলে টাইপের চেহারা, কিন্তু নাকের নীচে বিশাল একটা ঝাঁটা গোঁফ। দেখলেই বুকের ভেতরে একটা হাসি গুড়গুড়িয়ে ওঠে।

ভদ্রলোকের চালচলনও কেমন যেন ভীতু ভীতু। পরিচয়ের পর নামটা জানা গেল—নটবর চাকলাদার।

এবার আসল প্রসঙ্গে আসা যাক।

কিছুদিন যাবৎ কলকাতা শহরে এক নতুন উপদ্রব শুরু হয়েছে। পুলিশের কাছে মাঝে মাঝেই অভিযোগ আসছে—এক প্রতারক সস্তায় সোনার গুঁড়ো বিক্রি করার প্রলোভন দেখিয়ে শহরের বেশ কিছু সরল কিংবা লোভী প্রকৃতির মানুষকে স্রেফ চকচকে সোনার মতো দেখতে শস্তা কোনও ধাতব গুঁড়ো হাজার হাজার টাকায় বিক্রি করে তাকে প্রায় সর্বস্বান্ত করছে। কিন্তু এমন ক্যায়দায় সে প্রতারণার জাল বিছোচ্ছে যে কিছুতেই তাকে ধরা ছোঁয়া যাচ্ছে না।

তবু দিন কয়েক আগে এমন একটা অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ইনসপেকটর রঙ্গলাল তলাপাত্র নিজে পুলিশ ফোর্স এবং সেই প্রতারিত মানুষটিকে নিয়ে যাদবপুর রোডে সেই প্রতারকের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফ্ল্যাটের প্রতি ইঞ্চি তল্লাসী করেও সেখানে কোনও আপত্তিজনক দ্রব্য পাওয়া যায়নি।

তবু রঙ্গলাল তলাপাত্র হাল ছাড়বার পাত্র নন। তিনি রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজকে সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়েছেন এবং নিজে তক্কে তক্কে থেকেছেন সুযোগের অপেক্ষায়। ইতিমধ্যে নানা সূত্রে তিনি খবর নিয়েছেন, মাসকয়েক যাবৎ গুজরাট থেকে এই শহরে এসে ওঠা ওই সুকান্ত মেহেতা লোকটি মোটেই ধোয়া তুলসীপাতা নয়। সে একজন উচ্চ শ্রেণীর প্রতারক। কিন্তু সে এমন ভাবে প্রতারণার ফাঁদ পাতে, সে ফাঁদ থেকে শিকার পালাতে পারে না। পরবর্তীকালে তাকে গ্রেফতার করার কোনও প্রমাণও পাওয়া যায় না।

তার প্রতারণার ধারাটা এই রকম—

প্রতারক শ্রীকান্ত মেহেতা আচার আচরণে প্রচণ্ড করিৎকর্মা। 'শিকার' চিনতে সে ভুল করে না। তারপর সেই লোভী শিকারটির কাছে নিজের পরিচয় দেয় 'এক্সপোর্ট ইমপোর্টের' একজন ব্যবসাদার হিসাবে। বলে, সম্প্রতি সে নেপাল থেকে কিছু 'সোনার গুঁড়ো' নিয়ে এসেছে, তা গোপনে সস্তায় বিক্রি করে দিতে চায়। শিকার ফাঁদে পা দিলে তাকে সে নিয়ে যায় তার যাদবপুরের ভাড়া করা ফ্ল্যাটে। সেখানে সে দেখায় সেই ঝকঝকে সোনালী পালিশ করা ধাতব চূর্ণ, যা সোনা বলেই মনে হয়। তারপর শ্রীকান্ত মেহেতা তার শিকারের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য এক মোক্ষম চাল চালে—সে তার শিকারকে 'সোনার গুঁড়ো' দেখানোর সময় হাতের কায়দায় সত্যি একটা সোনার গুঁড়ো তাকে দিয়ে বলে, এই জিনিসটা আপনার স্যাকরাকে দিয়ে যাচাই করিয়ে দেখে আসুন এগুলো সত্যি সোনা কিনা। এ সময়ের মধ্যে বাকি সোনার গুঁড়োগুলো এই বাক্সে ভালোভাবে প্যাক করে সিল করে দিচ্ছি। আপনি এতে স্বাক্ষর করে যান। এরপর আপনি সোনা যাচাই করে ফিরলে তখন আপনার সামনে সিল খোলা হবে। তবে বুঝতেই পারছেন পুরো ব্যাপারটা গোপনীয়। কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না।

এভাবেই প্রতারক তার লোভী শিকারকে ফাঁদে ফেলে তাকে সর্বস্বান্ত করে ঝুটো সোনালী গুঁড়ো হাজার হাজার টাকা বেচে দেয়। এরপর সে যখন সেই সব গুঁড়ো দোকানে নিয়ে গিয়ে দেখায়, আসল সত্যিটা বুঝতে পারে। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। প্রতারককে ধরবারও কোনও প্রমাণ নেই।

গত মাসখানেক যাবৎ এরকমই প্রতারণা কাণ্ড চলছে এ শহরে। যেহেতু এই কেনা-বেচার পুরো ব্যাপারটাই বেআইনি, তাই লোভি প্রতারিতরা সহজে পুলিশের কাছে যেতেও পারে না। কিন্তু তবু শ্রীকান্ত মেহেতোর প্রতারণা কাণ্ডের খবর পুলিশের কাছে পৌঁছেছে। এবং সে কারণেই এক প্রতারিতকে সঙ্গে নিয়ে ইনসপেকটর রঙ্গলাল তলাপাত্র নিজস্ব উদ্যোগে গিয়েছিলেন যাদবপুরে শ্রীকান্ত মেহেতোর ভাড়া করা ফ্ল্যাটে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

এবার তিনি মোক্ষম প্রমাণ সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজের কাছে। এবারের শিকার স্বয়ং রঙ্গলাল তলাপাত্রের মাসতুতো শ্যালক নটবর চাকলাদার।

যাকে বলে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

আজ সকালে ইনসপেকটর তলাপাত্র যখন ওঁর শ্যালকদাদাকে নিয়ে মেঘনাদের বেলতলার ফ্ল্যাটে এসে ঢুকলেন, তখন আমি আর মেঘনাদ সেখানে বসে এই ব্যাপারটা নিয়েই আলোচনা করছিলাম।

ইতিমধ্যে দীননাথ আমাদের সকলের জন্য ধূমায়িত চায়ের কাপ আর পাকোড়ার প্লেট রেখে গেছে।

রঙ্গলাল তলাপাত্র নাক দিয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ফোড়ৎ আওয়াজটা করে একপিস পাকোড়া মুখে তুলে বললেন, —এবার আর বাছাধন রেহাই পাবে না। একেবারে ফাঁদ পেতে ধরবো।

মেঘনাদ কোনও জবাব দিল না। নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে লাগলো।

আমি বললাম,—আর আগে জানতে ইচ্ছে করছে আপনার শ্যালক দাদা সেই প্রতারকের সোনালী ফাঁদে পা দিলেন কী করে?

—'সোনালী ফাঁদ!' কথাটা ভালোই বলেছেন অর্ণববাবু। নটবরদা, ব্যাপারটা আপনিই বলুন না?

নটবর চাকলাদার এবার আমতা আমতা করে শোনালেন এইঃ

—আমার বাড়ি জয়নগরে। বড়বাজারে ঝোলাগুড়ের একটা আড়ত আছে আমার। সেখানেই লোকটা এসেছিল ব্যবসার কথা বলতে। এ কথা সে কথার পর লোকটা তার আসল কথা পাড়লো—একদম ওর যেমন টেকনিক সেইভাবে।

—অর্থাৎ সোনার গুঁড়োর গল্প। হাত সাফাই করে একটা সত্যি সোনার গুঁড়ো হাতে দিয়ে বাকিটা একটা বাক্সে সিল করে রেখে আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে তার কাছে রাখা, তাই তো? আমি বললাম।

—ঠিক তাই। সত্যি বলতে কি অর্ণববাবু, লোভেই পড়ে গিয়েছিলাম। যে সোনার গুঁড়োর বাজার দাম কমসে কম লাখ টাকা, তা মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকায় হাতে পাওয়া....

—কিন্তু খবরটা আমার মামাতো বোনের কাছ থেকে পেয়ে আমি ছুটে গিয়ে এই নটবরদাকে বাধা দিয়েছি। ওর ফাঁদে পা দেবেন না, বরং আপনাকে নিয়েই আমরা ফাঁদ পাতবো।

—হ্যাঁ। কথায় বলে 'বিষে বিষক্ষয়'। ফাঁদে ফাঁদ কাটানো। এবার আমাদের তাই করতে হবে মিঃ তলাপাত্র। এতক্ষণ বাদে কথা বলল মেঘনাদ।

—আপনার কথাটা ঠিক বুঝলাম না। ইন্‌সপেকটর তলাপাত্র নাক দিয়ে ফোড়ৎ আওয়াজটা করে মেঘনাদের দিকে তাকালেন।

—তবে শুনুন আমাদের গেম প্ল্যান।

এরপর মেঘনাদ শুরু করলো তার সোনালী পরিকল্পনার কথা বলতে।

।। দুই ।।
('হরিহরণ লস্যি বানা')

পরদিন সকাল ঠিক দশটা।

যাদবপুরের 'পঞ্চবটি' আবাসনের দোতলার দক্ষিণের ফ্ল্যাটটার ডোর-বেল টিপলেন নটবর চাকলাদার। পেছনে আমি।

আমাকে অবশ্য এই মুহূর্তে চেনবার উপায় নেই। মাথার মাঝখানে সিঁথি। চশমার ফ্রেমও পালটেছি। সেই সঙ্গে মেক-আপের সাহায্যে মুখের চেহারাও খানিকটা বদলেছে।

'আই-হোল' এ নটবরবাবুকে দেখে নিয়ে দরজা খুলে যে মানুষটা দাঁড়ালো, দেখে মনে হলো নিপাট ভালমানুষ। বছর পঞ্চাশ বয়স। গোলগাল চেহারা। মাথা জোড়া টাক। মুখে এক গাল আপ্যায়নের হাসি।

—আসুন মিঃ চাকলাদার। আমি জানতাম আপনি আসবেন। এক লক্ষ টাকার সোনার গুঁড়ো পাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকায় কেনার সুযোগ একমাত্র 'বুড়বাক' ছাড়া কেউ ছাড়তে পারে না, বলতে বলতেই আমার দিকে তাকিয়ে

তার ভ্রূ কুঁচকে গেল,—ইনি কে? এঁকে তো সেদিন দেখিনি।

—ইয়ে—আমার কাজিন ব্রাদার। হলধর পরামানিক। বড়বাজারে শুঁটকিমাছের ব্যাবসা।

—অঃ। কিন্তু মিঃ চাকলাদার, আপনাকে আগেই বলেছিলাম আমাদের এ ডিলটা খুবই সিক্রেট, মানে...

—না, না, একে বিশ্বাস করতে পারেন। আমার খুবই অনুগত। তাছাড়াও নিজেও আপনার সঙ্গে এই ব্যবসাটা করতে চায়।

ওরা যখন কথা বলছে, আমি এক নাগাড়ে হেঁ হেঁ করতে করতে হাত কচলে চলেছি।

শ্রীকান্ত মেহেতা আমার দিকে একবার অর্ন্তভেদী দৃষ্টি হেনে বললো,—ভেতরে আসুন।

আমরা গিয়ে বসলাম তার ফ্ল্যাটের ডাইনিং-কাম-ড্রয়িং রুমটাতে। শ্রীকান্ত মেহেতার কাজের লোক আমাদের চা দিয়ে গেল। তার কুতকুতে চোখের চাউনি দেখে মনে হলো লোকটা মোটেই সুবিধের নয়।

কথায় কথায় শ্রীকান্ত মেহেতা জানালো মাস দুয়েক হলো সে কলকাতায় এসে এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়ে উঠেছে। এখানে একমাত্র সঙ্গী ওই কাজের লোক হরিহরণ। তার ইচ্ছে কিছুদিন বাদে এখানেই একটা ভালো ফ্ল্যাট কিনে পাকাপাকি ব্যবসা করবে। তখন গুজরাট থেকে বউ ছেলে মেয়েকে নিয়ে আসবে। বলতে বলতে প্রসঙ্গ পালটে শ্রীকান্ত মেহেতা বললো, তা, আমার দেয়া গুঁড়োটা আপনার সোনার দোকানে যাচাই করেছেন তো?

—হ্যাঁ, মেহেতা সাব। সোনা একেবারে পাক্কা, নটবর চাকলাদার নিঁখুত অভিনেতার ভঙ্গিতে বললেন, তা আমার সই করে সিল করা সোনার গুঁড়োর বাক্সটা...

—আছে মশাই আছে, আপনি ঠিক যেমনভাবে রেখে গিয়েছিলেন, সুকান্ত মেহেতা গদগদভাবে আরও কী বলতে যাচ্ছিল তার আগেই মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো...

তারপর মাত্র কয়েক সেকেন্ড ওপ্রান্তের কথা শুনেই শ্রীকান্ত মেহেতার এতক্ষণের ভাবভঙ্গি সব পালটে গেল। ফোন অফ্ করে শ্রীকান্ত মেহেতা আমাদের দিকে তাকিয়ে চোখ লাল করে বললো,—আপনারা আমার কাছে দিল্লেগী করতে এসেছেন? আপনারা তো পুলিশের টিকটিকি....।

নটবর চাকলাদার এবার বেশ নার্ভাস হয়ে গেছেন মনে হলো। অতএব আমিই বললাম,—একী বলছেন মিঃ মেহেতা। আমার দাদার সঙ্গে আপনার 'সিক্রেট ডিল' হয়েছে। দাদা তো টাকা নিয়েই এসেছে, আপনি যা চেয়েছেন...

—আরে কেটে পড়ুন মশাই। ওসব চালাকি আমায় দেখাবেন না। আমার কাছে কোনও সোনা নেই।

বুঝলাম এইমাত্র মোবাইল ফোন মারফৎ বাইরে থেকে কেউ শ্রীকান্ত মেহেতাকে সতর্ক করে দিয়েছে। আমাদের ফাঁদও টের পেয়ে গেছে।

—কী হলো মশাইরা? এখনও বসে রয়েছেন! যান বলছি...নৈলে...

—নৈলে কী করবেন, পুলিশ ডাকবেন তো? পুলিশ না ডাকতেই আপনার ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছে দেখুন...

বলতে বলতে এবার ঘরে ঢুকলো রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজ, ইনসপেকটর রঙ্গলাল তলাপাত্র এবং দুজন কনস্টেবল।

—আরে আপনি! সেই পুলিশ সাহেব! আবার এসেছেন? কী চান? শ্রীকান্ত মেহেতা এবার উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়।

—আমাকে যখন চিনতেই পেরেছেন, তখন বোঝা উচিৎ আমরা কী চাই, বলতে বলতে ইনসপেকটর তলাপাত্র ফোড়ৎ আওয়াজটা ছেড়ে বললেন, আমরা আপনার ফ্ল্যাটটা আর একবার তল্লাসী নিতে চাই। আমার কাছে সার্চ ওয়্যারেন্ট আছে।

এবার একটু যেন থমকে গেল শ্রীকান্ত মেহেতা। কুতকুতে চোখে তাকিয়ে বললো,—ইনসপেকটর সাহাব, কেন বার বার এসে আমায় মিথ্যে হয়রান করছেন? সেদিন তো তল্লাসী নিলেন। বে-আইনি কিছু পেলেন? তার চেয়ে বসুন, একটু খানাপিনা করুন...

বলতে বলতে হঠাৎ শ্রীকান্ত মেহেতা চেঁচিয়ে উঠলো, —আরে হরিহরন, লস্যি বানা।

তার এই হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠাটা আমার কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগলো, মেঘনাদের ভ্রূ দুটোও কুঁচকে গেছে দেখলাম।

ইনসপেকটর তলাপাত্র কিন্তু ওই চিৎকার শুনে হেসে উঠলেন,—আরে মেহেতাজী, সেদিনও আমি তল্লাসী চালাতে এসে আপনার চাকরকে হেঁকে লস্যি বানাতে বলেছিলেন। কিন্তু আমিতো বলেইছি কোথাও তল্লাসী চালাতে গিয়ে আমি সেখানে কিছু খাই না। এখন আমায় কাজ করতে দিন। আসুন মেঘনাদ বাবু।

—আপনিই শুরু করুন, তারপর আমি দেখছি। একথা বলে মেঘনাদ চুপচাপ একটা সোফায় বসে রইলো। আমি

একটু অবাক না হয়ে পারলাম না। সে কথা মেঘনাদকে জিগ্যেস করতে ও চুপি চুপি বললো, অর্ণব, আমার ধারণা তল্লাসী চালিয়ে এবারও ব্যর্থ হবেন ইনসপেকটর তলাপাত্র।

মেঘনাদের এ অনুমানের কারণটা তখন ঠিক বুঝলাম না। তবে ওর ভাবগতিক বরাবরই রহস্যময়।

।। তিন ।।

(টেপরেকর্ডার)

মেঘনাদ কিন্তু যা বলেছিল তাই হলো। সারা ফ্ল্যাট তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনও সোনালী গুঁড়ো পাওয়া গেল না। অথচ আমি স্থির নিশ্চিত, ওই চূর্ণ বস্তুটা এই ফ্ল্যাটেই আছে, কারণ একটু আগেই নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে সেটি এই ফ্ল্যাটে বসেই নটবর চাকলাদারের হাতে তুলে দেবার সব ব্যবস্থাই পাকা করে রেখেছিল প্রতারক মেহেতো। এর প্রমাণও আমার কাছে মজুত আছে।

কথাটা আমি চুপি চুপি মেঘনাদকে বললাম। ও কোনও উত্তর দিল না। কী যেন ভাবছে।

শ্রীকান্ত মেহেতো তখন আমাদের উল্টোদিকের সোফাটায় বসে ধূর্ত হাসি হাসছিল। রঙ্গলাল তলাপাত্রের নাকাল অবস্থাটা সে বেশ উপভোগ করছে বলেই মনে হলো। ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললো, —বেকার এসব ঝুট ঝামেলায় আমাকে জড়াবার চেষ্টা করছেন ইনসপেকটর সাহাব। আমি তো বললাম, কোন দু-নম্বরী কারবার আমি করি না।

—তা বেশ তো, আপনার এক নম্বরী ব্যবসার সোনার গুঁড়োটাই এবার বার করে দেখান না মেহেতোজী, মেঘনাদ এবার মুখ খুললো।

—হ্যাঁ, সেটা যে আপনার কাছে আছে, সে প্রমাণ তো আমার কাছে এসেই গেছে, বলেই এবার আমি পকেট থেকে ছোট্ট টেপ রেকর্ডারটা বার করে একটু আগে ঘরে ঢুকে রেকর্ড করা শ্রীকান্ত মেহেতোর কথাগুলো শুনিয়ে দিলাম, বিশেষ করে যেখানটায় শ্রীকান্ত মেহেতোকে বলছে—"মিঃ চাকলাদার, আমি জানতাম আপনি আসবেন। এক লক্ষ টাকার সোনার গুঁড়ো মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকায় কেনার সুযোগ একমাত্র 'বুড়বাক' ছাড়া আর কেউ ছাড়তে পারে না..."

এবার যেন ম্যাজিকের মতো পাল্টে গেল শ্রীকান্ত মেহেতোর আচরণ। প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললো,—আপনাকে জানি না, কিন্তু আপনার কী রাইট আছে আমাকে এভাবে ব্ল্যাক মেইল করার?

উত্তরটা দিলেন ইনসপেকটর রঙ্গলাল তলাপাত্র। নাক থেকে ফোড়ৎ আওয়াজটা বার করে বললেন—আপনি ওঁকে চেনেন না, তাই এভাবে চ্যালেঞ্জ জানাবার সাহস পাচ্ছেন। উনি রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজ। উনি এসেছেন আমারই অনুরোধে আমায় এ কেসে সাহায্য করতে।

এবার আর কোনও কথা না বলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো শ্রীকান্ত মেহেতো।

মেঘনাদ বললো,—চলুন ইনসপেকটর তলাপাত্র। এবার আমিও একবার ফ্ল্যাটটা ঘুরে দেখি। আয় অর্ণব।

।। চার ।।

(লস্যি নাকি বিরিয়ানি)

ইনসপেকটর তলাপাত্র পুরো ফ্ল্যাটটাই তন্ন করে খুঁজেছেন, বিশেষ কোনও জায়গা বাকি রাখেননি—তবু মেঘনাদ কোনও কোনও জায়গায় চোখ বুলোতে বুলোতে এসে হাজির হলো ফ্ল্যাটের কিচেনে।

কিচেনের মধ্যে যা কিছু থাকে তা সবই রয়েছে। জ্বলন্ত গ্যাসের উনুনে চাপান রয়েছে একটা মাঝারি সাইজের এ্যালুমিনিয়াম হাঁড়ি। কিছু একটা ফুটছে ভেতরে। মেহেতোর ভৃত্য হরিহরণ কিচেনের এককোণে একটা টুলে চুপচাপ বসে রয়েছে। আমাদের দেখে সে উঠে দাঁড়াল।

—ক্যা হরিহরণ, লস্যি বানায়া? মেঘনাদ হরিহরণের দিকে তাকাল।

—নেহি সাব। হরিহরণ কেমন যেন জড়সড় ভাবে বলে।

—এ ব্যাটা সারাক্ষণ রান্নাঘরে বসে কী করে? সেদিনও তল্লাসী চালাতে এসে দেখেছিলাম ব্যাটা রান্নাঘরে জড়ভরত হয়ে বসে রয়েছে। রান্না তো করে ছাই। সেদিনও গ্যাসের উনুনে শুধু ওই হাঁড়িটাই চাপান দেখেছি।

কথাটা শুনেই মেঘনাদ একবার চকিতে তাকাল ইনসপেকটর তলাপাত্রের দিকে, তারপর গ্যাস-ওভনে চড়ানো হাঁড়িটার দিকে। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়েই রইলো। তারপর ধীর কণ্ঠে হরিহরণকে জিগ্যেস করলো,—হরিহরণ, হাঁড়িতে কী রান্না চাপিয়েছ?

—ইয়ে....মানে....

—আরে মশাই, সোনা খুঁজতে এসে আপনাদের যদি ভুক লাগে তো বলুন, আপনাদের জন্যে বিরিয়ানি আনিয়ে দিচ্ছি। ও বাচ্যারাকে জিগ্যেস করে কী করবেন! শ্রীকান্ত মেহেতো পেছন থেকে বলে ওঠে।

মেঘনাদ কিন্তু নড়ে না। ওর দৃষ্টি গ্যাস-উনুনের ওপর সেই হাঁড়ির দিকে। হাঁড়িতে কিছু একটা ফুটছে। অল্প অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছে। মেঘনাদ হাঁড়িটার দিকে আর দুপা এগিয়ে

যায়। বাতাসে কী যেন শোঁকে। তারপর ইনসপেকটর তলাপাত্রকে বলে, আপনি হরিহরণকে বলুন উনুন থেকে হাঁড়ি নামাতে, আমি দেখতে চাই ওর ভেতরে কি সেদ্ধ করা হচ্ছে।

।। পাঁচ ।।

(হাটে হাঁড়ি ফাটলো)

না, এ্যালুমনিয়াম হাঁড়ি ফাটেনি, তবে উনুন থেকে হাড়ি নামিয়ে তল্লাশী চালাতেই তার মধ্যে পাওয়া গেল বেশ কিছুটা ধাতব চূর্ণ। কিছু কিছু চূর্ণের রঙ তখনও সোনালী।

অর্থাৎ এগুলো মেহেতার সোনালী ফাঁদের সেই সোনার রঙপালিশ করা ধাতব চূর্ণ।

চালাকিটা বোঝা গেল। পুলিশ এসে পড়তেই সেই সোনালী চূর্ণগুলো হাঁড়িতে ফেলে সেগুলো ফোটাবার হুকুম দেয় মেহেতা। নির্দিষ্ট উত্তাপে জলের সঙ্গে দ্রবণে সেই চূর্ণের সোনালী পালিশ উঠে প্রমাণ লুপ্ত হয়ে যায়। এর আগের বারে এ কাজে সে সফল হয়েছিল। আর এ কারণেই সে বারও ইনসপেকটর তলাপাত্র কিচেনে জ্বলন্ত গ্যাসের ওপর হাঁড়ি চাপানো দেখেছিলেন। কিন্তু সেবার তিনি কোনওরকম সন্দেহ করতে পারেননি। এবারে মেঘনাদ কিন্তু ধরে ফেলেছে প্রতারক মেহেতার ধূর্তজী। প্রথমতঃ 'হরিহরণ, লস্যি বানা'—এ হাঁকটা যে একটা সংকেত সেটা প্রথমেই মনে হয়েছিল মেঘনাদের। যেহেতু ইনসপেকটর তলাপাত্র বলেছিলেন এর আগেরবার তল্লাসীর আগেও মেহেতা এমন একটা হাঁক মেরে ছিল। দ্বিতীয়তঃ একটা হাঁড়ি কিচেনের গ্যাস ওভেনের ওপর চাপিয়ে রাখতে দেখে (এবং এটা আগের বারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি)। এতে মেঘনাদের সন্দেহ আরও তীব্র হয়। বাকিটা মেঘনাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কারসাজি।

।। ছয় ।।

(হাঁড়ি থেকে হাঁ-এর গহ্বরে)

ইনসপেকটর তলাপাত্র যেদিন প্রতারক শ্রীকান্ত মেহেতাকে রীতিমত কোমরে দড়ি বেঁধে লালবাজারের লক-আপে নিয়ে গিয়ে পুরলেন, তার দুদিন পরেই ওঁর শ্যালক নটবর চাকলাদার বিরাট একটা হাঁড়ি নিয়ে এসে হাজির হলেন মেঘনাদের বেলতলার ফ্ল্যাটে।

—এ হাঁড়িতে কী আছে? মেঘনাদ বেশ সন্দিগ্ধ স্বরে জিগ্যেস করলো।

—আপনার আর অর্ণববাবুর জন্যে মোয়া মেঘনাদবাবু। একেবারে খোদ জয়নগর থেকে। সেখানকার সেরা কারিগরের তৈরি টাটকা তাজা মোয়া...হেঁ...হেঁ...আপনারা যে ভাবে প্রতারকের খপ্পর থেকে আমার নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা বাঁচিয়েছেন...এটা গ্রহণ করলে কৃতার্থ হবো... হেঁ...হেঁ...হেঁ....

—বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! নটবর চাকলাদারের কথা শেষ হবার আগেই পেটুক মেঘনাদ হাঁড়ির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা আস্ত মোয়া সরাসরি চালান করে দিয়েছে তার 'হাঁ' এর গহ্বরে।

আমিই বা পেছিয়ে থাকি কেন!!

ছবিঃ ওয়াসিম হেলাল

শেষ

স্বনামধন্যদের সরস সমাচার

কবি গীতিকার-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন রসময় লাহা। এইবার তিনি কবিকে একটি আয়না উপহার হিসেবে পাঠান, সঙ্গে একটি কবিতা। সরল সেই কবিতাটি ছিল ঃ

(আমি) সারা দিন রাত তোমারে দেখিতে
রহিব হেলিয়া দেয়ালে
(তুমি) ঘুমভাঙা চোখ মুছিতে মুছিতে
মুখ দেখে যেও খেয়ালে।

“পীত চক্ষু”র রক্তচক্ষু

বলরাম বসাক

১-আলোর রহস্য

দরজায় ঠকঠক শব্দ। লোড্‌শেডিং চলছিল বলে ডোরবেলটা কাজ করছিল না। দীপঙ্করবাবু মোমবাতির আলোয় ফিজিক্যাল রিভিউ নামে একটা বিজ্ঞানের জার্নাল পড়ছিলেন। টর্চটা নিয়ে স্টাডি থেকে বেরিয়ে দরজা খুললেন, 'কে?'

'স্যার, আমি অন্বয়।'

'অন্বয়, কী ব্যাপার, এত রাতে?'

'স্যার, ওদিকে এক—একটা আলো', ঢোক গিলতে গিলতে বলল।

'আলো? এই লোড্‌শেডিং-এর মধ্যে আলো?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ স্যার, ঐ-ঐ দিকটা...' আঙুল তুলে উত্তর দিকটা দেখায়। টর্চের আলোয় উজ্জ্বল অন্বয়ের মুখ চোখ, যদিও ভীতু-ভীতু কাঁপুনিতে আচ্ছন্ন। কথা বলতে ওর গলার আওয়াজ আটকে যাচ্ছে, 'ঐদিকটায় স্যার এমনিতেই আলো থাকার সময়টাতেই প্রচণ্ড অন্ধকার, তার ওপর সারা এলাকা জুড়ে লোডশেডিং। কী থেকে যেন একটা তীব্র আলো তাড়া করছিল।'

'তাড়া করছিল? ঠিক কোনখানটায় বলতো?'

'উত্তর দিকটায়, খাল পেরিয়ে, পুকুর পেরিয়ে, উঠে যাওয়া পিচ্‌কলের পাঁচিলটার ওপারে।'

'এখন তো', কব্জির ওপর টর্চের আলো ফেলে দীপঙ্করবাবু ঘড়ি দেখলেন, 'এখন তো রাত দশটা প্রায় বাজে, এত রাতে তুই ওখানটায় কী করছিলি, ঐরকম নির্জন জায়গায়...?'

'বাংলা স্যারের কাছে পড়তে গেছিলাম। ভবানীপুরে। পরীক্ষা নিচ্ছিলেন তো। ফিরতে দেরী হয়ে গেল। টালীগঞ্জ ফাঁড়িতে হেভি জ্যাম। শর্ট কাট রাস্তা ধরেছিলাম গলিটলি দিয়ে, খাল পেরিয়ে পুকুর পাড় দিয়ে....। ইটভাটার ওদিকটায় জঙ্গল মাঠ থেকে কী জোরালো আলো আসছিল। ফোকাসের মতো ফেলেছিল মুখে চোখে। এত কড়া আলো, চোখ জ্বলে যাচ্ছিল স্যার। গাল কপাল যেন পুড়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আলোটা আমার পিছু নিয়েছিল। যেদিকে যাচ্ছিলাম সেদিকেই আলো ফেলছিল। এত ভয় করছিল, দেখলাম ডানদিকে ঢুকলে আপনার বাড়িটা কাছাকাছি পড়ে, তাই ছুটে চলে এলাম।'

'নার্ভাস হয়ে গেছিস। তোর বাড়ি যেন কোথায়?'

'সবেদা বাগান।'

'চল তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

বাইকটা সবে বের করেছেন দীপঙ্করবাবু, তক্ষুনি কারেন্ট এসে গেল। লোডশেডিং শেষ। দীপঙ্করবাবু হেলমেট পরে, বাইকের পেছনে অন্বয়কে বসিয়ে, বাইকে স্টার্ট দিয়ে বললেন, 'আমার টাস্কগুলো ঠিকঠাক করছিস তো...?'

'হ্যাঁ, স্যার, শুধু বাইনোমায়াল থিওরেমটা কোথায় যেন আটকাচ্ছে...'।

ততক্ষণে পুকুরপাড় এসে গেল। অন্বয় ভয়ে ভয়ে পুকুরের ওপারে জঙ্গল ভর্তি বিশাল মাঠের ডান দিকটায় মুখ ফেরায়। পরিত্যক্ত ভাঙা পিচ্‌কলের পাঁচিলের ওপারে তাকাল, 'ঐ-ঐ যে স্যার আলো', বলল অন্বয়। একটা ঘন লতাগুল্ম গাছ ভর্তি জঙ্গলের আড়ালে বাইকটা দাঁড় করালেন দীপঙ্করবাবু। ডালপালার ফাঁক ফোকরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন একটা তীব্র আলোর ফোকাসে সাদাটে ধোঁয়ার মতন লম্বাটে ধূলিকণাপুঞ্জ, এদিক ওদিক সরছে, আকাশে আলো ফেলছে। আবার নেভানোও হচ্ছে। আবার ফেলে সারা আকাশ সার্চ করা হচ্ছে। কারা এটা করছে জঙ্গল মাঠের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে, নাকি তারপরের ইট ভাটার সমতলে দাঁড়িয়ে? কেন করছে? কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। হঠাৎ অন্ধকার আকাশে তারাগুলোর মধ্যে একটা তারা যেন নড়ছে। সরছে। সেটার গায়ে আলোর ফোকাস লাগতেই, বোঝা গেল ওটা অনেক অনেক নীচে। একটা হলদে রঙের বস্তু। বস্তুটির চারদিক থেকে আলো ছড়াচ্ছিল বলে ওটাকে তারাগুলোর মধ্যে তারা মনে হচ্ছিল। বস্তুটা ক্রমে ক্রমে বড় হচ্ছে। মানে নামছে।

কী ডেনজারাস মশা রে বাবা। অন্বয় দু-চারটে মশা শব্দ করে মারতেই দীপঙ্করবাবু ফিস ফিস করে বললেন, 'আস্তে'।

'কিছু বুঝতে পারছেন স্যার?' ফিস্‌ফিস্ করে বলল অন্বয়।

'একটা হেলিকপ্টার মতন মনে হচ্ছে।'

'এখানে এই জঙ্গলের মাঠে—এখানে হেলিপ্যাড্ কোথায়?'

'রহস্যজনক...'

এবারে কপ্টারটা স্পষ্ট হল। খুবই ছোট 'শব্দহীন' কাগজের চরকি যেরকম ঘোরে, ঠিক সেইরকম পাখা হলদে বলের মাথায় বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে বটে কিন্তু শব্দটা খুবই ক্ষীণ। বলটার একদিকে ছোট্ট পুচ্ছমতন। তলায় দুটো ঘুঘুর মতো পা।

'ব্যাপারটা সুবিধের নয়। আর দেখে কাজ নেই। কপ্টার থেকে কেউ বায়নাকুলার রেঞ্জে আমাদের দেখে ফেলার আগেই আমাদের চলে যাওয়া বেটার।' বলেই দীপঙ্করবাবু অন্বয়কে পেছনে বসিয়ে বাইকে স্টার্ট দিলেন। প্রচণ্ড বেগে চলতে শুরু করে বাঁক নিয়ে পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরলেন, 'কক্ষনো পুকুর পাড় দিয়ে এত রাতে ফিরবি না।' বললেন চলতে চলতে।

অন্বয়কে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই দীপঙ্করবাবু ফের পুকুর পাড়ে এলেন। ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে বাইকটা দাঁড় করিয়ে রাখলেন। তারপর আরো খানিকটা এগিয়ে একটা নিরাপদ দূরত্বে, উঁচু একটা জমির ওপর উঠে গাছের গুঁড়িগুলোর ফাঁকে উঁকি মারলেন। কী দেখলেন? পুকুর পেরিয়ে জঙ্গল মাঠ পেরিয়ে, পরিত্যক্ত ভাঙা পিচকলের ভাঙা পাঁচিলের ওপারে—ইট ভাটার বিস্তৃত সমতল জমি। ঐখানে নেমেছে সেই কপ্টারখানা। খুবই ছোট। গোপনে নেমেছে ওটা। অন্ধকারে খুবই অস্পষ্ট দেখালেও, ওটার গা থেকে আলো ছড়িয়ে পড়েছে। আর জ্বলছে আরেকটু দূরে একটা দাঁড় করানো হলদে মারুতি গাড়ির হেড লাইট। এই দুদিকের আলো চারদিকের অন্ধকারের অস্পষ্টতা কমিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এতদূর থেকে খুদে ছায়া ছায়া লোকগুলো ঐখানে কী করছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

পুকুরপাড়ের উত্তর দিকটায় একটা বস্তি আছে। সেখানে অল্প কয়েকটা চালা ঘর আছে। বস্তিবাসীরা সবাই কি এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে! তাদের চোখের আড়ালে তো আর কপ্টারটা নামেনি। বস্তি থেকে কোনও কৌতুহলী লোকজন বেরিয়ে পড়ে কপ্টারটা দেখতে ভিড় করেছে কিনা এই অন্ধকারে চোখে পড়ছে না দীপঙ্করবাবুর। তাছাড়া বস্তিটাতে একটাও আলো জ্বলছে না। একেবারে নির্জন ছায়ার স্তূপ।

হঠাৎ বোঁ বোঁ শব্দ হতে শুরু করল। দূর থেকে একটা হাঁড়ির মতো লাগছে ওটাকে, ওটার মাথায় কাগজের চরকির মতো বোঁ বোঁ ঘুরছে চক্রবৎ পাখা। ওটা প্রচণ্ড বেগে ওপরে উঠে ক্রমে ক্রমে তারার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

নীচে হলদে মারুতির হেডলাইট জ্বলে উঠে নিভল। মনে হয় গাড়ির ভেতর থেকে আকাশে একবার ফোকাস ফেলে দেখে নিল। ফোকাসটা নীচে চারদিকে ঘুরিয়ে কিছু সার্চ করে দেখে নিল। তারপর নিবিয়ে ফেলল। গাড়ির হেডলাইট জ্বলে উঠল। চলে গেল গাড়ি আরো উত্তর দিকে—

২–S + H + O + ...?

পরদিন সকালবেলা দীপঙ্কর মর্ণিংওয়াকের মতন হাঁটতে হাঁটতে পুকুর পাড়ে এসে পড়লেন। তারপর ইতস্তত করেও থামলেন না। পুকুরের ধার ঘেঁষে চললেন। বিশাল বিস্তৃত পুকুর। লোকে বলে অশ্বাক্ষুরাকৃতি হ্রদ ছিল। এদিক-ওদিক শুকিয়ে বা খাদ বুজে, বা পাড় ধসে বা বর্ষায় জল জমে ওটা হয়ে গেছে বৃশ্চিক আকৃতির ঝিল। জলে টইটুম্বুর। পুকুরের পরে এক দিকে জল নিকাশী খাল অন্যদিকে জঙ্গলভরা মাঠ। মাঠ পার হতে মিনিট দশেক লাগল। মাঠে পায়ে চলার রাস্তা এঁকে বেঁকে বড় রাস্তার কাছে বস্তির দিকে গেছে। এদিকটায় রিক্সা চলারও রাস্তা হয়নি লোক বসতি নেই বলে। আসলে এখানে টিন-বক্স তৈরির কারখানা ছিল। উঠে গেছে অনেক বছর হল। জায়গাটা কোম্পানি ফেলে রেখে গেছে। মাঠের পরে পরিত্যক্ত পিচ্ কলের জমি। ওটার পেছনে পুরানো সরু গলির মতো রাস্তা আছে। রাস্তা আর কলের জমির মাঝখানে লম্বা ভাঙা পাঁচিল। এই পাঁচিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন দীপঙ্কর। অনেকটা হেঁটেছেন। ইটভাটা এখান থেকে ঠিক তার পাশেই। ইটভাটার জমি লালচে সমতল। তবে ইট তৈরির কাজও বন্ধ হয়ে গেছে। সবই বন্ধ হয়ে গেছে কারণ লোক এখানে থাকতে পারে না। দূর থেকে আসতেও পারে না, বাস রাস্তা নেই।

ভাঙা পিচকলের ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে। তার পাশ দিয়ে গাড়ির চাকার দাগ। এইখান দিয়ে কাল রাতে হলদে মারুতি এসে থাকবে, গিয়েও থাকবে। গাড়িটা ঐখান থেকে ইটভাটার সমতলক্ষেত্রে নেমে পড়েছিল, যেখান দিয়ে ট্রাক নামত। দীপঙ্কর গাড়ির চাকার দাগ ধরে ধরে ইটভাটার সমতল ক্ষেত্রে এসে দেখলেন কোনখানটায় কাল রাতে কপ্টারটা দাঁড়িয়েছিল। ল্যান্ডিং-এর সময় সমতল ক্ষেত্রটির নরম মাটিতে গভীর আঁচড়ের দাগ।

কাছেই একটা জুতো পড়ে আছে। জুতোর কাছাকাছি মাটিতে এলোমেলো দাগ। কাঁচামাটি। ভদ্রমাসের শেষ বৃষ্টি হয়ে গেছিল চারদিন আগে। মাটিটা তাই নরম। দেখে যেন মনে হয় মাটির ওপর হা-ডু-ডু খেলার মতন একজনকে নিয়ে কয়েক জনের টানাহ্যাঁচড়া হয়েছে। টানা হ্যাঁচড়ার দাগের দুপাশে নানারকম জুতোর দাগ। জুতোও পড়ে আছে একপাটি। নতুন ঝকমকে পাম সু, নতুন যখন নিশ্চয়ই বহুকাল আগে থেকে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত জুতো নয়। ওটা যারা টানা হ্যাঁচড়া করেছে বা যাকে করেছে তাদেরই একপাটি জুতো মনে হচ্ছে। হয়তো জবরদস্তি করা ধস্তাধস্তির মধ্যে কারও পা থেকে খসে পড়েছে।

দীপঙ্করের হঠাৎ চোখে পড়ল মাটির ওপর একটা লেখা একটা অক্ষর 'S'। আঙুলে আঁচড় কেটে কেটে বড় আকারের হরফ। ওটা কি যাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তারই সংকেত লিপি 'S'! বেচারির নামটা কি এস দিয়ে? আরে আরে, আরেকটু দূরে বেশ আরো বড় করে মাটি আঁচড়ে লেখা 'H'। তারপর বেশ খানিক দূরে বেশ খানিকটা নীচে লেখা ছোট্ট করে 'O'। ঠিক তারপরেই কপ্টারের জন্যে ইটপাতা হেলিপ্যাড। টানা-হ্যাঁচড়ার মোটা দাগটা হেলিপ্যাড-এর ওপর দিয়ে খানিকটা গিয়ে থেমেছে। তারপর হয়তো ঐ পয়েন্টে কপ্টারের দরজা ছিল। মনে হচ্ছে যাকে টেনে হিঁচড়ে কপ্টার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সে নানাভাবে হাত পা ছুঁড়ে প্রতিরোধ করতে করতে প্রথমে লিখেছে 'S', তারপর আবার হয়তো লিখবার ডানহাতটা খোলা পেয়ে লিখেছে 'H'। 'S' আর 'H' দুটোই একটা দিকে লেখা, মানে ডান হাতে লেখা হয়ে থাকলে, ডানদিকে লেখা। সুতরাং লোকটার মাথা আগে পা পেছনে করে টেনে নিয়ে গেছে। 'O' অক্ষরটা বাঁদিকে। বাঁ হাতে নয়। মোজা পরা বাঁ পায়ের ছাপ মাটির ওপর। মোজা শুদ্ধ পায়ের বুড়ো আঙুলে লেখা ছোট্ট 'O', মনে হয় কপ্টারের সামনে হেলিপ্যাডের একেবারে কাছে যখন লোকটাকে টেনে আনা হয় তখন বেচারা হাতদুটো খোলা পায়নি। তাই পায়ের মোজা শুদ্ধ বুড়ো আঙুলেই ছোট আকারে 'O' লিখতে হয়েছে তাড়াহুড়া করে। তাহলে কী? এই জুতোটা কি লোকটারই! বাঁ পায়েরই জুতো মনে হচ্ছে। তখন ধস্তাধস্তিতেই কি জুতোটা খুলে গেছিল, নাকি ইচ্ছেই করেই পা ছুঁড়ে সে জুতো খুলেছিল! জুতোটা কাছাকাছিই পড়ে আছে। মনে হয় 'O' পায়ের আঙুলে লিখবার জন্যেই জুতোটা তাকে খুলতে হয়েছে। জুতো পায়ে কি 'O' লেখা যেত না? এস্-এইচ্.ও...এগুলো কি ওর নিজের নামের প্রথম কয়েকটা অক্ষর নাকি অন্য কোনও সংকেত। হয়তো সে

আরো কিছু লিখত পাবলিক বা পুলিশকে জানাবার জন্যে, সুযোগ পায়নি। হয়তো ততক্ষণে চ্যাংদোলা করে তাকে কপ্টারে চালান করে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবতঃ মারুতি গাড়িটা থেকে টেনে—কারণ গাড়িটা নিশ্চয়ই ওটার চার চাকার দাগ যেখানটায়, সেখানটায় ছিল আর সেখান থেকে কপ্টারও এমন কিছু দূরে ছিল না—ঐটুকু জায়গার মধ্যে কপ্টার পর্যন্ত হিঁচড়ে টেনে আনার দাগ—অর্থাৎ গাড়িতে করে লোকটাকে মনে হয় কিডন্যাপ করে আনা হয়েছে কপ্টারে ওঠাবার জন্যে। কারা এসে কাকে কপ্টারে চালান করল?

কিন্তু S, H, O? এটা কেন লেখা হল? এস-এইচ-ও-শো। বাংলায় শো দিয়ে কী কী হতে পারে? দীপঙ্কর এবার ঘড়ি দেখলেন। প্রায় আটটা বাজে আর নয়। এবারে তিনি ফেরার মুখে। ইটভাটার সমতল ক্ষেত্র থেকে রাস্তার দিকে গেলেন। 'শো' দিয়ে শোভন হয়, আর কী হয়? লোকটা কি বাঙালি ছিল? উর্দু ভাষী মুসলিম ছিল? যে নামই হোক, ইংরেজি বানানে তো অনেক অ্যালফাবেট লাগে। ঐ টুকু নিমেষ ফেলার মতো সময়ের মধ্যে কেউ ঐ ভাবে অনেকগুলো অ্যালফাবেট লেখার চেষ্টা করে? রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দীপঙ্করের মনে হল লোকটা বোধহয় নিজের নাম লিখতে চায়নি। তিনটে-চারটে বড় জোর পাঁচটা অক্ষর লিখে অন্য কিছু বোঝাতে চেয়েছিল। এবারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে দীপঙ্কর একটা সিগারেট ধরালেন। কী সেই শব্দ? Shop? Show? Short? নাহ্, কোনও লিঙ্ক পাওয়া যাচ্ছে না ঘটনার সঙ্গে। Shot? Shock? উহুঁ, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মন্থর গতিতে হাঁটতে থাকেন পুকুরপাড়ের দিকে। ঐরকম বিপন্ন নিরস্ত্র অসহায় অবস্থায় লোকটা কী জানাতে পারে যা আত্মরক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গণিতের অধ্যাপক দীপঙ্কর পাল ঠিক করলেন 'Sho'-এরপর abc এইভাবে বসানো যাক একটা করে অ্যালফাবেট, দেখা যাক কী কী শব্দ পাওয়া যায়? 'shoa', কোনও শব্দ হয় না। 'Shob', উহুঁ। 'shoc', 'shod' না না। shoe মানে জুতো। জুতো? সেই জুতো একপাটি? তক্ষুনি দীপঙ্কর পিছু ফিরলেন। প্রচণ্ডবেগে ছুটে ছুটে হাঁটলেন। ফিরে এলেন ইটভাটার সমতলে। অকুস্থলে। তাড়াতাড়ি জুতোটা তুলে নিলেন। উল্টেপাল্টে দেখলেন। ঐ যে, জুতোর তলায় একটা ছোট্ট কাগজ। কাগজ নয় কার্ড। কার্ডটা চটচটে পদার্থ দিয়ে আটকানো। কার্ডটা দীপঙ্কর জুতোর তলা থেকে টেনে খুলে দেখলেন—।

কার্ডে একটা নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার ছাপার অক্ষরে।

৩-অঞ্জন স্যারের বাড়ি

শখের প্রাইভেট ডিটেকটিভ, ফিজিক্সের প্রফেসর অঞ্জন স্যারের ড্রয়িংরুমে পরদিন সক্কালবেলা তিনটি ছেলে নিয়ে কোচিং ক্লাসটা ভেস্তে গেল, কারণ দীপঙ্কর স্যার এসেছেন। দুজনেই একই কলেজে পরস্পরের সতীর্থবন্ধু। কিন্তু দীপঙ্কর তো সাধারণতঃ এত সকালে অঞ্জনের বাড়িতে কখনো আসেননি। একেবারে ব্রেকফাস্ট টাইমে নিশ্চয়ই ব্রেকফাস্ট সারতে আসেননি, অবশ্যই কোনও সিরিয়স ব্যাপার নিয়ে এসেছেন। পড়ুয়াদের ছুটি। ব্রেকফাস্ট-টি পর্ব চলার মধ্যে ভুরু কুঁচকে, কপাল গোঁজ করে, বিস্ময়াত্মক মুখে, সংশয়ান্বিত উদ্‌বেগের মধ্যে প্রচুর কথাবার্তা হয়ে যাচ্ছে। রহস্য! ক্রমশ!

'বুঝলি, মোবাইলেও কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। নাম ঠিকানা অনুসারে বাড়িটা খুঁজে বের করলাম। বালীগঞ্জ স্টেশন রোডে প্রীতিদের বাড়ি...।'

'যাকে কিডন্যাপড্ করা হল তোর মনে হচ্ছে, তার পুরো নামটা আবার বল তো।'

'কার্ডে যা পাচ্ছি, ছাপা রয়েছে ডঃ প্রীতীন্দ্র দেবনাথ...'

'নামটা খুব চেনা-চেনা লাগছে—আমাদের পিতিন নয় তো...?'

'দ্যাখ দীপঙ্কর, আমার মন বলছে, এ সেই পিতিন,...আমেরিকায় টেকনোলজিতে পি. এইচ্. ডি. ওর মা সুনীপাদি, পদবিটা ঠিক মনে নেই, উনিও অধ্যাপিকা। আমার সঙ্গে প্রায়ই কোনও না কোনও ফিজিক্সের সেমিনারে দেখা হয়। ওর ছেলে পিতিনও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার, আমাদের থেকে অনেক জুনিয়ার হলেও, খুব ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, ইলেকট্রনিক মেকানিকসে বেশ পাণ্ডিত্য দেখিয়েছে, এ বিষয়ে ও বেশ বড় একজন বিশেষজ্ঞ—ডক্টর স্বামীনাথনের কাছে শুনেছি, পিতিন নিউ অ্যাপ্রোচে অটো-অক্সিজেন-ইনহেলার আবিস্কারে মগ্ন রয়েছে, যেটা করতে পারলে, অক্সিজেন সিলিন্ডারের দরকারই পড়বে না।

'কী—কীরকম ব্যাপারটা শুনি' নড়েচড়ে বসলেন দীপঙ্কর সিগারেট ধরিয়ে।

'ও এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করতে যাচ্ছে, যেটা টিভির রিমোটের মতো হ্যান্ডি, আর হাল্কা। ওটা দিয়ে হাওয়া থেকে, জল থেকে শুধুমাত্র অক্সিজেন টেনে নেওয়া যাবে। মানে ধর, রুগীদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তখন অক্সিজেন সিলিন্ডার লাগবে না। অটো-অক্সি-ইনহেলার হাতের কাছেই থাকবে। ব্যাটারি ফুলচার্জ করা থাকলে কোনও অসুবিধে নেই, নাকের ফুটোয় সেট করে দিলেই প্রবলেম সলভ্ড।

'তাজ্জব ব্যাপার! এমন একটা আবিষ্কার করতে যাচ্ছে একটা তরুণ বাঙালি!'

'বাহাদুরি আছে। মেটালিক ন্যানোটিউবের সূক্ষ্ম জাল বানিয়ে, তাতে লেসার হাইপার ব্যাটারি চার্জ ঘটিয়ে এমন ম্যাগনেটিক্ ফিল্ড-ডিভাইজার তৈরি করা হবে যে বাতাস থেকে, জল থেকে অক্সিজেন মোলেকিউল আকর্ষণ করানো হবে। ডক্টর স্বামীনাথনের কাছ থেকে যা শুনেছি একটা সেমিনারে—জুতোর তলা থেকে পাওয়া কার্ডে যে নামটা আছে ডঃ প্রীতীন্দ্র দেবনাথ ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার—সে যদি এই পিতিনই হয়ে থাকেতা হলে ভাই ভেরি স্যাড, ভেরি স্যাড....। ওর মা যদি সুনীপাদি হয়ে থাকেন—

'শোন অঞ্জন, আমি যে বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের বাড়িটায় গেলাম, সেখানে তো কেউ নেই। তালা বন্ধ। মা থাকলে তো সকাল আটটায় তিনি বাড়িতে নেই কেন?' বললেন দীপঙ্কর, 'মা কি ছেলের সঙ্গে থাকতেন না?'

'অত সকালে—? ও হো, সুনীপাদির তো মর্নিং গার্লস কলেজে চাকরি। তাই হয়তো বাড়ি তালাবন্ধ দেখেছিস। পিতিন থাকলে তালা বন্ধ থাকত না।'

'পিতিন কি অবিবাহিত? ওর বাবা বেঁচে নেই...?'

'না হে, এখনো বিয়ে করেনি। ওর মা খুব চিন্তিত এই রিসার্চ পাগলা ছেলে নিয়ে। বছরখানেক আগে ওর বাবা মারা গেছেন আফশোস রেখে....।'

'এক কাজ করি, এ ব্যাপারটায় আর দেরি করা যায় না।' বললেন দীপঙ্কর, 'তুই আর আমি চল সুনীপাদির কলেজেই চলে যাই—অবশ্য তোর যদি কোনও অসুবিধে না থাকে।'

'বেশ তো চল! অসুবিধে কী? এ তো খুব জরুরী ব্যাপার।'

'তার আগে কি থানায় একটা খবর দেওয়া উচিত?'

'আগে চল সুনীপাদির কাছে, তার ছেলেই কিডন্যাপড্ হয়েছে কিনা কনফার্মড হয়ে নি। তারপর ওর মা-ই পুলিশের কাছে এফ আই আর করবে যদি পিতিনই হয়ে থাকে।'

৪-মর্নিং কলেজ

কলেজেরই স্টাফরুমে পাওয়া গেল সুনীপাদিকে। অঞ্জনকে দেখে সুনীপাদি তো অবাক। 'আরে অঞ্জনবাবু যে, হঠাৎ কোত্থেকে?' বলতে বলতে সুনীপাদি দীপঙ্করের দিকে তাকালেন। তার হাতে কাগজের প্যাকেট। সেটাও তাঁর চোখ পড়ল। অঞ্জন কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, 'আপনার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা আছে। স্টাফরুমে বসে সকলের সামনে বলা যাবে না....।'

'বেশ তো চলুন আমার ফিজিক্স-রুমে। আপনার সঙ্গের ভদ্রলোকটিকে তো...?'

'হ্যাঁ। এঁর নাম দীপঙ্কর পাল, আমার কলিগ, ওঁর কাছেই কথাবার্তার সূত্র রয়েছে।' দীপঙ্করের দিকে তাকিয়ে অঞ্জন বললেন, 'ইনিই আমার সুনীপাদি। সুনীপাদি আপনার পদবী কি দেবনাথ?' সুনীপাদি একটু হেসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন, 'পদবীতে কী আসে যায়, আমি সবারই সুনীপাদি।' অন্যমনস্ক দীপঙ্কর দেখল, পদবী মিলে গেছে।

ফিজিক্সরুমে ঢুকে সবাই বসলেন। বিস্মিত চোখে সুনীপাদি দীপঙ্করের দিকে তাকিয়ে, তারপর অঞ্জনকে বললেন, 'আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কী হয়েছে। চা খাবেন? চা বলে দি?'

'চা থাক। চা খেয়েই বেরিয়েছি, আচ্ছা সুনীপাদি, পিতিনের খবর কী?' বললেন অঞ্জন।

'ও তো কাল সন্ধেবেলা রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লী গেছে, একটা কনফারেন্সে—মানে ইলেকট্রনিক ম্যাগনেট-এর ওপর একটা কনফারেন্স হচ্ছে ওখানে—তাতে যোগ দিতে..'

'ও কি একা গেছে? সঙ্গে কেউ যায়নি?'

'একা কেন? ওর ইনস্টিটিউটেরই কলিগ নগেন্দ্ররাজন হাওড়া স্টেশনে মীট করার কথা আর যাদবপুর থেকে ওর সঙ্গে গেছে ওর রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টদের কেউ একজন। কী ব্যাপার বলুন তো? এসব প্রশ্ন হঠাৎ আপনারা এসে করছেন...', বড় উদ্বেগ সুনীপাদির।

'এখন কি আপনারা বালীগঞ্জ স্টেশন রোডে থাকেন না?'

'হ্যাঁ, ওখানেই তো থাকি। গেছিলেন নাকি ওখানে, তালাবন্ধ দেখে এখানে চলে এসেছেন?' দীপঙ্কর লক্ষ্য করলেন ঠিকানাও মিলে গেছে। সুতরাং দুয়ে দুয়ে চার।

'পিতিনের সেই নিউ সিস্টেমের AOI আবিষ্কারটা কি কমপ্লিট হয়েছে?'

'কমপ্লিট তো হয়েছে, যন্ত্রটা একেবারে রিমোটের মতো দেখতে, ঐরকমই সাইজ, হালকা, হ্যানডি, শ্বাসকষ্ট পাওয়া রুগীর নাকের সামনে ধরলেই অক্সিজেন নাকে ঢুকে যাবে। আমাকে দিয়ে পরীক্ষাও করিয়েছে। বললেন সুনীপাদি হেসে, হাসি থামিয়ে মুখটা গম্ভীর করে, 'তবে একটা ব্যাপারে পিতিন কিন্তু-কিন্তু করছে, যন্ত্রটার মধ্যে যে লেসার কনডেনসড্ হাইপার ব্যাটারিটা ও সেট করেছে, সেটা সামান্য ওভারচার্জড্ হয়ে গেল বার্স্ট করতে পারে। সেটা নিয়েই একটু ভাবছে। AOI এ ন্যানোটিউবনেটে অক্সিজেন মোলেকিউল বায়ু থেকে বিভাজন করে টিউব ঢোকাতে হিউজ ফোর্স লাগে। ঐ রকম ব্যাটারি ছাড়া উপায়ও নেই। দেখা যাক্ মাথা তো খাটাচ্ছে খুব খাওয়া দাওয়া ভুলে। AOI সেটের সব কাগজপত্রর, ব্লু প্রিন্ট

ডায়াগ্রাম, তত্ত্বপত্র সুটকেস বন্দি করে দিল্লীতে গেছে কনফারেন্সে ব্যাপারটা ডিসক্লোজ করতে। তারপর পরে সারা ভারতের বিজ্ঞানীদের যাদবপুরে ডেকে ইনস্টিটউট মারফৎ ওর AOI সিস্টেমের সব কটা পার্টস সব খুলে খুলে, জুড়ে জুড়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা দেখিয়ে দেবে....।'

ততক্ষণে দীপঙ্কর কাগজের মোড়কটা থেকে গার্ডার খুলে, তারপর কাগজটা খুলে ফেলেছিলেন। আর ভাবছিলেন কী করে প্রীতীন্দ্রের কিডন্যাপ হওয়ার কথা সুনীপাদিকে জানানো যায়। দিল্লী যাবার আগেই, মনে হয় হাওড়া স্টেশনে, কিংবা হাওড়া স্টেশনে যাবার পথেই প্রীতীন্দ্র কোনও দুর্বৃত্তের দ্বারা কিডন্যাপ হয়ে গেছিল। দীপঙ্কর অঞ্জনের চিন্তিত ও ব্যথিত মুখখানাও বার বার লক্ষ করেছিলেন। মনে হয় অঞ্জনেরও সেই ভাবনা। কী করে এই কলেজের মধ্যেই অধ্যাপিকা সুনীপা দেবনাথের কাছে ওঁর বিজ্ঞান সাধক ছেলে কিডন্যাপও হয়ে গেছে কি না, কোয়েরি করবেন! দীপঙ্করকে দেখিয়ে অঞ্জন বললেন, 'ও যে জুতোটা বের করল ভালো করে দেখুন তো, ওটা কি আপনার ছেলের...?'

আপন মনেই ছেলের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধুর মগ্নতায় মা বিভোর ছিলেন। হঠাৎ থমকে যেতে হল। চোখ বড়, আরো বড়, ক্রমশ বড় করে, শেষে জুতোর দিকে চোখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে, তাতেও মন মানল না, জুতোটা হাতেই নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে, 'এ্যাঁ—হ্যাঁ এ তো পিতিনেরই একপাটি, আরেক পাটি কোথায়? এটা পরেই তো কাল রাজধানী এক্সপ্রেস ধরতে গেছে বলে জানি। বলতে বলতে চোখে জল এসে যায়, এই এক পাটি আপনারা পেলেন কোথায়....?' মুখটা ফোঁপাতে ফোঁপাতে সংযত করলেন।

'আমি পাইনি। পেয়েছেন ইনি', বলতে বলতে অঞ্জন জুতোর তলার অ্যাডহেসিভে আটকানো যে কার্ডটা পাওযা গেছিল সেটি বের করে দেখালেন, 'এটাই তো পিতিনের মোবাইল নাম্বার....?'

মাথা ঝাঁকিয়ে 'হ্যাঁ' জানালেন সুনীপা দেবনাথ, ভীষণ ভীত হয়ে কোনও রকম খেই না পাওয়ার মতো অবস্থা যেন তাঁর। মাঝে মাঝেই তাঁর দম যেন আটকে যাচ্ছে— ছেলে বেঁচে আছে কিনা...? ছেলের কি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, তার পায়ের জুতো, নাম ঠিকানা ছাপানো কার্ড এসব....'এ-এ-সব আ-আপনারা....কী....কী করে পেলেন?' কেঁদে ফেললেন ফুঁপিয়ে।

'শক্ত হন সুনীপাদি', বললেন অঞ্জন, 'এক্ষুনি থানায় চলুন। আর এক মুহূর্ত দেরি নয়। প্লিজ সুনীপাদি মুষড়ে পড়বেন না, থানায় যেতে যেতে শুনবেন সব, দেখবেন অবস্থা এখনো আয়ত্তের বাইরে যায়নি....।'

ঠিক তক্ষুনি সুনীপার মোবাইলে একটা চেনা সুর বেজে উঠল। ছেলের ফোন, ঠিক তখনি সুনীপার মুখে সামান্য একটু স্বস্তির ছাপ, তাড়াতাড়ি মোবাইলটা কানে চাপিয়ে, 'হ্যাঁ রে, তুই কোথায়, দিল্লী যেতে পারিসনি....' তারপরেই আর্ত চিৎকারের মতো স্বর বেরিয়ে এল সুনীপাদির গলা থেকে, মোবাইল নামিয়ে যেন আর তিনি শুনতে চান না, বা পারছেন না। আতঙ্কগ্রস্ত দুটো চোখের বড় হয়ে ওঠা ডিম থেকে জল গড়াতে লাগল। তাড়াতাড়ি অঞ্জন মোবাইলটা হাতে নিয়ে নিজের কানে চেপে ধরলেন, শুনে যেতে লাগলেন পিতিনের কণ্ঠস্বর—'হ্যাঁ', পীত চক্ষুর গান্ পয়েন্টের আন্ডারে কথা বলতে হচ্ছে আমার মোবাইলে। মোবাইলটা কাল থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত ওদের হেফাজতে ছিল। এখন আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে কথা বলতে দিয়েছে। প্রথম শর্ত, ওরা আমার ইনভেন্টেড্ AOI Plus LHB সেটটা না পেলে আমাকে জানে মেরে দেবে। আমাকে যদি বাঁচাতে চাও তবে ওটা সন্ধে ছ-টায় বালীগঞ্জ রেল স্টেশনের ওভারব্রিজে উঠবার প্রথম সিঁড়ির ধাপে ডান কিনারে বসা অন্ধ ভিখারীর কাছে রেখে আসতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত, পুলিশকে একদম জানানো চলবে না। ওদের লোক গোপনে তোমার গতিবিধির ওপর চোখ রাখছে। তোমার ফোনেও আড়ি পেতে রেখেছে। তৃতীয় শর্ত, কনফারেন্সে যে সব অরিজিন্যাল কাগজপত্র ব্লুপ্রিন্ট সব ওদের হস্তগত হলেও, ওর মধ্যে আমার যা কিছু বক্তব্য বিবরণ ব্যাখ্যা সবই আমার নিজস্ব সিমরোলে লেখা তো, ওরা বুঝতে পারছেন না, তাই ঐ AOI plus LHB সেটটা ওরা পেলে, আমাকে পীতচক্ষুর সায়েনটিস্ট ইনজিনিয়ারদের সব কিছু হাতে কলমে বুঝিয়ে দেবার জন্যে ওরা আমাকে আরও আটচল্লিশ ঘন্টা আটকে রাখবে। তুমি AOI plus LHB সেটটা, যেটা তিনতলার তিন নম্বর টিউব রুমে রেডবক্সের মধ্যে আছে' ঠিক রেডবক্সসুদ্ধু সেটাই পাঠিয়ে দিও, অন্যরকম কোনও জিনিস বা বিকল্প জিনিস পাঠিয়ে দিও না, দেখো যেন কোনও ভুল ভ্রান্তি, কারচুপি না হয়। কারণ ওদের বুঝিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে গিয়ে যেন ফলস পজিশনে পড়ে না যাই, পড়ে গেলে আমি তো শেষ হয়ে যাবই, ওরা তোমাকেও....এই পর্যন্ত বলেই একটু থামল, আবার বলল, 'মা, মামনি, তুমি কথা বলছ না কেন, সাড়া দিচ্ছ না যে....' তক্ষুনি অঞ্জন মোবাইলটা সুনীপাদির হাতে দিয়ে সামনের কাগজে কলম চালাল খচখচ করে; 'পিতিন এখন কোথায় আছে জিজ্ঞেস করুন তো...?' আর বলে দিন সব শর্ত পূরণ করা হবে। আগে তো জান বাঁচুক।'

সুনীপাদি মোবাইলে মুখ এনে, প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে বলল, 'পিতিন রে, আগে তোর জান বাঁচুক। সব শর্ত, সব রকমের শর্ত ঠিক মানা হবে রে, তুই বেঁচে বর্তে ফিরে আয়। তুই এখন কোথায় আছিস সোনা...?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেলেন, 'জানি না, ওরা আসার সময় চোখ বেঁধে নিয়ে গেছে। চোখ খোলার পর দেখছি, একটা ছোট্ট ঘর, কাছে ডান দিকে, বাঁদিকে, সামনে জানালা, তিন দিকে খালি জল আর জল....কথা বলতে আর দেবে না মা। হুমকি দিচ্ছে...'। কেটে গেল।

তিনজনেই স্তব্ধ। নীরব কয়েক মিনিট। বরফ ভাঙলেন প্রথম অঞ্জন, 'পুলিশে খবর দেওয়া স্থগিত রাখতে হবে। সুনীপাদির ওপর 'পীতচক্ষু'র লোকদের লাগানো রয়েছে। এখনো আমাদের ওপর ওদের লোকের চোখ পড়েনি। আর যাতে না পড়ি তাই ফোনে কথা বলিনি। সুনীপাদি, AOI plus LHB সেটটার আবিষ্কার পীতচক্ষু অধিকার করে নেবে। আপাততঃ কোনো ঘাঁটাঘাঁটি না করে ছেলের প্রাণ বাঁচাতে শর্ত তিনটি মেনেই নিতে হবে।'

৫-অন্ধ ভিখারী

সন্ধ্যে ছ-টায় সুনীপা দেবনাথ নিজে এসে বালীগঞ্জ রেলস্টেশনে ঢুকবার জন্যে ওভারব্রিজে ওঠবার সিঁড়ির প্রথম ধাপে ডান কিনারে সত্যি সত্যি একটা অন্ধকে দেখতে পেলেন হাত পেতে আছে। তার হাতে রেডবক্সটা চাপিয়ে দিয়ে চোখে জলের ধারা বইয়ে আর কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে গেলেন।

ঠিক ছ-টা পনেরোতে হলদে মারুতি অন্ধ ভিখারির সামনে দাঁড়াল। ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে তাকে ডাকল, 'স্যার চলে আসুন।' অন্ধ ভিখারি চোখ খুলে রেডবক্সটা নিয়ে গাড়িতে উঠল।

সন্ধে সাড়ে সাতটা। স্থান পিচকলের জঙ্গল মাঠের প্রান্তে ইটভাটার সমতলক্ষেত্র। হলদে মারুতি রাস্তা থেকে সরে বস্তির দিকে গেল। বস্তিটায় মোট আটটা চালাঘর। একটা ঘরে এক বুড়ো থাকে। তাই নাম বুড়োর বস্তি। বাকি সাতটা চালাঘর ভেঙে চুরে বা আগুনে পুড়ে ভগ্নাবশেষ হয়ে আছে। কেউ থাকে না। শুনশান। ঐ বুড়োটা ছাড়া। গাড়ি থেকে নেমে অন্ধসাজা লোকটা ড্রাইভারের পেছনে পেছনে বুড়োর ঘরে ঢুকল। ড্রাইভার বেরিয়ে গেল। গাড়ি নিয়ে কোথায় চলে গেল। জঙ্গলে মোটরবাইক লুকিয়ে রেখে, বহুদূর থেকে উঁচু জমিতে দাঁড়িয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে নিজেকে আড়াল করে দীপঙ্কর যখন ইটভাটার দিকে তাকালেন, তখন বেজেছে রাত সাড়ে আটটা। ততক্ষণে ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। বস্তির দিকে একটা ঘরে আলো জ্বলছে।

রাত ন-টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। রাস্তার দিকে মনে হচ্ছে সেই গাড়িটা ফিরে আসছে। হলদে মারুতি। ফিরে এসে হেডলাইট জ্বালিয়ে রাস্তা থেকে ইটভাটার সমতলক্ষেত্রে নেমে পড়ল। তারপর হেডলাইট নিবিয়ে থামল। একটু পরে আকাশে তীব্র সার্চ লাইট ফেলা হল। ঐ যে আসছে। গতিশীল তারা যেন। নামছে হলুদ গোল বলের মতো, ওপরে ঘুরন্ত চরকির মতো পাখা। খুউব মৃদু শব্দ হচ্ছে বোঁও-ও-ও। বোঁ-ও-ও। গাড়ির হেডলাইট জ্বলল। কপ্টার নামল হেলিপ্যাডে। রেডবক্স হাতে অন্ধ আর হেলমেট পরা কেউ একজন কপ্টারে উঠল। কপ্টারের পাখা ঘুরতে শুরু করল। উড়ল। আকাশে মিলিয়ে গেল। হেডলাইট জ্বলতে থাকা হলদে মারুতি অনেকক্ষণ পর্যন্ত ইটভাটার সমতল ক্ষেত্রেই পড়ে রইল। পড়েই আছে। ড্রাইভার কোথায়? ও কি কপ্টারে উঠে গেছে? কে জানে? দীপঙ্কর আর কতক্ষণ দাঁড়াবে?

বাড়ি ফিরে দীপঙ্কর চিন্তিত। কে জানে পিতিনের কপালে কী আছে। ওর অমন অভিনব আবিষ্কার অন্য লোকে অন্যায়ভাবে অধিকার করে নিল। 'পীতচক্ষু'র চীফ নিশ্চয়ই AOI plus LHB সেটটা নিজের নামে পেটেন্ট করে বাজারে কোটি কোটি টাকা কামাবে। হঠাৎ দীপঙ্করের মোবাইল বেজে উঠল। তখন ন-টা পঞ্চাশ বেজেছে। 'আমি অঞ্জন বলছি, আমি এখন পীতচক্ষুর কপ্টারের ভেতর;' শুনে চমকে উঠল দীপঙ্কর। আরো স্তব্ধ হয়ে গেল যখন শুনল, 'আমি বালীগঞ্জ স্টেশনের সেই অন্ধ, হাতে এ. ও. আই. সেট-এর রেডবক্স হাতে কপ্টারে উঠেছি...। ব্যস এখন এইটুকু...' কেটে গেল। অবাক কাণ্ড কী করে এসব সম্ভব হচ্ছে! অঞ্জন ডিটেক্‌টিভ দুঃসাহসিক ভাবে নেমে পড়েছে। কিন্তু অন্ধ ভিখারী হওয়ার ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। দশটা বাইশে আবার দীপঙ্করের মোবাইলে, 'আমি অঞ্জন, মনে হচ্ছে ক্যানিং-এর কাছাকাছি, তিনদিকে মাতলা নদীর জল, অন্যদিকে জোনাকি পোকার আলোর রাজত্বে ঝিঁঝিদের ঝাঁঝাল ব্যান্ডি-বাজনার আলোড়নের মধ্যে কপ্টারটা নামছে একটা খেলার মাঠে। এই পর্যন্তই...' কেটে গেল।

অনেক রাত পর্যন্ত ছটফট করেছেন দীপঙ্কর। মাঝে মাঝেই দীপঙ্করের স্ত্রী পরমা জেগে উঠে বললেন, 'কী হল তোমার? ঘুম আসছে না?'

আসলে লড়াই হচ্ছে। অঞ্জনের সঙ্গে 'পীতচক্ষু'র। দীপঙ্কর যদি পাশে থাকতেন ওঁর। চুপচাপ ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুম এসে গেছিল। হঠাৎ কাক ভোরে মোবাইলে, 'আমি অঞ্জন, ঘুম ভাঙালাম, আমি পিতিনকে নিয়ে ক্যানিং রেল স্টেশনে। তুই সুনীপাদির বাড়িতে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে চলে আয়...।'

৬-রহস্যভেদ

"পিতিনকে মেরেই ফেলতো। ওর আবিষ্কৃত যন্ত্র, যন্ত্র তৈরির নক্‌শা ফর্মুলা, পদ্ধতি, তত্ত্ব, যা যা ছিল ওর দিল্লীগামী সুটকেসে, তার সঙ্গে আবিষ্কারের কৃতিত্ব সব কিছু কেড়ে নিয়ে, ঐ জালিয়াত 'পীতচক্ষু' ওরফে সেই বদ্‌বিজ্ঞানী সিঙ্গাপুরবাসী ওকাতা মং পিতিনকে ছেড়ে দিয়ে নিজের বিপদ কখনো ডেকে আনতো? তাই আমিও আমার ছাত্রবাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ডেকে আনলাম শুভ্রাশিস, কুশল, দীপেন্দুদের। পুলিশ-অফিসারের বেশে বাইকে করে পৌনে ছ-টার আগেই এসে দেখলাম বালীগঞ্জে স্টেশনের ওভারব্রিজের সিঁড়ির প্রথম ধাপে কোনও অন্ধই নেই। শুভ্রাশিসদের গাড়িটা একটু দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে, আমি বালীগঞ্জ স্টেশনের সামনে যত গাড়ি বাইক ট্যাক্সি আসছিল সবাইকে আটকে লাইসেন্স চেকিং শুরু করে দিতে দিতে দেখলাম একটা হলদে মারুতি আসছে। দীপঙ্কর আগেই বলেছিল হলদে মারুতির কথা। দেখলাম গাড়িতে ড্রাইভারটা নার্ভাস। আন্দাজ করলাম ওর গাড়ির নাম্বার ফল্‌স। ড্রাইভার চাইছে আমাকে এড়াতে। দিলাম ওকে ওর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আমাকে এড়িয়ে যাবার সুযোগ। কিন্তু মুখটা পাশে ফিরিয়ে আড়চোখে দেখলাম, ড্রাইভারটা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। আর যেন তর সইল না, বোঁ করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে খুব জোর ছুটে চলে গেল ওভারব্রিজের সামনে। সেখানে দাঁড় করল। একটা অন্ধমতন ভিখিরি-ভিখিরি লোক তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির প্রথম ধাপের ডানদিকে বসল। হলদে মারুতি তখুনি ভোঁ করে বালীগঞ্জ স্টেশন রোড ধরে সোজা গিয়ে ডানদিকের রাস্তায় ঢুকে হাওয়া হয়ে গেল পুলিশ অফিসারের ভয়ে। তক্ষুনি শুভ্রাশিসদের ইঙ্গিত করলাম আঙুল তুলে। ওরা ওদের গাড়িটা অন্ধ ভিখারীর সামনে দাঁড় করল। ওরা তিনজন, শুভ্রাশিস, কুশল, দীপেন্দু এই তিনজন থেমে, আচমকা একজন পেছন থেকে অন্ধটির মুখ চেপে ধরে, অন্য দুজন ওর বডি তুলে দ্রুত গাড়িতে ঢুকিয়ে দেয়। আমিও ততক্ষণে গাড়ির ভেতর ঢুকে সাজ পাল্টে, অন্ধের সাজ সেজে ওভারব্রিজ-সিঁড়ির প্রথম ধাপে ডান কিনারে বসলাম। বসে চোখ বুজে হাত পেতে রইলাম—' বলেই অঞ্জন দুষ্টু-দুষ্টু হাসলেন।

'কী কাণ্ড, আপনিই তখন ঐখানে বসেছিলেন?' সুনীপাদি প্রত্যেককে ব্রেকফাস্ট টি এগিয়ে দিতে দিতে বললেন। তাঁর ড্রয়িংরুমে তখন দীপঙ্কর আর প্রীতীন্দ্র। বাইরে ভোরের সূর্য।

'হ্যাঁ, ভিক্ষা দিন সুনীপাদি, রেড বক্সটা ভিক্ষা দিন...মনে মনে বলেছিলাম', বললেন অঞ্জন এগটোস্টে কামড় বসাতে বসাতে। তক্ষুনি হাসির আবহ ভোরের আলোয় সৃষ্টি হল। 'তারপর কী হল? গাড়ির ড্রাইভারটা অন্ধবদল টের পেল না?' বললেন দীপঙ্কর চায়ে চুমুক দিয়ে।

'—নাহ্, চিন্তা একটু হচ্ছিল রেডবক্স হাতে বসে থাকার সময়। কী টেনশন তখন! মিনিট পনেরো পরে হলদে মারুতি তো এল। আসলে অন্ধ সেজে যে এসেছিল, সে ছিল পিতিনের রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট বন্ধুবেশী শত্রু, কোরক মণ্ডল। সে আবার 'পীতচক্ষু' বদবিজ্ঞানী ওকাতা মং-এর ডান হাত হয়তো নয়, তবে বাঁ হাত তো বটেই। ড্রাইভার তো অন্ধবেশী কোরককে স্যার স্যার করছিল। তাই অন্ধবদল টের না পেয়ে রাস্তায় পুলিশ অফিসার গাড়ি আটকাচ্ছে কিনা সেইদিকে মনোযোগ দিয়ে, বাইরে এদিক ওদিকে তাকিয়ে অনুগত কর্মচারীর মতো হ্যাঁ স্যার না স্যার করে যাচ্ছিল আর স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছিল। অনেক পেছনে শুভ্রাশিসদের গাড়ি আমাদের গাড়িটার পিছু নিয়েছিল, আমার চেনা থানায় কোরক মণ্ডলকে জমা করে।' অঞ্জন বলতে বলতে থামলেন, কারণ সুনীপাদি তাড়া লাগালেন, 'খান অঞ্জনবাবু, খেতে খেতে বলুন।'

ঠিক এই সময় প্রীতীন্দ্র বলল, বলার মধ্যে বেদনার সুর, 'পরশুদিন রাজধানী এক্সপ্রেস ধরতে যখন রবীন্দ্রসদনের কাছাকাছি এসেছি, তখন পাশেই ছিল কোরক। একটা হলদে রঙের মারুতি মোহরকুঞ্জের সামনে দাঁড়িয়েছিল, দেখেই কোরকের ফেস বদলে গেল। মনে হল, মিষ্টি হাসির মুখোশ খুলে শয়তানের মুখটা দেখাল। পাঁজরে পিস্তল ঠেকিয়ে বলল, 'সাবধান, মুখ থেকে যেন আওয়াজ না বের হয়। নড়লেই, শরীর ফুটো-ফুটো-ফুটো...।' হলদে মারুতিটা থেকে ড্রাইভার আর আরেকজন আমাকে টেনে বের করে ঠেলে মেলে হলদে মারুতিতে ঢোকাল! সে সময় কোরক পেছন থেকে আমার মুখ চেপে ধরে রেখেছিল। এখন শুনলাম ওর ক্ষেত্রেও রেসিপ্রোকাল ঘটল।'

অঞ্জন বললেন, 'জুতোর তলায় কার্ড গুঁজলে কখন?'

'যখন একটা নির্জন অন্ধকার জায়গায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছে দেখলাম, তখন কোরককে বললাম, একটু খেতে দাও, খিদে পেয়েছে। তখন পাশের লোকটা, যে আমার পাঁজরে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে রেখেছিল, আমার হাতের বাঁধন আলগা করে দিল। আমি টিফিন বক্স থেকে পাঁউরুটি ছিঁড়ে মুখের লালায় ভিজিয়ে হাতের মুঠোয় চটকে আঠাল করে, একটু বসে থাকলাম। তারপর পকেট থেকে চুপি চুপি একটা কার্ড ওদের চোখের আড়ালে বের করলাম। চটচটে পাঁউরুটির আঠা কার্ডের পেছনে চেপে, তক্কে তক্কে থাকলাম। ওরা যখন আমার মুখ বেঁধে আমাকে ইটভাটায় নামাচ্ছিল, তখন পড়ে যাওয়ার ভান করে বাঁ পাটি জুতোর তলায় আঠা মাখা কার্ডটা চেপে লাগিয়ে ফেললাম—এইটুকু আশা যদি জুতোটা কারো নজরে পড়ে যায়। তারপর আমি চাইলাম ওরা আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিক—যাতে জুতোটা খসে পড়ে গেল বোঝানো যায় আর মাটিতে আঙুলের আঁচড় কেটে লিখবার যাতে সুযোগ পাই...আমি আঙুলের আঁচড়ে...।' এই সময় দীপঙ্কর হাসলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, আমি টের পেয়েছি, "S" তারপর "H" তারপর "O" পরের "e"টা লিখবার সুযোগ না পেলেও জুতোটা তো পড়েছিল সেখানে...।'

অঞ্জন বললেন, 'ড্রাইভার তো বুড়োর ঘরে নিয়ে গেল, সেই ইটভাটার পাশে। তারপর ড্রাইভার চলে গেল কোথায় কে জানে। এদিকে আমার ছাত্রবাহিনীও এসেছে পিছু পিছু লুকিয়ে গাড়িতে করে। ওদের ইসারায় চুপচাপ থাকতে বলে, বুড়োর ঘরে ঢুকে দেখি এক হেলমেটধারী, গায়ে মেটালিক বর্মের মতো জ্যাকেট। হাতে রিভলভার, অন্ধকার ঘর। এক খুনখুনে বুড়ো, জরাজীর্ণ, মাথার চুল গোঁফ দাড়ি একেবারে পাকা, চোখে ভারি লেনসের চশমায় অনেক চেষ্টা করে দেখে, বুড়োটা রান্নাঘরে ধুঁকতে ধুঁকতে চা বানাচ্ছিল। হেলমেটধারী আমাকে দেখেই বললেন, 'কোরকবাবু, বেশ অন্ধ সেজেছেন তো! মিস্টার মংকে আপনার এই সাজটা দেখিয়ে তবে ছাড়বেন...।' অন্ধকার ঘরে এই হেলমেটধারীও আমাকে চিনতে পারেনি। কী ভাগ্য! আমি টু শব্দটিও করলাম না। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। কোরকের গলার স্বর কেমন কে জানে। তবে কোরকের লম্বা চওড়া স্টাউট ফিগার, আর আমার ফিগারটাও প্রায় একই তো....তার উপরে অন্ধের সাজ; যাই হোক, ইতিমধ্যে বুড়ো নড়তে নড়তে এসে আমাদের চা দিয়ে গেল। বুড়োর নড়তে চড়তে ছ-মাস। তাতে আমার সুবিধে হল। বুড়োকে সিগারেট কিনতে পাঠালাম। ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু উপায় নেই। 'হেলমেটধারী' চা খেতে খেতে বাইরে দাঁড়িয়ে যখন তারা ভর্তি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল, তক্ষুনি শুভ্রাশিসরা আমার ইসারা মতো নিঃশব্দে লুকিয়ে লুকিয়ে ছুটে এসে, হেলমেটধারীকে 'টু' শব্দটি করতে দিল না। মুখ চেপে ধরে, চারদিক থেকে চেপে ধরে, মেডিসিনে অর্ধচেতন করিয়ে, তারপর ওর হেলমেট, জ্যাকেট সব খুলে, ফেলা হল। ওকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে একটা ভাঙা

চালাঘরে ঢুকিয়ে রেখে বাইরে থেকে ঘরের দরজায় ছিটকিনি লাগানো হল। তারপর, এবারে শুভ্রাশিস হেলমেট বর্ম-জ্যাকেট-ফ্যাকেট পরে মিস্টার মং-এর সুপার দক্ষিণ হস্ত সাজল। কোরক ছিল মিস্টার মং-এর বাম হাত। আর ঐ হেলমেটধারীটা সুপার রাইট হ্যান্ড। হলদে মারুতি এসে পড়ছে দেখে কুশল দীপেন্দুরা লুকিয়ে পড়ল।

তারপর যাই হোক অন্ধবেশী আমি, হাতে রেড-বক্স, আর হেলমেটধারী বর্মপরা হাতে রিভালভার শুভ্রাশিস, কপ্টারে উঠবার সময়—এতক্ষণে ইটভাটায় যাওয়া, ড্রাইভার সঙ্গে থাকা, কপ্টারের নামা, সবই নির্বিঘ্নে সন্দেহাতীতভাবে হচ্ছিল, কেবল কপ্টারে উঠবার সময়, ড্রাইভার বোধহয় টের পেয়ে গেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে ড্রাইভারের মুখ হাত চেপে বন্ধ করে দিয়েছিল কুশল। অরিত্র দীপেন্দুরা ম্যানেজ করেছিল মনে হয় ব্যাপারটা। কারণ কপ্টার তখন অনেক ওপরে চলতে শুরু করেছে, নীচে হলদে মারুতির হেডলাইটটা জ্বলে যাচ্ছে স্থির একদিকেই। কপ্টারে ওঠা পর্যন্ত আমাদের অপারেশন নিঃশব্দে। কপ্টারে আরো দু-তিন জন ছিল। তারা থেকে থেকে ভুরু কুঁচকোচ্ছিল। আমরা যেন ওদের কাছে ঠিকঠাক চেনা লোক মনে হচ্ছিল না। কিন্তু কিছু বলেনি। একজন আমার হাত থেকে রেডবক্সটা নিয়ে, বক্সের ভেতরটা শুধু চোখ মেলে দেখল। বক্সের গায়ে কী লেখা আছে পড়ল। বক্সের গায়ে চিহ্ন মেলালো। ও যখন ও সবে ব্যস্ত, আমি তখন ফিসফিস করে শুভ্রাশিসকে বললাম, 'কপ্টার ল্যান্ড করলে পরিস্থিতি বুঝে রিভলভার চালাস'। যখন দেখলাম মাতলা নদী এসে গেছে। কাছেই বাংলাদেশের সীমান্ত। এই জন্যেই হেলিকপ্টারের ব্যবহার। পিতিনকে নিয়ে বাংলাদেশে পালাতে মং-এর কোনও অসুবিধে হত না। এই জন্যেই পিতিন যে ঘরে ছিল তিনদিকে জল দেখেছিল, যেটা সুনীপাদির কাছে আগেই জেনেছিলাম।' একটু থেমে ঠান্ডা চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে অঞ্জন আবার বললেন, 'সত্যি বলতে কী একটা মাঠে ল্যান্ড করতেই হৈচৈ পড়ে গেল আমাদের দুজনকে নিয়ে। আমাদের দুজনকে ঘিরে দাঁড়াল চার-চারটে মোঙ্গোলিয়ান ফেস মস্তান। হাতে বন্দুক। একটা ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল আমাদের দুজনকে হাত তুলিয়ে। শুভ্রাশিস কখন যেন তার রিভলভার জ্যাকেটের ভেতরের লুকিয়ে ফেলেছিল। বুদ্ধিমানের কাজ করেছে রিভলভার না ছুড়ে বরং সেটা লুকিয়ে রেখে। কাঁচামাটির ঘর, তিনদিকে কপাটহীন জানালায় পর্দা উড়ছে, পর্দা সরে গেলে জল চকচক্ করে উঠছে। মাতলা নদী। ঘরের ভেতরে হাত পা মুখ বাঁধা পিতিন। তার সামনে জবরজং মোঙ্গোলিয়ান ফেস্ বন্দুক তাক করা আরেক মস্তান। দুজনের একপাশে প্লাস্টিকের হলদে চেয়ারে বসা লিকলিকে চেহারা, চোখে গোল ফ্রেমলেস চশমা ভদ্র-ভদ্র মুখের গড়ন, এরও মুখটা মোঙ্গোলিয়ান, বদ-বিজ্ঞানী ওকাতা মং। ওই যে মং সেটা বুঝলাম ওর সঙ্গে সঙ্গে চেচাঁনো শুনে। বলল চেঁচিয়ে আমাকে দেখামাত্র, 'ইউ আর নৎ কোরাক সানদেল, হু আর ইউ লাইক ব্লাইনদবেগার...?' কিন্তু তক্ষুনি কপ্টারের লোকটা যে রেড বক্সটা আমার কাছ থেকে নিয়ে চেক করেছিল, সে পিতিনের চোখের সামনে রেডবক্সটা ধরে, ওর সম্মতিসূচক মাথা নাড়া দেখে, 'ওকে-ওকে বস্' বলে বিকট চিৎকার করল। সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার মং আমার উত্তরের তোয়াক্কা না করে রেডবক্সটা ছোঁ মেরে বগলস্থ করে ঘরের বাইরে ছুটে বেরিয়ে গেল, তার আগেই বন্দুকধারী যে মোঙ্গোলিয়ান মস্তানটা পিতিনের দিকে বন্দুক তাক্ করে রেখেছিল, সে আমাকে লক্ষ করে বন্দুক চালাল। আমার সিক্সথ সেনস্ আমাকে তার আগেই মাটিতে শুইয়ে দিয়ে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট করাল। আবার চালাল। আমি গড়িয়ে সরে যেতেই, চোখে পড়ল কপ্টারের সেই লোকটা হাত-পা মুখ বাঁধা পিতিনকে কাঁধে তোলার চেষ্টা করছে। কাঁধে নিয়ে বাইরে যাবে। আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে যাবে? সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল বের করে লোকটার পায়ে মারলাম। লোকটা পড়ে গেলেও, সেই বন্দুকধারী মোঙ্গোলিয়ান বন্দুক ফেলে পিতিমকে প্রায় লুফে কাঁধে নিয়ে দৌড়ে বাইরে চলে গেল। কিন্তু যাবে কোথায়? দরজার আড়ালে দাঁড়ানো শুভাশিসের রিভলভার থেকে গুলি ছুটল কয়েকটা। উঠানে পিতিমকে নিয়ে মস্তানটা পড়ে যেতেই, আমি ছুটে বেরিয়ে পিতিনকে কাঁধে তুলে পিস্তল ছুড়তে ছুড়তে একপাশে সরে এলাম। মংদের সবাই ছুটে ছুটে দৌড়ে দৌড়ে বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে গেল মাঠে হেলিকপ্টারের দিকে। রেডবক্স নিয়ে মং সবার আগে। পিতিনকে কাঁধে চাপিয়ে ঐ মোঙ্গোলিয়ান মস্তানটাও কপ্টারে উঠত। পিতিনের হাত-পা মুখের বাঁধন খুলতে খুলতে দেখলাম রেডবক্স হাতে মং কপ্টারে উঠে পড়েছে। সবই ও পেয়ে গেল। পিতিনের আবিষ্কারের ফর্মুলার কাগজপত্র ব্লুপ্রিন্ট, প্রস্তুত প্রণালী-তত্ত্বের দলিল ভর্তি সুটকেসটা। যন্ত্রটাও পেয়ে গেল। পেল না শুধু পিতিনের মস্তিষ্ক। ওকে বদবিজ্ঞানীর ব্ল্যাক-মেইলিং-এর কব্জায় পড়তে দিইনি এটাই শুধু একমাত্র স্বস্তি নয়, ওকাতা মং শেষ পর্যন্ত কিছুই পাবে

না, এবং পেলোও না শেষ পর্যন্ত, এ তো কম স্বস্তির নয়। মনে হয় ঘটনাচক্রে দলবলসহ শেষও হয়ে গেছে ওরা। কারণ পিতিনের সব বাঁধন খুলে, ওকে জল খাইয়ে, জলটা নিয়ে এসে ছিল শুভ্রাশিস, ঐ ঘরেই ছিল জলের বোতল, ঘরটা একটা আটচালা বাড়ির একটা কোণে। মনে হয় মংরা ঘরটা কয়েকদিনের জন্যে ভাড়া নিয়েছিল, ছেড়ে, ঘর খালি করে সব শুধু চলে গেল। যাই হোক, পিতিনকে জল খাইয়ে, সুস্থ করিয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে দেখলাম, কপ্টারটা অনেক-অনেক উঁচুতে, আগুনের গোলার মতো জ্বলছে। দাউ দাউ জ্বলতে জ্বলতে চলে গেল দৃষ্টির বাইরে....।'

'দাউ দাউ জ্বলছে?' দীপঙ্কর বিস্মিত, 'আগুনের গোলা' চোখ বড় বড় করল সুনীপাদি, 'AOI সেটের ব্যাটারিটা বিস্ফোরণ করল নাকি...।'

পিতিন বলল, 'হ্যাঁ এমনিতেই ওটা ফুলচার্জ ছিল, অঞ্জনকাকু ওটাকে খুলে...'

'হ্যাঁ,' অঞ্জন মাথা নাড়ল, 'পিতিনের আবিষ্কার অন্যের দখলে কিছুতেই যেতে দেব না। দখলে যেতে যেতেই যেন বার্স্ট করে। সুনীপাদির কাছেই শুনেছিলাম পিতিন সেটের ব্যাপারটা নিয়ে দুশ্চিন্তিত। ওভারচার্জিং-এ বার্স্ট হওয়ার সমস্যা। তাই বুড়োর ঘরে আলো জ্বেলে প্লাগ লাগিয়ে AOI সেটের গায়ে যা লেখা আছে সব পড়ে, বুঝলাম সতর্কবাণী করা হচ্ছে ব্যাটারি ওভারচার্জ করা নিয়ে। আমি ব্যাটারিটা একেবারে যতটা করা গেল মাত্রাছাড়া ওভারচার্জ করে তাড়াতাড়ি রেডবক্সে পুরে রাখলাম। রেড বক্সের ভেতরে ওটা চুম্বক-ক্ষেত্রের গর্ভে থাকবে বলে বার্স্ট করবে না। বের করে AOI সেটে ব্যাটারিটা ঢোকালেই এক মিনিটের মধ্যে বার্স্ট করবে। আমার ধারণা কপ্টারে বসে মং রেড বক্স খুলে AOI সেট বের করে তাতে মাত্রাছাড়া ওভার চার্জ করা ব্যাটারিটা পরিয়ে দিল। তাই হয়তো এক মিনিটের মধ্যে উড়ন্ত হেলিকপ্টারে ওটা বার্স্ট করল। হেলিকপ্টারের ফুয়েল জ্বলে সৃষ্টি করেছে উড়ন্ত আগুনের গোলা। সেটা ঘটেছে মনে হয় ঘটনাচক্রে। এতটা ঘটবে ভাবিনি।...

আর পেছনে তাকালাম না। ক্যানিং স্টেশনে এসে পৌঁছলাম কাকভোরে। শুভ্রাশিস সোনারপুরে পিসির বাড়ি চলে গেল ঘুমোতে। পিতিন আর আমি, দেখতেই তো পাচ্ছিস আমাদের। পিতিন খালি পায়ে হেঁটে এসেছে। থামলেন অন্ধ ভিখারীবেশী অঞ্জন স্যার।

ছবি: শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

প্রশান্তকুমার পাল সম্পাদিত **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের**
সমস্ত গল্পের একত্রে সংকলন
গল্পসমগ্র (গ্রন্থ পরিচিতি সহ) ৩০০৲

লীলা মজুমদারের
প্রচ্ছদ : সত্যজিৎ রায় পদিপিসির বর্মিবাক্স ৬০৲
অলঙ্করণ : অহিভূষণ মালিক
উপহারের আদর্শ বাক্স-সহ

৭৯টির অধিক গল্প, উপন্যাস ও নাটক সহ প্রথম খণ্ড **লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র** ৩৫০৲

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের
সঞ্জীব রচনাবলি প্রথম খণ্ড ৩০০৲ দ্বিতীয় খণ্ড ২৫০৲
পরম প্রসঙ্গ ১০০৲ ছোটোদের জন্য **মেলা** ৫০৲
ভারত তীর্থে স্বামী বিবেকানন্দ

প্রতিভা বসু ● মহাশ্বেতা দেবী ● নবনীতা দেব সেন ● বাণী বসু ● সুচিত্রা ভট্টাচার্য
একত্রে দশটি অসাধারণ গল্প নিয়ে **পঞ্চকন্যা** ৮০৲

২০০৮ বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত **ছোটোদের গল্পসমগ্র** ১৫০৲
নবনীতা দেব সেন

লালমাটি / সূর্য পাবলিশার্স
দূরভাষ-৯৮৩১০২৩৩২২ ● ৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

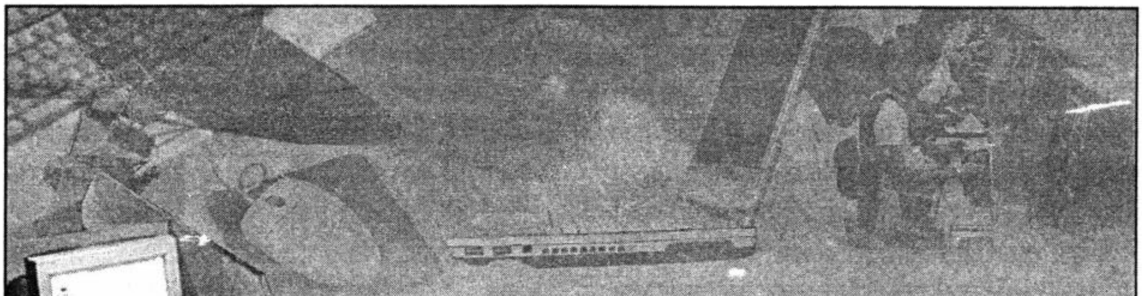

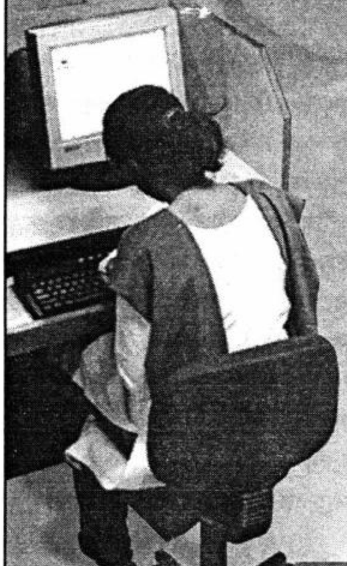

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
যুব কল্যাণ বিভাগ

যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগ

	Course Name	Duration	Eligibility	Fees (Rs.)*
Certificate	1. Certificate in Information Technology Application (CITA)	6 months	Passed/Appeared Madhyamik	Rs. 1,600/-
	2. Certificate in Financial Accounting System(CFAS)	6 months	Passed/Appeared 10+2 With Commerce	Rs. 1,600/-
	3. Certificate in Desk Top Publishing (CDTP)	6 months	Passed/Appeared 10+2	Rs. 1,600/-
	4. Certificate in Computer Aided Design (CCAD)	6 months	Polytechnic 2nd year	Rs. 2,500/-
	5. Certificate in Internet Application (CIA)	6 months	Passed/Appeared 10 + 2 with Computer Knowledge	Rs. 3,100/-
	6. Certificate in Client Server Technology (CCST)	6 months	Passed / Appeared 10 + 2 with Computer Knowledge	Rs. 4,000/-
Diploma	1. Diploma in Information Technology Application (DITA)	1 year	Passed /Appeared 10 +2	Rs. 4,000/-
	2. Diploma in Financial Accounting System (DFAS)	1 year	Passed / Appeared 10 + 2 with commerce	Rs. 4,000/-
	3. Diploma in Desk Top Publishing (DDTP)	1 year	Passed/ Appeared 10+2	Rs. 4,000/-
	4. Advance Diploma in Information Technology Application (ADITA)	1½ years	Completed Diploma in Information Technology Application or equivalent	Rs. 3,000/-
Hardware	1. Certificate in Computer Hardware Maintenance (CCHM)	6 months	10+2 Passed	Rs. 2,300/-
	2. Diploma in Computer Hardware Maintenance (DCHM)	1 year	Completed Certificate in Computer Hardware Maintenance or equivalent	Rs. 5,000/-

* Course fee payable in instalments in the manner laid down in the Prospectus

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজ্য যুব কেন্দ্র, 5th floor
১৪২/৩, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, মৌলালী, কলকাতা - ১৪
☎২২১৬৪২৩৮ / ২২২৭৫৬৭১

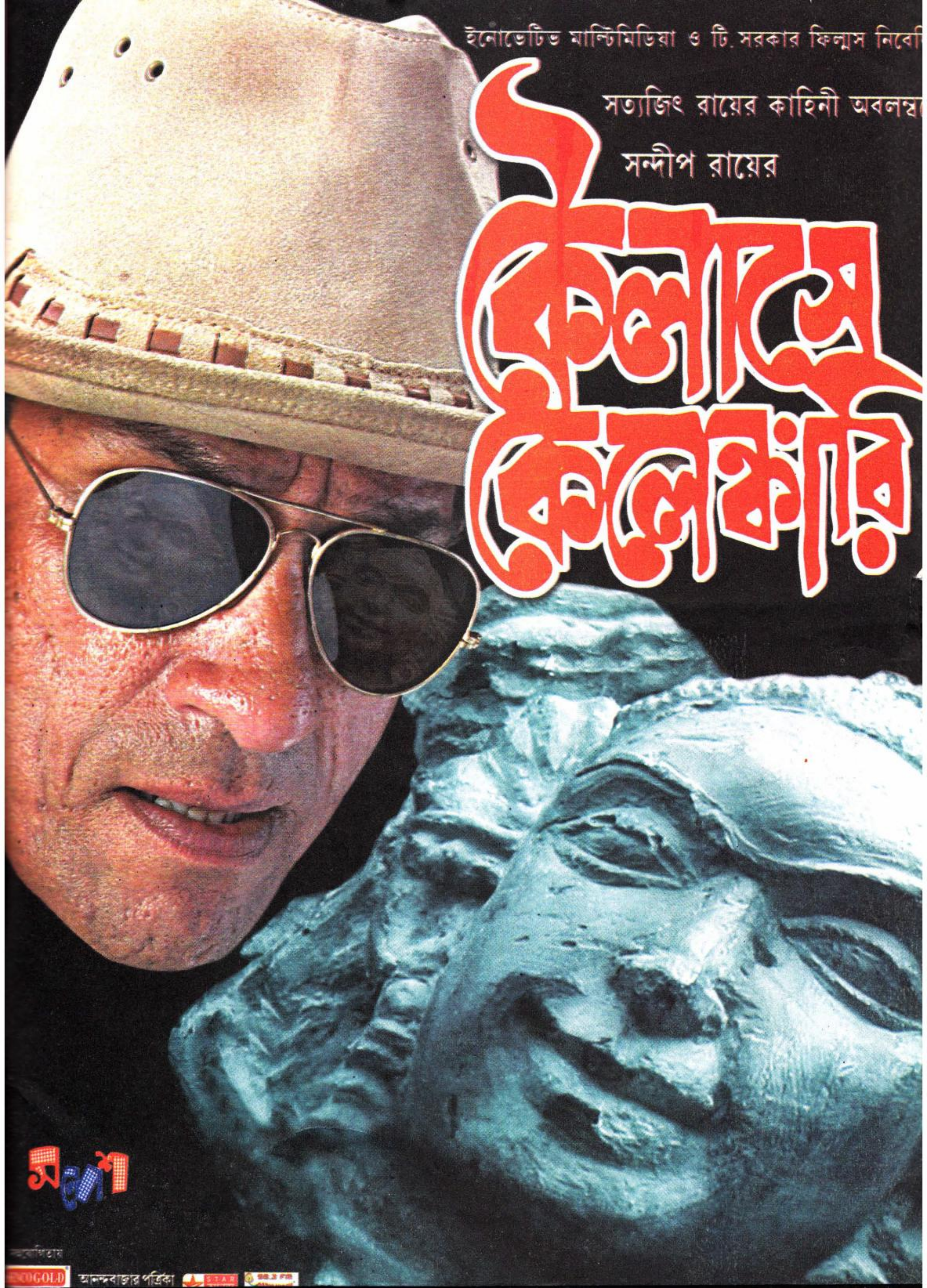
ইনোভেটিভ মাল্টিমিডিয়া ও টি. সরকার ফিল্মস নিবে
সত্যজিৎ রায়ের কাহিনী অবলম্ব
সন্দীপ রায়ের
কৈলাসে কেলেঙ্কারি
আনন্দবাজার পত্রিকা
STAR

R.N.I. No. 120074/64 SANDESH February 2008 Rs. 15/-

আরামবাগস্

ব্রয়লার মুরগী সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ

১) আরামবাগ ব্রয়লার মুরগীর মাংসের মাধ্যমে প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেড ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপাদান পাওয়া যায়। আজকে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা পুষ্টি, যার সমস্যা সমাধানের আরামবাগ ব্রয়লার মুরগী একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

২) আরামবাগ চিকেন বিশ্বমানের তুল্য। পৃথিবী বিখ্যাত সুইস কোম্পানী S.G.S. এর তত্ত্বাবধানে আরামবাগ চিকেন উৎপাদন করা হয়। ভারতীয় কোম্পানী হিসাবে শুধুমাত্র আরামবাগ এই স্বীকৃতি স্বরূপ HACCP ও SQF Certificate পেয়েছে এবং ভারত সরকারের গুণগত মান নির্ধারক সংস্থা MFPO (Meat Food Products Control Order) এর Licence এর অধিকারী।

৩) আরামবাগ আপনাদের সেবায়--

সঠিক মান — সুস্বাদু — তাজা

৪)	আরামবাগ ব্রয়লার মাংস (White Meat)	খাসির মাংস (Red Meat)
প্রোটিন	৩১.৫%	২৫.৪%
ফ্যাট	১.৩%	৭.৩%
ক্যালোরি- কেজি	১৩৬৬	১৬৬০

SQF stands for - Safe Quality Food
HACCP stands for - Hazard Analysis & Critical control Points

Arambagh's FOOD MART

Arambagh's chicken

Arambagh Hatcheries Ltd.
59B Chowringhee Road, Kolkata 700 020
Phone : 2283 2588/2527/2536/2522/2601/2603
Fax : 91-33-22832552